প্রকাশক ঃ

অজিতকুমার জানা
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী ১৯৬০

মুদ্রক ঃ

তারাশঙ্কর চৌধুরী
জে ডি প্রেস
৫২/এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ

ওয়েলনোন প্রিণ্টার্স
১২৪বি রাজা রামমোহন রায় সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৯

*কদরদানের মহ্‌ফিলে নিজেকে কেন লুকিয়ে রাখি ?
কাব্য, সে ত' নগ্ন ছবি—কদরদানই ঢাকুক আঁখি।

*রসিক জন।

'বুক অব দ মান্থ ক্লাব' এবং 'লিটারারি গিল্ড'-এর নির্বাচিত উপন্যাস ক্যানসার ওয়ার্ড সম্পর্কে কয়েকটি কথা ঃ

১৯৫০-এর দশকে রোগী হিসেবে ক্যানসার ওয়ার্ডে ভর্তি এবং আরোগ্য লাভের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই উপন্যাসটি ১৯৫০তে প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত সমালোচক হ্যারিসন সলসবেরি এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'সোলঝেনিৎসিনের নাম আজ পূর্ব সাইবেরিয়ার উষর তৃণভূমি অঞ্চল থেকে উরাল-এর তেল-কালি-মাখা ইস্পাত কারখানা অঞ্চলে ত' বটেই, সারা বিশ্বে দস্তয়েভস্কি, তলস্তয় এবং গোর্কির তুল্য বিরল প্রতিভাবান লেখক হিসেবে সুপরিচিত।'

নূ্যইয়র্ক টাইমস্ মন্তব্য করেছে ঃ 'মাত্র কয়েক বছর আগে রুশ এবং বিশ্ব সাহিত্যাকাশে কোনও পূর্বাভাস ছাড়াই এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আইভান ডেনিসোভিচের জীবনের এক দিন' সোলঝেনিৎসিনকে মহা শক্তিধর শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তারপর 'ক্যানসার ওয়ার্ড' তাঁকে রুশ চেতনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা পরিগণিত হওয়ার দাবী জোরদার করেছে।'

যে নদী মরুপথে… …

৩রা মার্চ, ১৯৫৬

শ্রদ্ধেয় ডাঃ নিকোলাই এবং মিসেস এলেনা কাদমিন,

আপনাদের সামনে একটা ছবির ধাঁধা উপস্থিত করছি : আমি যে জায়গায় এখন আছি সেটা কি এবং কোথায় ? জানলাগুলোয় শিক লাগানো। অবশ্য, কেবল দোতলার জানলাগুলোতেই, চোরকে ঠেকানোর জন্য : শিকগুলোর বিন্যাসে জ্যামিতিক চিত্র মনে পড়ে, যেমন কোন এক কোণ থেকে আলোক রশ্মি এলে হয়। কিন্তু এতে বহির্দৃশ্য আড়াল পড়ে না। ঘরময় চাল অব্দি উঁচু হয়ে যাওয়া তাক। তাকগুলোয় বিছানা পাতা। প্রতি তাকে ভয়ে বুদ্ধি বিনষ্ট একটি মানুষ।

সকালে গোলাকৃতি পাউরুটি, চিনি আর চা মেলে—এটা নিয়ম বিরুদ্ধ, যেহেতু পরে প্রাতরাশও দেয়। সারা সকাল লোকগুলো নিরানন্দ এবং নির্বাক থাকে। কিন্তু সন্ধ্যায় অবিচ্ছিন্ন গুঞ্জন এমন কি সতেজ আলোচনাও হয় : জানলা খোলা বা বন্ধ করা, কে সর্বোত্তম আর কে জঘন্যতম পরিণতি আশা করতে পারে, এমন কি সমরকন্দ-এর অমুক মসজিদে ক'টা ইট আছে, তা নিয়ে।

দিনের বেলা এক একজন বাসিন্দাকে ডেকে নিয়ে যায়। উচ্চ পদাধিকারীদের সঙ্গে কথা বলার জন্য, 'প্রক্রিয়াকরণ'-এর জন্য, আর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য। আমরা বই পড়ি, দাবা খেলি। বাইরে থেকে খাবার-দাবারের পার্সেল আসার অনুমতি আছে ; যারা পায়, তারা সযত্নে রেখে দেয়। কোন বাসিন্দাকে কর্তৃপক্ষ বাড়তি খাবার দেয়। যারা পায়, তাদের সবাই 'ছিঁচকাঁদুনে' নয়—একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, কারণ আমি নিজেই পেয়েছি।

কখনো কখনো কর্তৃপক্ষ আমাদের বাসস্থান তল্লাসি করে। ব্যক্তিগত জিনিষপত্র লুকিয়ে রাখতে হয় ; তল্লাসিতে কিছু পেলে, নিয়ে নেয়। বাইরে বেড়ানোর আর ব্যায়াম করার অধিকারের জন্য লড়াই করতে হয়। স্নান একটা বড় ঘটনা, পরীক্ষাও বটে। জল কি গরম পাওয়া যাবে ? পর্যাপ্ত জল পাওয়া যাবে ? কি ধরনের অন্তর্বাস পাওয়া যাবে ? যখনই 'নতুন' কাউকে নিয়ে এসে ঢোকায় তখন কিছু কৌতুকের খোরাক মেলে। বাস্তবে কি পাওয়া যাবে তা জানা না থাকায় নতুনরা উদ্ভট প্রশ্ন করে…

আশা করি এতক্ষণে কিছুটা অনুমান করতে পেরেছেন। নিশ্চয়ই দু'জনে আমাকে মিথ্যুক বলছেন : জায়গাটা যদি বন্দী চালান শিবিরই হয় তবে

তাকগুলোয় বিছানা থাকে কেন ? আর, যদি কোন কারাগার হয় তবে রাতে জিজ্ঞাসাবাদ হয় না কেন ?

আমি ধরেই নিয়েছি যে এই চিঠি ডাকঘরে আমাদের 'রক্ষাকর্তারা' পড়ে দেখবেন, সে কারণে আমি অধিক উপমা বিস্তারের প্রয়াস থেকে নিজেকে বিরত রাখছি।

পাঁচ সপ্তাহ ধরে আমি ক্যানসার ওয়ার্ডে এই ধরনের জীবনই যাপন করেছি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি আমার প্রাক্তন জীবন ফিরে পেয়েছি। এ জীবনের শেষ নেই। সবচেয়ে পীড়াদায়ক যা তা হ'ল, আমার বর্তমান অবস্থানের কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই, যেহেতু আমি 'রাষ্ট্রের ইচ্ছায়' এখানে এসেছি। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে যে কমেন্দাতুরা আমাকে মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছিল। সে মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব ওরা কড়া হতে চাইলে, আমাকে পালানোর চেষ্টা করার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারে।

আমি কবে এখান থেকে ছাড়া পেতে পারি হাসপাতাল সে সম্পর্কে কিছুই বলে না। চিকিৎসা সংক্রান্ত নির্দেশানুযায়ী রোগীদের থেকে যতটুকু নিঙড়িয়ে নেওয়া চলে, ওরা তা নেবে। রোগীর দেহে অত্যাচার সইবার ক্ষমতা থাকা পর্যন্ত রেহাই দেবে না।

এ পর্যন্ত চিকিৎসায় যা ফল হয়েছে তা হ'ল ঃ দু'সপ্তাহ চিকিৎসার পর যে বিস্ময়কর উন্নতি দেখা দিয়েছিল—আপনার শেষ চিঠিতে যাকে 'অলীক আনন্দানুভূতি' আখ্যা দিয়েছেন -, এবং মনে হ'ত আমি আনন্দকর সুস্বাস্থ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছি, তার চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট নেই। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে। চিকিৎসার উপকারী অংশটা শেষ হয়েছে, ক্ষতিকর অংশ আরম্ভ হয়েছে।

রশ্মি-চিকিৎসা চলছে। দিনে দু'টি করে বৈঠক। প্রতি কুড়ি মিনিটের বৈঠকে ৩০০ র‍্যাড্ রশ্মি দেওয়া হয়। উশ্-টেরেকে থাকতে যে ব্যথায় কষ্ট পেতাম তা ভুলেছি ! তার জায়গায় এসেছে বমি ভাব। রশ্মি-চিকিৎসা জনিত বমিভাব—ইন্‌জেকশন জনিতও হতে পারে, এখানে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যায়— – যে কত বিরক্তিকর তা আপনাদের ধারণা নেই। ওতে বুকের মাঝখানে চেপে ধরে, কয়েক ঘণ্টাতেও তা যায় না। ধূমপান ছেড়ে দিইনি, ত্যাগ হয়ে গিয়েছে। এমন বিশ্রী লাগে, বেড়াতে যেতেও ইচ্ছে করে না। বসে থাকতেও পারি না। বালিশ ছাড়া, হাঁটু দুটো উঁচু করে শুয়ে আরাম পাই। চিঠিও ঐভাবে শোয়া অবস্থায় লিখছি। রশ্মি-চিকিৎসাব জন্য ডাক পেয়ে এক্স-রে'র ভারী গন্ধওলা ঘরে ঢুকতে গিয়ে ভয় হয়, নাড়ি-ভুঁড়ি উল্টিয়ে বেরোবে। শশা আর বাঁধাকপির আচার খেলে বমি ভাব দমন হয়, যা হাসপাতালের ত্রিসীমানায় মেলে না আর রোগীদের হাসপাতালের বাইরে বেরোতেও দেয় না। কর্তৃপক্ষ বলে, "ওসব আত্মীয়-স্বজনদের এনে দিতে বলবেন।" আত্মীয়-স্বজন ! আপনি

ত' জানেন, আমার আত্মীয়রা ক্রাসনো ইয়ারস্ক-এর তাইগায় চার পায়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। এটা এক ব্যাঙ্গোক্তি। তাইগা বা তুষারাচ্ছন্ন পাইনের বনভূমি অঞ্চলে নির্বাসিত ব্যক্তিরা নিরাপত্তা পদাধিকারীকে 'কমরেড' বলে অভিবাদন করলে নিরাপত্তা পদাধিকারী জবাবে বলতেন, "তাইগায় নেকড়ে বাঘই আপনাদের কমরেড হবে।"]

এক বন্দী কি বা করতে পারে? আমি ফৌজী বুট পরে, মেয়েদের ড্রেসিং গাউনের কোমর ফৌজী বেল্ট দিয়ে এঁটে গুটিগুটি হেঁটে হাসপাতালের সেই জায়গায় পেঁছিই যেখানকার দেওয়াল অর্দ্ধেক ভাঙা। দেওয়াল পেরিয়ে রাস্তায় পড়ি। পাঁচ মিনিটে বাজারে। বাজারের পথে বা বাজারে আমার চেহারা নিয়ে কেউ হাসাহাসি করে না। আমাদের দেশের মানুষ সবকিছুতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এটা আত্মিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আমি সারা বাজারে গোমড়া মুখে দরদাম করে ফিরি। শুধু পুরনো কয়েদীরাই অত দরদাম করতে পারে। কোন পুরনো কয়েদী হয়ত সত্যিই হৃষ্টপুষ্ট, সাদা-হলুদে মেশানো একটা মোরগ দেখে পছন্দ করল। সে তখন বলবে, "মাসী, এই টি বি. ধরা মোরগটার দাম কত?" আমার কত রুবলই বা আছে, কোথা থেকে বা পাব? আমার ঠাকুর্দা বলত, "কোপেক বাঁচাতে পারলে রুবল বাঁচবে, রুবল বাঁচাতে পারলে দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচবে।" ঠাকুর্দা বুদ্ধিমান মানুষ ছিল।

বমি ভাবে শশা খেলে উপকার হয়। চিকিৎসার প্রথম দিকে হঠাৎ আমার খিদে ফিরে এসেছিল। এখন খিদে চলে গিয়েছে। রশ্মি-চিকিৎসার ফলে প্রথম প্রথম ওজন বাড়ছিল, কিন্তু এখন কমছে। মাথা ভার লাগে। কয়েক দিন যাবৎ মাথা ঘোরাও ছিল। তবু, এটা ঠিক যে, আমার টিউমারের অর্দ্ধেকই আর নেই। টিউমারের ধারগুলো এত নরম হয়ে গিয়েছে যে তার উপস্থিতি টের পাই না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার দেহের রক্ত খারাপ হয়ে চলেছে। রক্তের শ্বেত কণিকা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, সম্ভবতঃ তার সঙ্গে অন্য কিছু নষ্ট করার জন্যও বটে, এরা বিশেষ এক ধরনের ওষুধ দিচ্ছে। তাছাড়া 'শ্বেত কণিকা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে' (ওদের ভাষাই প্রয়োগ করলাম) মিল্ক ইনজেকশন দিতে চায়। এ এক বর্বরতা। মিল্ক ত' দুধ, তাহলে সরাসরি দুধ খেতে দিলেই ভাল হয় না? আমি ঐ ইনজেকশন নেব না, তাতে যা হয় হোক।

এসবের ওপর এরা ভয় দেখাচ্ছে, আমাকে রক্তও নাকি নিতে হবে। আমিও লড়াই করছি। যে কারণে এখনো রেহাই পাচ্ছি তা হ'ল আমার 'এ' গ্রুপের রক্ত প্রয়োজন, যার অত্যন্ত অভাব।

রশ্মি-চিকিৎসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, মোটামুটি ভাবে চিড় খাওয়া বলা চলে। আমাদের দেখা হলেই তর্কাতর্কি হয়। খুব কড়া ডাক্তার। গতবার উনি আমার বুক পরীক্ষা করতে করতে মন্তব্য করলেন, "সিনেস্ট্রল ইনজেকশন জনিত প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না" —তদ্বারা বোঝাতে চাইলেন, আমি ইনজেকশনকে এড়িয়ে এবং ওঁকে ধাপ্পা

দিয়ে চলেছি। আমিও বিরক্ত হলাম। (আমি অবশ্য তাঁকে ধাপ্পাই দিচ্ছিলাম)

চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে কড়া হতে আমার অনেক বেশী অসুবিধে হয়। কেন জানেন? উনি অত্যন্ত নরম আর ভদ্র বলে। ডাঃ কাদমিন, আপনি একবার কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, "নরম কথায় হাড় বেশী ভাঙে"—মনে পড়ে? এই ডাক্তারটি গলা ত' চড়ানই না, ঠিক মত ভুরু কোঁচকাতেই পারেন না। আমি অপছন্দ করি এখন কোন ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখতে হলে উনি চোখ নিচু করে ফেলেন। কোন অজ্ঞাত কারণে আমিও মেনে নিই। আরো কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে যা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা হয়ে ওঠেনি। ডাক্তারটি এখনো যুবতী আছেন, আমার চেয়ে বয়সে ছোট। জানেন, এমন কতকগুলো জিনিষ আছে উনি সেগুলোর সঠিক নাম উচ্চারণ করেন না। আমারও কারণ জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগে।

ভাল কথা, ডাক্তারটি সত্যিই সুন্দরী, দেখলেই ভাল লাগে। কেন জানি না, আমার বেশ মনে পড়ে প্রথম পরিচয়ে বলেছিলেন উনি বিবাহিতা। পরে হঠাৎ জানা গেল ওঁর কোন স্বামীই কোন কালে ছিল না। হয়ত নিজের অবিবাহিতা পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন।

ভদ্রমহিলার মনে অধীত বিদ্যায় প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রয়ে গিয়েছে। অন্য ডাক্তারদের মত উনিও প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি আর চিকিৎসায় নিঃসংশয় আস্থা রাখেন। অনেক চেষ্টা করেও আমি সন্দেহের সামান্যতম বীজবপন করতে পারি না। মোটামুটি ভাবে বলতে পারি, কোন ডাক্তারই তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী হবেন না। কেউ আমাকে এক নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসেবে স্বীকার করে নেবেন না। আমার ওঁদের কথোপকথন শুনে কিছুটা অনুমান করতে হয়, ডাক্তারি বই পড়ে বাকিটা পূরণ করতে হয়। আমি এভাবেই নিজের পরিস্থিতি বুঝতে পারি।

তবু এভাবে আমার মন স্থির করতে অসুবিধে হয়। কি করব বুঝে উঠতে পারি না। মাঝে মাঝে ডাক্তাররা আমার কণ্ঠমূল আর বাহুমূলের সংযোগকারী অক্ষকাস্থির কাছাকাছি পরীক্ষা করে দেখেন। কিন্তু এ কি সত্যি যে আমার রোগের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গগুলি ঐখানেই দেখা দেয়? কেন যে আমাকে হাজার হাজার র‍্যাড এক্স-রে দেওয়া হয় তা বুঝি না। ওতে কি সত্যিই ভবিষ্যতে টিউমার হওয়া বন্ধ হবে? না, সেতু নির্মাণের জন্য যেমন দু'পারের ভিত প্রয়োজনের পাঁচ-সাতগুণ বেশী মজবুত করে নেওয়া হয়, এও সেই ধরনের নিশ্চিত হওয়ার প্রয়াস মাত্র? না, এসবই কতকগুলো অর্থহীন নির্দেশ মেনে চলা, যার অন্যথা হলে ওঁরা চাকরি খোয়াবেন আমি আর ওসব সহ্য করব না। ওঁরা যদি শুধু একবার আমাকে সত্যি কথা বলেন, আমিই ঐ দুষ্ট চক্র তছনছ করে দিতে সক্ষম—কিন্তু, হায়, ওঁরা বলবেন না।

আর যাহোক, আমি ত' দীর্ঘ জীবন যাচ্ঞা করছি না। ভবিষ্যতের

গহ্বরে উঁকি মেরে আমি কিই বা করব? আমার প্রথম জীবন কেটেছে পাহারাধীন অবস্থায়, তারপর বেদনাধীন অবস্থায়। এবার স্রেফ পাহারা এবং বেদনামুক্ত অবস্থায় সামান্য কিছু দিন বাঁচতে চাই। আমার উচ্চাশার সীমা অতটুকু।

আমার আকাঙ্খা লেনিনগ্রাদ বা রায়ো-দা-জেনিরো নয়। আমি শুধু বনভূমি অঞ্চলে আমাদের তুচ্ছ উশ্-টেরেকে ফিরে যেতে চাই। আর কিছুদিন পরেই গ্রীষ্ম পড়বে। এই গ্রীষ্মে আমি খোলা আকাশের নিচে শুতে চাই। শুধু যদি একটা গ্রীষ্ম খোলা আকাশের নিচে শুয়ে কাটাতে পারতাম! রাতে ঘুম ভেঙে, শিবিরের সন্ধানী আলোয় আকাশে মিলিয়ে না যাওয়া নক্ষত্রের অবস্থান দেখে সময় বুঝতে পারতাম···তারপর সে ঘুম যদি আর কখনো না ভাঙে আমি তাতেই খুশি।

আরেকটা কথা, ডাঃ নিকোলাই কাদমিন। গ্রীষ্মের তাপ কমার পর আমি বিটল, টোবিক আর আপনার সঙ্গে স্তেপ্ পেরিয়ে চু নদীতে বেড়াতে যেতে চাই। পাহাড়ী চু নদীর গভীরতম জায়গা হাঁটু জলের বেশী গভীর হবে না। তার কাছাকাছি স্রোতে পা ভাসিয়ে বালুময় পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকব, অপর পারে বকের মত।

আমাদের চু সাগর বা কোন বড় হ্রদে মেশে না। চু যেন তার অধিকাংশ জল আর শক্তি তার এলোমেলো গতি পথে উদ্দেশ্যহীন ভাবে অপচয় করে বালুময় প্রান্তরে মিলিয়ে যায়।

আমাদের বন্দী জীবনের এ বড় মধুর ছবি, তাই নয়? আমাদের কোন বড় উদ্দেশ্য সাধনের তাগিদ নেই। অবমাননায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা আমাদের ববাতের লেখন। আমাদের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা যেন কয়েক অঞ্জলি জল, যে জল এখনো শুকিয়ে যায়নি। আমাদের স্মৃতিও হবে ঐ মাত্র কয়েক অঞ্জলি জল, যা আমরা পরস্পরকে দিতে সক্ষম। আমাদের মানবিক সংযোগ, আমাদের বার্তালাপ আর পরোপকারচিকীর্ষু মনের থেকে যা অভিন্ন।

নদী বালিতে হারিয়ে যাবে, আর ডাক্তাররা আমাকে এই শেষ জলের বিস্তারের কাছে যেতে দেবে না। কি জানি কোন্ অধিকার বলে—সে অধিকার যে বিতর্কিত হতে পারে এ কথাও ওদের মনে আসে না—ওরা আমার সম্মতি ছাড়াই এক অতি ভয়াবহ চিকিৎসা প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত করেছে, যার নাম হর্মোন চিকিৎসা। এ যেন এক লাল টকটকে শিক দিয়ে রোগীকে মার্কা দেওয়া, যার পর থেকে সে চিরতরে পঙ্গু বলে চিহ্নিত হবে। কিন্তু ক্যানসার হাসপাতালে এ চিকিৎসা দৈনন্দিন ঘটনা।

বেঁচে থাকার জন্য কি সর্বোচ্চ মূল্য চোকানো যেতে পারে তা নিয়ে আমি এর আগেও অনেক ভেবেছি, সম্প্রতি আরো বেশী ভাবছি। বেঁচে থাকার জন্য কত মূল্য দিতে হবে? কোন্ মূল্য অত্যন্ত বেশী গণ্য হবে? মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার প্রাণ, যা সে একবারই পায়। সুতরাং প্রাণ

আঁকড়িয়ে থাকার জন্য যে কোন মূল্য দিতে হবে। কিন্তু বন্দী শিবির আমাদের একথা প্রমাণ করতে শিখিয়েছে যে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভাল এবং অসহায় মানুষের সঙ্গে বেইমানি, বা তাদের বিনাশের কারণ হওয়া, প্রকৃতই অত্যন্ত বেশী মূল্য, এবং আমাদের জীবন অত মূল্যবান নয়। নিজের প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে কর্তৃপক্ষের পদলেহন এবং চাটুকারি সম্পর্কে শিবিরে মত পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। কেউ বলেছিল, ঐ দাম দেওয়া চলে। হয়ত তাই। কিন্তু আমি এখন যে দামের কথা বলছি তার বেলায় কি বলা যায়? প্রাণ ধারণের বিনিময়ে কি জীবনের সব রঙ, গন্ধ আর উত্তেজনা সমর্পণ করা চলে? কেউ কি শুধু পাক-শক্তি, শ্বাস-প্রশ্বাস, পেশী আর মস্তিষ্কের কর্ম ক্ষমতা দ্বারা সীমিত জীবন মেনে নিয়ে, সচল যান্ত্রিক নক্সা বনে থাকতে রাজী হবেন? সে বাঁচা যে বাঁচাকে বিদ্রূপ করা। সাত বছর ফৌজের পর সাত বছর বন্দী শিবিরে কাটিয়েও যদি নর-নারীর প্রভেদ বোঝার ক্ষমতা বর্জিত হয়ে বাঁচতে হয়, তা প্রাণ ধারণের জন্য অত্যন্ত বেশী দাম চোকানো বৈকি।

আমি আর এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে অনেক আগেই ডাক্তারদের সঙ্গে ঝগড়া করতাম। কিন্তু, তাহলে ডাক্তারদের সই করা প্রমাণপত্র পেতাম না। ঐ প্রমাণপত্র না দেখাতে পারলে ওর্মান কমেন্দাতুরা আমাকে আরো তিনশো কিলোমিটার দূরে কোন মরুভূমিতে ঠেলে দিত। আমি কমেন্দাতুরাকে বলতে পারি, হুজুর, দেখতেই পাচ্ছেন আমার লাগাতার ডাক্তারি চিকিৎসা আর পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। অতএব, মহাশয়, পুরানো বন্দীকে তার ডাক্তারি প্রমাণপত্র হাতছাড়া করতে বলবেন না।

সুতরাং আমার বাধ্য হয়ে আরেকবার ভাণ করতে হবে, চাতুরির আশ্রয় নিতে হবে। অথচ তা করতে কি যে গা ঘিনঘিন করতে থাকে! খুব বেশী চালাকি করতে করতে চালাকি করায় ক্লান্তি আসে, ভুল হতে থাকে। ওমস্ক-এর পরীক্ষাগারের সহকারীর যে চিঠিটা আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিলাম, তার সঙ্গে অনেক কিছু ফন্দি ভেবে রেখেছিলাম। চিঠিটা জমা দিয়েছি। ডাক্তাররা চিঠিটা আমার রোগের ইতিবৃত্তের সঙ্গে রেখে দিয়েছে। এখন হর্মোন চিকিৎসা মেনে নিতেই হবে। চিঠিটা জমা না দিলে হয়ত ডাক্তাররা আমার হর্মোন চিকিৎসা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দীহান হতেন।

উশ্-টেরেকে ফিরে যেতে পারলে ইসিক্-কুল্ অঞ্চলের গাছের মূল দিয়ে আরেকবার নিজের চিকিৎসা করব। তাতে দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা দূর হবে, ধরে নিতে পারি। কড়া বিষের সাহায্যে নিজের চিকিৎসা করায় একটা বাহাদুরি আছে। বিষ নিজেকে নির্দোষ ওষুধ হিসেবে চালানোর চেষ্টা করে না। সরাসরি বলে, "আমি বিষ! সাবধান!" আমরা জেনে-শুনেই বিষ নিয়ে কাজ-কারবার করি।

আপনার শেষ চিঠিটা পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল। (চিঠিটা মাত্র পাঁচ

দিনে পৌঁচেছিল, তার আগেরগুলো আট দিনে পৌঁচেছে) সত্যিই কি আমাদের অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক অভিযান হবে? থিওডোলাইট-এর পেছনে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ মানুষের মত কাজ করা—বেশী চাই না, এক বছর করতে পারলেই আমি খুশি—কি যে আনন্দের ব্যাপার হবে! ওরা কি আমাকে নেবে? ঐ কাজের অর্থ আমার নির্বাসনের ভৌগলিক সীমানা ছাড়িয়ে কাজ-কম। অভিযান মাত্রেই যেখানে 'অতি গোপনীয়' গণ্য হয়, আমার মত প্রাক্তন ইতিহাসওলা মানুষকে ওতে নেবে কিনা সন্দেহ।

আপনি 'ওপেন সিটি' আর 'ওয়াটারলু ব্রিজ' ছায়াছবি দুটোর প্রশংসা করেছেন। আমার ঐ ছায়াছবি দুটো দেখা হবে না। ও দুটো উশ্-টেরেকে দ্বিতীয়বার আসবে না। এখানকার সিনেমায় দেখতে হলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে শহরে কোথাও রাত কাটাতে হবে। কোথায় রাত কাটাব? তাছাড়া, হামাগুড়ি দেওয়ার অবস্থা হওয়ার আগে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাব মনে হয় না।

আপনি আমাকে কিছু টাকা পাঠাতে চেয়েছেন—অশেষ ধন্যবাদ। আমি প্রত্যাখ্যান করব ভেবেছিলাম। সারা জীবনই আমি দেনার দায় এড়িয়ে থাকতে চেয়েছি, এবং তাতে সফল হয়েছি। কিন্তু আমার হঠাৎ মনে পড়ল, আমি ত একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় মারা যাব না। আমার একটা ভেতার চামড়ার জ্যাকেট আছে, জিনিষটা ফেলনা নয়। ছ'ফুট লম্বা একটা কালো চাদর আছে, যাকে আমি কম্বল হিসেবে ব্যবহার করি। তার সঙ্গে এক মেলচুক্-এর থেকে উপহার পাওয়া পাখার পালখের বালিশ। আরো আছে তিনটে প্যাকিং বাক্সকে পেরেক সেঁটে বানানো আমার খাট, দুটো সসপ্যান, শিবিরে খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত জামবাটি, দুটো চামচ, উনুনের জন্য কিছু সাক্সুল' [স্তেপ্ অঞ্চলের জ্বালানি কাঠ], আমার প্রাণাধিক প্রিয় বালতিটা আর সবার শেষে কেরোসিনের বাতি। এত মূল্যবান সম্পত্তি, অথচ আমি ভুল বশতঃ এখনো উইল করিনি।

অতএব আপনি ১৫০ রুবল পাঠালে অত্যন্ত বাধিত হ'ব। তার বেশী পাঠাবেন না। আপনার বরাত দেওয়া কিছু ম্যাঙ্গানেট, সোডা আর দারচিনি সংগ্রহ করার চেষ্টা করব। আরো কিছু প্রয়োজন থাকলে জানাবেন। আপনার কি একটা ইস্তিরি দরকার? জানাতে দ্বিধা করবেন না।

আপনার আবহাওয়ার বিবরণ থেকে জানলাম উশ-টেরেকে এখনো শীত আছে, তুষার যায়নি। এখানে এখন অভব্য রকম চমৎকার, অকল্পনীয় সুন্দর বসন্ত চলছে। আবহাওয়ার প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। যদি ইনা স্ট্রোয়েম-এর সঙ্গে দেখা হয়, ইনাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। বলবেন, আমি প্রায়ই ওর কথা ভাবি আর……যাকগে, ওসব বলে কাজ নেই।

মনের মধ্যে এত সব আবছা চিন্তাধারা তোলপাড় করছে যে আমি কি চাই, কিংবা আমার কি চাইবার অধিকার আছে, তা বুঝতে পারি না। কিন্তু যখনই

নির্বাসিত ব্যক্তির একমাত্র মহান প্রবোধ বাক্য 'অতীতে সবকিছু থেকেও খারাপ ছিল' মনে পড়ে যায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে উঠি। ভাবি, আর মনমরা হয়ে থাকব না। কোন মতে এই কাদা-মাটির জীবন পার হয়ে যাব।

মিসেস এলেনা কার্দামন জানিয়েছেন, তিনি নাকি দুই সন্ধ্যায় মোট দশটা চিঠি লিখেছেন। মানুষের জন্য আপনাদের এত অবিচল সহানুভূতির কথা জেনে ভাল লাগে। দূরের বন্ধুদের কথা ভেবে কে আর আজকাল অতগুলো সন্ধ্যে নষ্ট করতে চাইবে? তাই আপনাদের লম্বা লম্বা চিঠি লিখতে ভাল লাগে। কেননা, জানি আপনারা একে অপরকে আমার চিঠি পড়ে শোনাবেন, নীরবে পড়বেন, প্রতিটি বাক্য মন দিয়ে পড়ে, প্রতিটি প্রসঙ্গের যথাযথ জবাব দেবেন।

আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক, অলোক বর্তিকা দেদীপ্যমান থাকুক।

আপনাদেরই

ওলেগ্

প্রাণ ভরে বাঁচব না কেন?

৫ই মার্চ দিনটা ছিল বিষাদখিন্ন। অনবরত ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু ঐদিনই ক্যানসার ওয়ার্ডে কয়েকটা চমক লাগানো ঘটনা ঘটল। গতকাল সন্ধ্যায় ডিওম্কা অপারেশনে রাজী হয়ে সম্মতিপত্রে সই করেছিল। ও ৫ই তারিখে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে বদলি হওয়ার কথা। ডিওম্কা বদলি হওয়ার দিন ওয়ার্ডে দু'জন নতুন রোগী এলো।

প্রথম জন দরজার পাশে, ঘরের কোণ ঘেঁষে ডিওম্কার বেড নিল। রোগীটি বেশ লম্বা, কিন্তু দারুণ কুঁজো, যেন শিরদাঁড়া বেঁকে গিয়েছে। মুখে অত্যন্ত বয়সের ছাপ। চোখ দুটো এত ফোলা, নিচের পাতা এত ঝোলা যে সকলের চোখ যেখানে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল, ডিম্বাকৃতি ওর চোখ দুটো সেখানে বৃত্তকার দেখায়। চোখের সাদায় এক অস্বাস্থ্যকর লালচে ছোপ। চোখের মণি দুটো ঘিরে এক জ্বলজ্বলে বাদামী বৃত্ত, যা নিচের পাতা ঝুলে পড়ার ফলে বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশী বড় দেখায়। বড় বড় গোল চোখের অবাঞ্ছিত, মনযোগী দৃষ্টি দিয়ে লোকটি সবাইকে খুঁটিয়ে দেখে।

গত সপ্তাহের পুরোটাই ডিওম্কা নিজের মধ্যে ছিল না। পায়ে দপ্দপানি ব্যথা কখনই থামেনি। তার সঙ্গে ছুরি বেঁধার মত ব্যথার জন্য ও না পারছিল কোন্ কিছুতে অংশ গ্রহণ করতে, না ঠিক মত ঘুমোতে। সব মিলে ওকে এত কষ্ট দিচ্ছিল যে ওর তখন পা-কে এক মূল্যবান অঙ্গ মনে না হয়ে এক অভিশপ্ত বোঝা মনে হচ্ছিল, যার থেকে যত তাড়াতাড়ি রেহাই পাওয়া যায় ততই ভাল। এক মাস আগে যে অপারেশন করতে হলে মনে

হ'ত ও মরেই যাবে, আজ তাই মুক্তির উপায় মনে হচ্ছিল। আমাদের মনের এমনই পরিবর্তন ঘটে।

সম্মতিপত্রে সই করার আগে ডিওম্‌কা ওয়ার্ডের সকলের পরামর্শ নিয়েছিল। তবু আজ বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে ও কথাবার্তার মোড় এমন করে ঘোরাচ্ছিল যাতে সবার আশ্বাস পাওয়া যায়। ভাদিম তাই ইতিপূর্বে যা বলেছিল তার পুনরাবৃত্তি করে বলল, ডিওম্‌কার বরাত ভাল তাই ও অল্পেই রেহাই পেয়ে যাবে। ওর নিজের যদি অপারেশন করলে রোগমুক্তি হত ও সানন্দে ডিওম্‌কার মত অপারেশনে রাজী হয়ে যেত।

ডিওম্‌কা তবু একটু আপত্তি না জানিয়ে পারল না। "কিন্তু, আমার পায়ের হাড়···ওরা ঠিক কাঠের তক্তার মত হাড়টা করাত দিয়ে চিরে ফেলে দেবে। শুনেছি, এ্যানেসথেশিয়া দেওয়া থাকলেও নাকি টের পাওয়া যায়।"

ভাদিম কাউকে বেশীক্ষণ প্রবোধ দিতে পারে না। ওর ইচ্ছে করে না। 'থামো ত,'" ও বলল, "পা কেটে বাদ দেওয়া ইতিহাসে তোমারই প্রথম ঘটনা নয়। সবারই সহ্য করতে হয়েছে। তুমিও সহ্য করতে পারবে।"

যেমন ও অন্য সব ব্যাপারে করে থাকে, ডিওম্‌কার ব্যাপারেও ভাদিম সঠিক এবং নিরপেক্ষ। ও নিজে প্রবোধ চায় না। কেউ দিলে, প্রত্যাখ্যান করত। প্রবোধ দেওয়ার প্রতিটি চেষ্টা যেন মেরুদণ্ডহীন, ধর্মীয় ব্যাপার মনে হয়।

হাসপাতালে আসার প্রথম দিন ও যেমন তেজোদৃপ্ত, সংযত আর ভদ্র ছিল ভাদিম আজও তাই আছে। তফাতের মধ্যে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষের মত ওর ঈষৎ রোদে পোড়া চামড়া হলুদ হতে শুরু করেছে। ব্যথা খুব বাড়লে মাঝে মাঝে অস্থিরতায় কপাল কুঁচকিয়ে ওঠে, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে। যতকাল ও মুখে বলত মাত্র আট মাসের বেশী বাঁচবে না, ও তারই ফাঁকে ঘোড়ায় চড়ে কাজ করেছে এবং মস্কোয় উড়ে গিয়ে চেবোগরোৎসভের সঙ্গে দেখা করেছে, হৃদয়ের গভীরে তখন বিশ্বাস ছিল যে ও মরনের ফাঁদ এড়াতে পারবেই। কিন্তু এখানে আসার পর এক মাস কেটে গিয়েছে। অর্থাৎ বরাদ্দ আট মাস আয়ু থেকে এক মাস বাদ। এর মধ্যে প্রতি দিনই হাঁটতে গেলে বেদনা বেড়েছে। ঘোড়ায় চড়ার কল্পনাও এখন দুঃস্বপ্ন। ব্যথা কুঁচকি পর্যন্ত ওঠে। যে তিনটে বই এনেছিল তাও পড়া হয়ে গিয়েছে। তেজষ্ক্রিয় জলের উপস্থিতির সাহায্যে খনিজ আকর সন্ধান করাই যে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ, ওর এ প্রতীতি নষ্ট হতে চলেছে। ও আর আগের মত গভীর মনযোগ দিয়ে পড়ে না। পড়লেও, আগের মত অত জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়ে পঠিত বিষয় ভরে রাখে না।

একটা সময় ছিল যখন মনে হ'ত একটা দিনে যে ক'ঘণ্টা থাকে তা যথেষ্ট নয়। ও তখন সারা দিনই কাজে ব্যস্ত থাকত। ভাদিমের মনে হয় ওটাই ওর জীবনের সেরা সময়। এখন দিনগুলো অনেক বেশী দীর্ঘ মনে হয়, আর

জীবন যেন তেমনি খাটো। ওর সযত্নে টানটান করে রাখা কাজের ক্ষমতাও ঝুলে পড়ছে। নিস্তব্ধ ভোরে উঠে বই পড়া এখন বিরল ঘটনা। কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে কখনো কখনো মনে হয় সংগ্রাম করার চেয়ে রোগের কাছে, বিনাশের কাছে আত্মসমর্পণ করলে হয়ত অনেক সহজ হ'ত। পারিপার্শ্বিক তুচ্ছতা আর বোকা বোকা গল্প গুজবের ভীতিজনক অসারতা দেখে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় পোষাকী সংযমের খোলস ছিঁড়ে ফেলে ক্ষিপ্ত পশুর মত চিৎকার করে বলে, "তোমাদের এ আহাম্মকি থামাও! আমার পা নিয়ে তোমাদের আর অত ভাবতে হবে না!"

ভাদিমের মা চারজন উচ্চ পদাধিকারীর সঙ্গে দেখা করেও তেজস্ক্রিয় সোনা জোগাড় করতে পারেননি। মা কিছু চাগা এনেছিলেন। নার্সের সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছেন, সে এক দিন অন্তর চাগা সিদ্ধ করে ভাদিমকে তার রস খেতে দেবে। সোনা জোগাড় করার উদ্দেশ্যে আরো কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করতে মস্কো ফিরে গিয়েছেন। তিনি একথা মেনে নিতে নারাজ যে তেজস্ক্রিয় সোনার ভাণ্ডার কোথাও মজুত থাকা সত্ত্বেও ক্যানসারের চিকিৎসা জনিত দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গগুলি তাঁর ছেলের কুঁচকি ক্ষতবিক্ষত করে চলবে।

ডিওমকা বিদায় নেওয়ার জন্য ওলেগ্ কস্টোগলোটভের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ওলেগ্ পা দুটো রেলিংয়ে তুলে আর মাথা বেডের বাইরে ঝুলিয়ে কোণাকুণি ভাবে শুয়ে ছিল। দু'জনে দু'জনকে ভাল করে দেখল। ওলেগ্ এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে আগের চেয়ে নিচুগলায়—ওর এখন জোরে কথা বলতে গেলে ফুসফুসের নিচে কি যেন একটা প্রতিধ্বনি হয়—বলল, "ঘাবড়িও না, ডিওমকা। এখানে লেভ্ লিওনডোভিচ্ আছেন। আমি তার কাজ দেখেছি। খুব সহজে তোমার পায়ের অপারেশন সেরে দেবেন।"

"তুমি লেভ্ লিওনডোভিচের কাজ দেখেছ?" ডিওমকার মুখভাব উজ্জ্বল হ'ল।

"হ্যাঁ। দেখেছি।"

"খুব ভাল কথা। আমার বরাত ভাল দেখছি।"

দু'পাশে ঝুলতে থাকা, লম্বা লম্বা হাতওলা, রোগা এই শল্য চিকিৎসকটি হাসপাতালের বারান্দায় এসে দাঁড়ানোই রোগীদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ওরা মনে মনে বুঝত, ওরা মাসের পর মাস ধরে দীর্ঘদেহী এই সার্জনটির পথ চেয়েছিল। হাসপাতালের সবক'টি সার্জনকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যদি রোগীদের বলা হত তোমরা বেছে নাও, ওদের প্রত্যেকে যে লেভ্‌কে বেছে নিত তাতে সন্দেহ নেই। লেভ্ বেজার মুখে হাসপাতালে চলাফেরা করতেন। কিন্তু রোগীরা বুঝত, সেদিন অপারেশন নেই বলে মুখ বেজার।

ছোট-খাটো, ক্ষীণ চেহারার ইউজেনিয়া উস্টিনোভা ও চমৎকার সার্জন, এবং ডিওমকার অপারেশনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু লেভের বাঁদরের মত লোমশ হাতের নিচে শুয়ে থাকা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কারণ রোগী বাঁচা বা

মরা যাই ঘটুক না কেন, তা তাঁর ভুলের জন্য হবে না। ডিওম্‌কারও তাই বিশ্বাস।

সার্জন আর রোগীর সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বাপ-ছেলের সম্পর্কের চেয়ে নিবিড়।

"উনি খুব ভাল সার্জন?" ডিওম্‌কার প্রাক্তন বেডের ফোলা-ফোলা চোখ নতুন রোগীটি অস্পষ্ট উচ্চারণে প্রশ্ন করল। লোকটিকে অন্যমনস্ক দেখায়। ও শীতে কাঁপছিল। ওয়ার্ডের ভেতরেও শীতের ঠেলায় ও অত্যন্ত মোটা, খসখসে কাপড়ের একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়েছে, কিন্তু তার বোতাম বা বেল্ট আঁটেনি। লোকটির বেশ বয়সও হয়েছে। ওর চাউনি এমন যেন মাঝ রাতে কেউ ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে ওকে ডেকে তুলেছে, এবং ঘুম থেকে উঠে ও ভীতির কারণ সনাক্ত করতে পারছে না।

"হুঁ, খু-ব ভাল," ডিওম্‌কার মুখভাব আবার উজ্জ্বল হ'ল। যেন ওর অপারেশন অর্দ্ধেক হয়ে গিয়েছে। "আপনারও অপারেশন হবে নাকি? আপনার কি হয়েছে?

"আমারও অপারেশন হবে" নবাগত জবাব দিল। সে যেন ডিওম্‌কার পুরো প্রশ্নটা শোনেইনি। ওর বড় বড় গোল চোখে একটুও আশ্বস্ত ভাব ফুটল না। চোখ দুটো হয় খুব বেশী মন দিয়ে কিছু দেখছিল, নয় কিছুই দেখছিল না।

ডিওম্‌কা চলে গেল। নবাগতের বেড ঠিকমত পেতে দিয়ে গেল। নবাগত দেওয়ালে হেলান দিয়ে, বড় বড় চোখ মেলে নীরবে বসে রইল। ওর চোখ দুটো গতিশীল নয়। ওয়ার্ডের কারো ওপর অনেক ক্ষণ ধরে স্থির থেকে তারপর আর কারো ওপর নিবদ্ধ হয়, কিংবা কারো পাশ দিয়ে শূন্যে প্রসারিত হয়। ওয়ার্ডের কোন শব্দ বা গতিতে লোকটির ভাবের ব্যত্যয় ঘটে না। ও কথা বলে না। প্রশ্ন করে না, প্রশ্নের জবাব ও দেয় না। ঘণ্টা খানেক ঐভাবে থাকার পর ওরা জানতে পারল ও ফরগনা'র বাসিন্দা। তারপর এক নার্স ওকে ডাকতে জানা গেল, ওর নাম শুলুবিন।

যেন এক পেঁচা। ও ঠিক তাই। গোল-গোল, একেবারে স্থির চোখ দুটো দেখে পাভেলের সঙ্গে সঙ্গে ঐকথা মনে হ'ল। ক্যানসার ওয়ার্ড এমনিতেই যথেষ্ট নিরানন্দ। সেখানে যে বস্তুর আদৌ প্রয়োজন নেই তা হ'ল এক নতুন পেঁচা আমদানি। শুলুবিন ড্যাবডেবে, বিষাদপূর্ণ চোখে এত বেশ ক্ষণ ধরে পাভেলের দিকে তাকিয়ে রইল যা অশোভন। ও পালা করে ওয়ার্ডের সবার দিকেই ঐ রকম করে চেয়ে রইল, যেন সবাই ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। এর ফলে ওয়ার্ডের জীবন আর আগের মত নির্বিঘ্ন রইল না।

এর আগের দিন পাভেল তার দ্বাদশতম ইন্‌জেকশন নিয়েছিল। ও ঐ ইন্‌জেকশনগুলোয় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন আর বিকার হয় না, কিন্তু মাথা ধরে। সাধারণ দুর্বলতা আছে। সবচেয়ে বড়

কথা, ও বুঝেছে ওর মরার আশঙ্কা নেই। সারা পরিবার ওর সঙ্গে খুবই ভয় পেয়েছিল। সে ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছে। টিউমারের অর্দ্ধেক ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। ঘাড়ের ওপর চেপে বসে থাকা টিউমারের বাকিটা এত নরম হয়ে গিয়েছে যে, টিউমারের দরুন অসুবিধা থাকলেও তা আগের মত বেদনাদায়ক নয়। ও এখন সহজে মাথা ঘোরাতে পারে। দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে। কিন্তু দুর্বলতা সহ্য করা যায়। বরং দুর্বলতার একটা ভাল দিক আছে—সারা দিন শুয়ে শুয়ে সচিত্র সাপ্তাহিক 'আগুনিয়ক' কিংবা ব্যঙ্গ—কার্টুন পত্রিকা 'ক্রোকোডিল' পড়া যায়; টনিক আর পছন্দ মত ভাল-মন্দ খাওয়া যায়। শুধু যদি মেলামেশা করার উপযোগী কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলা আর রেডিও শোনা যেত···বাড়ী ফেরার আগে তা হচ্ছে না। দুর্বলতা তেমন কিছু নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী অসুবিধে হয় যখন ডক্টর্ সোভা তাঁর লাঠির মত মজবুত আঙুল দিয়ে ওর বগলে জোরে জোরে খোঁচাখুঁচি করেন। উনি কিছু লক্ষ্য করেন। এক মাস ওয়ার্ডে থাকার ফলে পাভেল অনুমান করতে পারে, উনি কি খোঁজেন—আরেকটা টিউমার। উনি নিজের পরীক্ষাগারে ডেকে নিয়ে পাভেলকে শুইয়ে, ওর কুঁচকিতে এমন খোঁচাখুঁচি করেন তাতে ব্যাথা লাগে।

"নতুন কোন জায়গায় কি টিউমার দেখা দিতে পারে?" পাভেল সভয়ে প্রশ্ন করে। টিউমার কমে যাওয়ার আনন্দ চুপসিয়ে যায়।

"সেজন্যই আপনার চিকিৎসা করা হচ্ছে, অর্থাৎ যাতে আবার টিউমার দেখা না দেয়," ডক্টর্ সোভা মাথা নেড়ে বলেন, "কিন্তু আপনাকে আরো ইন্‌জেকশন দিতে হবে।"

"কতগুলো?" পাভেল সভয়ে প্রশ্ন করে। "সেটা পরে দেখা যাবে।" (ডাক্তাররা কখনো সোজা কথা বলে না)

দ্বাদশতম ইন্‌জেকশনের পরই ও এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল—ডাক্তাররা ওর রক্তের কোষ গণনা দেখে যেমন মাথা নেড়েছিলেন তা অনুমোদন সূচক নয়—যে ওর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, ও কি আরো বারোটা ইন্‌জেকশনের ধকল সইতে পারবে? যে ভাবেই হোক অসুখটা ওকে হারিয়ে দিচ্ছিল। টিউমার কমেছে বটে, কিন্তু তাতে আনন্দ পাওয়ার কারণ নেই। সারা দিন শুয়ে কাটলেও, অস্বস্তিতে কাটে। হ্যাঁ, এমন কি হাড্ডিচুষও নরম হয়ে গিয়েছে। ওর ফোঁস-ফাঁস আর গর্জন-তর্জন থেমে গিয়েছে, এবং সেটা ওর লোক দেখানো ভদ্র আচরণ নয়, আসলে রোগ ওকেও চেপে ধরেছে। আগের চেয়ে অনেক বেশী দেখা যায় ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেডের বাইরে মাথা ঝুলিয়ে, চোখ কপালে তুলে রয়েছে। আর পাভেল তখন মাথা ধরার পাউডার খেয়ে, ভিজে ন্যাকড়ায় কপাল আর চোখ ঢেকে পড়ে থাকে। ঐভাবে দু'জনে শান্তিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শান্তিতে শুয়ে থাকে, লড়াই হয় না।

সিঁড়ির বাঁকে যে ছোট্ট হয়ে যাওয়া রোগীটি দিন-রাত অক্সিজেন বেলুন থেকে শ্বাস নিত তাকে লাশ-ঘরে নিয়ে গিয়েছে। চওড়া সিঁড়ির বাঁকের ওপর লাল কাপড়ে সাদা হরফে একটা বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিয়েছেঃ রোগীরা একে অপরের অসুস্থতা নিয়ে আলোচনা করবেন না।

ঐ রকম সহজে দৃশ্যমান জায়গায় অত ভাল লাল ক্যালিকোয় অক্টোবর বিপ্লব বা পয়লা মে পালনের বিজ্ঞপ্তি থাকলে, অবশ্য, অনেক বেশী শোভন হ'ত। কিন্তু আবাসিক রোগীদের কাছে এ আবেদনটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পাভেল কয়েকজনকে কয়েকবার এ বিষয়ে বলেছেও, নিজেদের রোগের কথা আলোচনা করে নিজেরা বৃথা বিচলিত হবেন না।

মোটামুটি বলা চলে যে সবক'টি টিউমার রোগীকে একই জায়গায় না রেখে সাধারণ হাসপাতালে তাদের ছড়িয়ে দিলে কাজটা অনেক সুষ্ঠু আর চতুরতা পূর্ণ হ'ত। তাহলে এক রোগীর কথা অপরের কাছে গোপন থাকত, কেউ কাউকে ঘাবড়িয়ে দেওয়ার প্রশ্ন উঠত না। অনেক বেশী মানবিকতা পূর্ণও হ'ত।

কত রোগীই ত' ক্যানসার ওয়ার্ডে আসে আর যায়, কিন্তু কাউকেই তেমন হাসিখুশি লাগে না। সবারই সব সময় মিওনো, বিষণ্নভাব। ব্যতিক্রম শুধু আহমদজান। ও আর ক্রাচ ব্যবহার করে না। খুব শীগগিরই ছাড়া পাবে। মাঝে মাঝে সাদা ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসে। কিন্তু তাতে ও ছাড়া আর কেউ খুশি হয় না। সম্ভবতঃ ঈর্ষান্বিত হয়।

জানলার কাঁচে অনবরত বৃষ্টির কণা লেগে ধূসর হওয়া দিনটায় মনে হচ্ছিল দুপুরের আগেই ঘরে বাতি জ্বেলে দিলে ভাল হয়, তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে এলে বাঁচা যায়। এমন নিরানন্দ দিনে নবাগত পেঁচা-চোখো আমদানি হওয়ার ঘণ্টা কয়েক পরে হঠাৎ এক বেঁটে-খাটো, তেজী হাব-ভাব লোক নার্সের আগে আগে স্বাচ্ছ্য-দৃপ্ত ভঙ্গীতে সোজা ঘরে ঢুকে এল। ও ঠিক ঘরে ঢুকে এল না, চড়াও হ'ল। যেন ওর অভ্যর্থনার জন্য সৈনিকরা সাম্মানিক কুচকাওয়াজের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এমন সময় ও অবতীর্ণ হ'ল। সবাই বেডে শুয়ে অস্থিরপনা করছে দেখে ও থমকিয়ে দাঁড়াল। শিস দিল। তারপর ছদ্ম ধমকের সুরে বলল," কি, আপনারা সব নেশা করে ঝিমোচ্ছেন নাকি, না হাত-পাগুলো কুঁকড়িয়ে গিয়েছে ?"

যদিও কেউই নবাগতকে ফৌজী অভ্যর্থনা জানায়নি, ও তবু তাদের আধা-ফৌজী সেলাম সহ অভিবাদন করে বলল, "আমি ম্যাক্সিম পেত্রোভিচ্ চ্যালি। পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম। আপনারা এবার সহজ ভঙ্গীতে দাঁড়াতে পারেন।"

ওর মুখে ক্যানসার জনিত ক্লান্তির ছাপ নেই। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর হাসি। কয়েকজন ওর হাসির জবাবে হাসল। পাভেল তাদের একজন। এক মাস ক্লীব গুলোর সঙ্গে কাটানোর পর ও যেন মনের মত একজনকে পেয়েছে।

"অতএব, এবার ··" ও কাউকে কোন প্রশ্ন না করে চট করে নিজের বেড চিনে সতেজ পায়ে বেডের দিকে এগোলো। বেডটা পাভেলের পাশে। মুরসালিমভ্ ঐ বেডে ছিল। ও বেডে চাপ দিয়ে বসে এপাশ-ওপাশ করল। বেডটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল। "শতকরা ষাট ভাগই নষ্ট হয়ে গিয়েছে," ও মন্তব্য করল, "বড় ডাক্তার দেখছি ছুঁচোর মত লোকদের ভর্তি করেননি।"

ও নিজের জিনিষপত্র বের করতে লাগল। দেখা গেল বের করার মত ওর প্রায় কিছুই নেই। ওর হাতে কোন থলে-টলে ছিল না। এক পকেট থেকে বেরোল একটা দাড়ি কামানোর ক্ষুর, অপর পকেট থেকে প্যাকেট এক তাস, প্রায় নতুন। ও তাসের প্যাকেট ফেটাতে ফেটাতে চালাক চোখে পাভেলের দিকে চেয়ে বলল, "খেলেন নাকি?"

"হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে খেলি," পাভেল ভদ্র জবাব দিল।

"কি খেলেন, কন্ট্র্যাক্ট ব্রিজ?"

"না, ক্যাসিনো খেলি।"

"ওটা কোন খেলা নয়," চ্যালি বলল, "টুয়েণ্টিওয়ান কিংবা রামি খেলেন না?"

"না, ঠিক····· শেখা হয়ে ওঠেনি," পাভেল বিব্রত।

"এখানে শিখিয়ে দেব, আর কোথাও যেতে হবে না," চ্যালি সোৎসাহে বলল, "ঐ একটা কথা আছে না: আপনার অজানা থাকলে জানিয়ে দেব, আপনি না করলে আপনাকে করিয়ে ছাড়ব।"

চ্যালি হাসছিল। ওর নাকটা মুখের তুলনায় বড্ড বড়। নরম, লালচে, বড়-সড় নাকের জন্য মুখটা সরল, প্রাণখোলা দেখায়। "পৃথিবীর সেরা খেলা রামি," ও বিজ্ঞের মত বলল, "রামি খেলায় তাস না দেখেও বাজী ধরা যায়।"

ও এর মধ্যে পাভেলকে উৎসাহী খেলোয়াড় ধরে নিয়েছিল। ও আরো কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি খুঁজছিল। কিন্তু কাছাকাছি লোকজনকে দেখে আশান্বিত হচ্ছিল না।

"আমি শিখব," চ্যালির পেছন থেকে আহমদজান বলল। "চমৎকার," চ্যালি বলল, "দুটো বেডের মাঝে একটা টেবিল পাতার ব্যবস্থা করুন।"

চ্যালি সারা ওয়ার্ডে আরেকবার নজর বুলিয়ে নিল। শুলুবিনের স্থির দৃষ্টি চোখে পড়ল। তারপর রুপোর মিহি সুতোর মত ঝুলন্ত গোঁফ আর গোলাপী পাগড়ী মাথায় উজবেকের ওপর চোখ পড়ল। ঠিক তখন বালতি আর একটা ন্যাতা হাতে নিয়ে নেলিয়া এল। নেলিয়াকে মেঝেগুলো আরেকবার মুছতে বলা হয়েছিল।

"আহ্-হা!" চ্যালি সোৎসাহে তারিফ করে বলল, "বাঃ, খাসা মেয়ের সন্ধান পেয়েছি! এতক্ষণ ছিলে কোথায়? দু'জনে একটু দোলনায় দুলে নিতে পারতাম, পারতাম না?"

নেলিয়ার মোটা ঠোঁট দুটো এগিয়ে এল। ওটাই ওর হাসির ধরন।

"খুব দেরী হয়ে গিয়েছে বুঝি? কিন্তু আপনি ত' অসুস্থ। অসুস্থ পুরুষ দিয়ে কোন্ মেয়ের কি লাভ হবে?"

"কথায় বলেঃ রোজই যদি মেয়ে জোটে, ডাক্তার লাগবে না মোটে," চ্যালি বলল, "তোমার আমাকে দেখে ভয় করছে নাকি?"

"আপনাকে ভয় পেতে যাব কেন? আপনি একটা ব্যাটাছেলে নাকি?"

"তোমার পুরো খবর নেওয়ার মত ব্যাটাছেলে ঠিকই আছি। একটুও ভেবো না," চ্যালি বলল, "নাও, মেঝে মুছে নাও, ততক্ষণ সব দিক থেকে তোমার রূপ দেখে নিই।"

"প্রাণ ভরে দেখুন না। পয়সা লাগবে না," নেলিয়া জবাব দিল। ও বেশ মজা পাচ্ছিল। ও মেঝে মুছতে লাগল।

হয়ত মানুষটা আদৌ অসুস্থ নয়। কোথাও কোন ক্ষত বা ঘা দেখা যায় না। মুখে ও কোন আভ্যন্তরীণ বেদনার ছাপ নেই। না, এই ওয়ার্ডে নজিরবিহীন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিজেকে সংযত রেখে আদর্শ সোভিয়েত পুরুষ হিসেবে নিজেকে জাহির করার প্রয়াস? পাভেল ঈর্ষান্বিত হ'ল। "কিন্তু আপনার কি হয়েছে?" ও চ্যালিকে নিচু গলায় প্রশ্ন করল।

"আমার?" চ্যালি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আমার পলিপস্ হয়েছে।"

পলিপস্ কি ওয়ার্ডের কেউ তা জানে না। পাভেল বলল, "ওতে ব্যথা লাগে?"

"যখনই ব্যথা লাগা শুরু হ'ল, এখানে চলে এলাম। এরা কাটবে ত'? কাটুক। এ দিয়ে কি হবে?"

"না, রোগটা হয়েছে কোথায়?" পাভেল সমীহ করে প্রশ্ন করল।

"মনে হয়, পেটে," নিরুদ্বিগ্ন চ্যালি বলল, "বুঝতে পারছি আমার এই খানদানি পেটটা কেটে তিন ভাগই বাদ দিয়ে দেবে।" ও হাত দিয়ে করাত চালানোর ভঙ্গী করে চোখ টিপে হাসল।

"তাহলে আপনি কি করবেন?" পাভেল বিস্মিত।

"কিস্সু করব না। স্রেফ অভ্যাস হয়ে যাবে। তারপর যত কাল ঐ পেটে ভদকা সহ্য হবে, চিন্তা নেই।"

"আপনার অসাধারণ সংযম ত'?"

"আমার কথা শুনুন," চ্যালি পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে বলল। ওর লালচে, বড় নাক আর চোখে সরলতা প্রতিভাত। "বকর-বকর কম করলে ঘাবড়াবেনও কম। কথা কম, ব্যথাও কম। এই আমার উপদেশ।"

এমন সময় আহমদজান একটা প্লাইউডের তক্তা নিয়ে হাজির হ'ল। ওরা তক্তাটা চ্যালি আর পাভেলের বেডের মাঝখানে লাগিয়ে একটা টেবিল বানিয়ে ফেলল। আহমদজান খুশি হয়ে বলল, "এটা অনেক ভদ্রস্থ দেখাচ্ছে।"

"বাতি জেলে দিন," চ্যালি হুকুম করল।

আলো জেবলে দেওয়া হ'ল। ঘরের পরিবেশ উজ্জ্বল হ'ল। "বেশ, এবার চতুর্থ খেলোয়াড় কে হবেন ?"

চতুর্থ জনকে পাওয়া গেল না।

"ছেড়ে দিন, আপনি চতুর্থ জন ছাড়াই আমাদের খেলাটা বোঝান," পাভেল বলল। ও মেঝেয় পা ঝুলিয়ে সুস্থ মানুষের মত বসেছিল। এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাতে কষ্ট কম লাগছিল। হোক না সামান্য একটা তন্দ্রা। পাভেল কল্পনা করছিল, ও ঘরের চাল থেকে ঝুলন্ত, নক্সাকাটা শেডওলা বাতির আলোয় আলোকিত এক ছোট্ট, সুন্দর তাস খেলার টেবিলে বসে তাস খেলছে। সাদা জমির ওপর লাল আর কালো নক্সা করা তাসগুলো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। চ্যালিই হয়ত ঠিক বলেছে। অসুস্থতা সম্পর্কে ওর যা আচরণ সে আচরণ অবলম্বন করতে পারলে অসুস্থতা হয়ত আপনা থেকে সেরে যেত। সব সময় মন ভারী করে কি হবে ?

"আর অপেক্ষা করে কি হবে ?" আহমদজানও বাকি সবার মত অধীর হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ, আরম্ভ করি।" চ্যালি প্যাকেটের সব তাস দ্রুত ফেটিয়ে ফেলতে লাগল। অপ্রয়োজনীয় তাসগুলো বাদ দিয়ে সবকটা তাস নিজের সামনে রাখল। "এই খেলায় নয় থেকে টেক্কা অব্দি তাস কাজে লাগে। দাম হিসেবে প্রথম চিড়িতন, তারপর রুইতন, হরতন এবং ইস্কাবন।" ও আহমদজানকে বলল. "আপনি বুঝেছেন ?"

"হ্যাঁ, বুঝেছি." আহমদজান খুব খুশি।

চ্যালি বাছাই করা তাসগুলো নিয়ে আবার ফেটাতে ফেটাতে বোঝাতে লাগল, 'প্রত্যেক খেলোয়াড় পাঁচটা করে তাস পাবে। বাকি তাস এখানে থাকবে, তার থেকে টানতে হবে। খেলাটা জোড় মেলানোর। ঠিকমত জুড়ি মেলাতে না পারলে হবে না। যেমন টেক্কার সঙ্গে টেক্কা, ইত্যাদি··· তারপর সবার জুড়ি মিলে গেলে বাজী শেষ···"

"আপনাদের মধ্যে চ্যালি কে ?" দোরগোড়া থেকে কেউ হাঁকল, "প্যারেড করতে করতে চলে আসুন। আপনার স্ত্রী এসেছেন।"

"সে কি একটা থলেও নিয়ে এসেছে ?···ঠিক আছে, বন্ধুগণ, আমি একটু পরেই ফিরে আসছি।" চ্যালি চলল !

ওয়ার্ডে আবার সব চুপচাপ। আলো জ্বলছিল, যেন সন্ধ্যে হয়েছে। আহমদজান নিজের বাঙ্কে ফিরে গেল। নেলিয়া ঘর মুছছিল বলে সবাই পা তুলে বসল।

পাভেল শুয়ে পড়ল। মাথার এক পাশে প্যাঁচা-চোখের দুর্নিবার, অবিশ্রাম তিরস্কার স্বরূপ দৃষ্টির চাপ পড়ছিল। সে চাপ থেকে রেহাই পেতে পাভেল প্রশ্ন করল, "আপনার কি হয়েছে, কমরেড ?"

প্যাঁচা-চোখো, বিষণ্ণ বুড়োর জবাব দেওয়ার ভদ্রতারও তোয়াক্কা নেই। যেন ওকে প্রশ্ন করা হয়নি। ও লাল আর তামাক-বাদামী রঙের ভাঁটা ভাঁটা চোখে পাভেলের মাথার ওপর দিয়ে কোথাও চেয়ে রইল। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেও তা না পেয়ে পাভেল তাসগুলো নাড়া-চাড়া করতে লাগল। এমন সময় বুড়োর ফাঁপা গলা শোনা গেল, "ঐ যা হয়ে থাকে।"

যা হয়ে থাকে! বিরক্তিকর বুড়ো! পাভেল এবার আর ওর দিকে ফিরে না তাকিয়ে, শুয়ে ভাবতে লাগল।

চ্যালি আর তাসের আগমনে পাভেল কিছুটা ভুলেছিল। কিন্তু সবকিছুর চেয়ে বেশী ও যা চাইছিল তা, খবর কাগজ। আজ স্মরণীয় দিন [৫ই মার্চ ১৯৫৫ স্ট্যালিনের মৃত্যুর দ্বিতীয় বার্ষিকী]। ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই তাৎপর্য-পূর্ণ দিন। খবরকাগজ দেখে অনেক জল্পনা-কল্পনা করতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ ত' প্রতিটি দেশবাসীর নিজের ভবিষ্যৎও বটে। খবরকাগজের সব পৃষ্ঠাই শোক জ্ঞাপক কালো বর্ডার দিয়ে ঘেরা থাকবে, না স্রেফ সামনের পৃষ্ঠা? সারা পৃষ্ঠা জোড়া স্ট্যালিনের ছবি থাকবে, না সিকি পৃষ্ঠা ছবি থাকবে? মূল সম্পাদকীয় নিবন্ধের কথাগুলি কি ধরনের হবে? ফেব্রুয়ারিতে অতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদচ্যুতির পরিপ্রেক্ষিতে কাগজের এই নিবন্ধের বয়ান হবে তাৎপর্যপূর্ণ। পাভেল এখন কাজে বহাল থাকলে কারো থেকে সবই জেনে নিতে পারত, কিন্তু এখানে খবরকাগজই একমাত্র সম্বল।

নেলিয়া ঘর মুছছিল। প্রতিটি বেডের নিচে ঢুকে পরিষ্কার করতে অসুবিধে হচ্ছিল। কোথাও ওর সহজে কাজ করার মত যথেষ্ট চওড়া জায়গা নেই। ও তবু চটপট কাজ সারল। গুটিয়ে রাখা কার্পেটও আবার মেলে দিল।

ভাদিম ঘরে এল। ও রশ্মি-চিকিৎসার ঘর থেকে আসছে। দুষ্ট পা-টা সাবধানে ফেলে, ব্যথায় ঠোঁট কামড়িয়ে ধরে, ও এগিয়ে এল। হাতে খবর কাগজ।

পাভেল ওকে ইশারা করল "ভাদিম, এখানে বসো।"

ভাদিম একটু ইতস্ততঃ করে পাভেলের বেডের দিকে এগোল। ও প্যান্টের ভাঁজ আলগা করে ধরে রাখল, যাতে ঘায়ে ঘষা না লাগে।

ভাদিম যে ইতিমধ্যে কাগজটা খুলে দেখেছে তা বোঝাই যাচ্ছিল, কারণ কাগজটা তাজা কাগজের মত ভাঁজ করা নয়। ভাদিমের থেকে কাগজটা নিতে গিয়েই পাভেল লক্ষ্য করল যে কাগজের কোথাও কালো বর্ডার নেই, প্রথম কলমে কোন ছবিও নেই। ও আরো ভাল করে দেখেও কোথাও কোন ছবি, কালো বর্ডার, এমন কি বড় বড় অক্ষরের হেড লাইনও দেখতে পেল না। মনে হ'ল, কোন প্রবন্ধও নেই।

"আজকের কাগজটায় কিছু নেই, তাই নয়?" পাভেল ভাদিমকে প্রশ্ন করল। ও তেমন ভরসা করে মনের ক্ষোভ জানাতে পারছিল না।

ও ভাদিমকে কতটুকু বা চেনে। ভাদিম কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য বটে, কিন্তু বয়স খুবই কম। ও কোন উচ্চপদাধিকারী নয়, স্রেফ কারিগরী বিদ্যার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণ করা এক কর্মী মাত্র। ওর মাথায় কোন্ মতলব কিলবিল করছে তা কে জানে। একবার অবশ্য, ভাদিমকে ঘিরে পাভেলের অনেক আশা হয়েছিল। ওয়ার্ডের রোগীরা নির্বাসিত জাতি গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে কথা বলছিল। ভাদিম তার ভূ-তত্ত্বের বই থেকে মাথা তুলে পাভেলের দিকে তাকাল, কাঁধ ঝাঁকাল, আর এত আস্তে মন্তব্য করল যে শুধু পাভেলই শুনতে পেল, "নিশ্চয়ই তার কোন কারণ ছিল। আমাদের দেশে অকারণে কাউকে নির্বাসন দেওয়া হয় না।"

ঐ মন্তব্য করে ভাদিম নিজেকে অবিচল নীতিনিষ্ঠ, বিবেচনা সম্পন্ন মানুষ প্রতিপন্ন করেছিল।

অচিরেই দেখা গেল পাভেল লোক চিনতে ভুল করেনি। ও যা খুঁজছিল, তা ভাদিমকে সবিস্তারে বোঝাতে হ'ল না। ভাদিম নিজেই তা দেখে রেখে-ছিল। আবেগ বাহিত হয়ে পাভেল যে বিশেষ প্রবন্ধটা লক্ষই করেনি, ভাদিম সেদিকে ইঙ্গিত করল।

একটা সাদা-মাটা প্রবন্ধ, যা অন্যগুলির চেয়ে পৃথক নয়। ছবি বর্জিত প্রবন্ধটি লিখেছেন রুশ বিজ্ঞান আকাদমির এক সদস্য। স্ট্যালিনের মৃত্যুর দ্বিতীয় বার্ষিকী পালন বা তদুদ্দেশ্যে সারা জাতির শোক জ্ঞাপন, প্রবন্ধটির উপজীব্য বিষয় নয়। প্রবন্ধের কোথাও বলা নেই, "তিনি জীবিত আছেন, চিরকালই জীবিত থাকবেন।" প্রবন্ধটির নাম: 'স্ট্যালিন এবং নির্মাণের পথে ক'টি সমস্যা।' [নির্মাণ অর্থাৎ কমিউনিস্ট আদলে নতুন সমাজ নির্মাণ]

শুধু ঐটুকু। 'নির্মাণের সমস্যা'ই বা কেন, 'অরণ্য রক্ষা কবচ' সম্পর্কে লিখতে পারল না? [প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করার এক শেষ রাজসিক স্ট্যালিনী পরিকল্পনা, যা পরবর্তী আমলে বর্জিত হয়েছিল] কিংবা সামরিক বিজয়গুলো সম্পর্কে? স্ট্যালিনের দার্শনিক প্রতিভা সম্পর্কে লিখতে পারল না? মহান বিজ্ঞানী স্ট্যালিন সম্পর্কেও কিছু লেখা গেল না? সমগ্র রুশ জনগণের স্ট্যালিনের প্রতি গভীর প্রেম সম্পর্কেও ত' কিছু লেখা যেত

চশমা পরা পাভেল ভুরু কুঁচকিয়ে ভাদিমের রোদে পোড়া মুখের দিকে চাইল। "ওরা কি করে এ রকম লিখতে পারল? এ্যাঁ?…"ও সাবধানে ভাদিমের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে ওলেগ্‌কে দেখে নিল। মনে হ'ল ওলেগ্ ঘুমোচ্ছে। দু'চোখ বোজা। মাথা বেডের নিচে ঝুলছে। "দু'মাস, মাত্র দু'মাস আগের কথা মনে পড়ছে? হ্যাঁ তখনই ত' তাঁর পঁচাত্তরতম জন্মদিন গেল। সব আগের মত ছিল। বিরাট ছবি, তার সঙ্গে বড় বড় হরফে হেডলাইন, 'মহান উত্তরাধিকারী' লেখা থাকত। তাই নয়? মনে পড়েছে?"

না, ভয় নয়। স্ট্যালিনের পরে যারা রয়ে গেল তাদের কি হবে, এ ভীতি

ওর দুশ্চিন্তার উৎস নয়। অকৃতজ্ঞতা। তাঁর মহান সেবার আদর্শ, তাঁর অনিন্দ্য কৃতিত্বের গৌরব আজ নিষ্ঠিবন নিক্ষিপ্ত এবং পদদলিত,—এটাই পাভেলের দুঃখ। শাশ্বত কালজয়ী 'গৌরব' গাথা যদি মাত্র দু'বছরে মথিত হতে পারে, বরিষ্ঠের বরিষ্ঠদেরও শ্রদ্ধার পাত্র সেই 'প্রিয়তম এবং বিজ্ঞতম' সত্তাকে যদি চব্বিশ মাসের ব্যবধানে উৎপাটিত করে গোপনে লুকিয়ে ফেলা হয়, তবে কি বাকি থাকে? মানুষ কিসের ওপর ভরসা করবে? এই পরিস্থিতিতে কি কারো রোগমুক্তি সম্ভবপর?

"শুনুন", ভাদিম খুব নরম সুরে বলল, "সম্প্রতি জারী হওয়া এক সরকারী আদেশে কেবল জন্মদিন পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মৃত্যুদিন নয়। কিন্তু, প্রবন্ধটা পড়ে, অবশ্য · " ভাদিম সখেদে মাথা নাড়ল।

ভাদিমও অবমানিত বোধ করছিল, বিশেষতঃ ওর বাপের কথা মনে করে। ওর বাবা স্ট্যালিনকে সত্যিই ভালবাসত। ভদ্রলোক নিজেকে যতটুকু ভালবাসতেন তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসতেন স্ট্যালিনকে। নিজের জন্য কখনো কিছু পাওয়ার চেষ্টাই করেননি। লেনিন, এমন কি নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের চেয়ে, স্ট্যালিনকে ভালবাসতেন। নিজের পরিবারের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে, এমন কি ঠাট্টা-তামাসা করেও কথা বলতেন। কিন্তু স্ট্যালিন সম্পর্কে কখনো না। স্ট্যালিনের নামোল্লেখে তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠত। ওঁর নিজের বসবার ঘরে, খাবার ঘরে আর ছেলেদের শিশু অবস্থায় থাকার ঘরে একটা করে স্ট্যালিনের ছবি টাঙানো থাকত। বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা মোটা মোটা ভুরু আর গোঁফওলা, কঠোর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্ট্যালিনকে দেখত। ঐ মুখের মালিকের পক্ষে ভয় পাওয়া বা লঘু আনন্দ উপভোগ করা অসম্ভব। তাঁর সব আবেগ যেন ঐ জ্বলজ্বলে, ভেলভেট-কালো চোখে কেন্দ্রীভূত।

স্ট্যালিনের কোন বক্তৃতা কোথাও ছাপা হলে ভাদিমের বাবা তা প্রথমে নিজে মন দিয়ে পড়ত। তারপর তার নির্বাচিত অংশ ছেলেদের পড়ে শোনাত; তার অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করত; বোঝাত, স্ট্যালিন তাঁর বক্তব্য কত সুচতুরভাবে উপস্থিত করেছেন; এবং তার বক্তব্যের ভাষা কত সুন্দর। অনেক পরে, তখন আর ওর বাবা বেঁচে নেই, ভাদিমের মনে হত স্ট্যালিনের বক্তব্যের ভাষা কেমন যেন জোলো, স্বাদহীন! চিন্তাধারাও তেমন সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত নয়। ঐটুকু চিন্তাধারা প্রকাশ করার জন্য অতগুলি কথা ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন। তবু ভাদিম কখনো স্ট্যালিনের বক্তব্য সম্পর্কে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেনি, বরং স্বীকার করেছে যে বাল্যে স্ট্যালিন প্রশস্তি সঞ্চারিত হওয়ার ফলে তা ওর নিজের পূর্ণ মানব হিসেবে বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

ছবিটা আজও ভাদিমের মনে অম্লান হয়ে আছে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর দিন। সবাই কেঁদেছে। বয়স্ক, যুবা, শিশু কেউ বাদ যায়নি। মেয়েরা ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, ছেলেরা অনবরত চোখ মুছেছে। অত সার্বজনিক অশ্রু

বিসর্জন দেখে মনে হয়েছিল কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রয়াণে এ অশ্রু প্লাবন নয়, যেন বিশ্বে কোথাও ফাটল ধরেছে। মানব সমাজ যদি এর পরও টিকে থাকে তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দিনটা তার স্মৃতিতে কৃষ্ণতম দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

আর আজ দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে কেউ কয়েক ফোঁটা কালি খরচ ক'রে ঘোষণাটাকে কালো বর্ডারে ঘিরে দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। যে শেষ কথাটি উচ্চারণ করে অগণিত সৈন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে শেষ নিঃশ্বাসে ঢলে পড়েছে তা ঐ ব্যক্তির নাম। অথচ তারই জন্য দুটো উত্তাপ ভরা সরল কথা লেখা গেল না: "দু'বছর আগে এই দিনে লোকান্তরিত হয়েছেন..."

না, এটা শুধু ভাদিমের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপার নয়। শুধু শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব হলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কাটিয়ে উঠতে পারত। যেকোন দিক থেকে দেখা যাক না কেন প্রয়াত মহান ব্যক্তিটিকে সম্মান জানানোই সুবিবেচনা প্রসূত কাজ। স্ট্যালিন মানেই স্বচ্ছতা, স্ট্যালিন মানে এই দেদীপ্যমান প্রতীতি যে আগামীকাল গতকালের থেকে পৃথক হবে না। স্ট্যালিন বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীকে উচ্চাসন দিয়েছিলেন। বিজ্ঞান চর্চাকে তুচ্ছ রোজগার আর দৈনন্দিন আপোষ-রফা থেকে মুক্ত করেছিলেন। বিজ্ঞানের স্বার্থেই স্টালিনী স্থায়িত্ব প্রয়োজন। সে স্থায়িত্ব সমাজের গঠন সম্পর্কিত তর্কের মীমাংসা বা অবিকশিতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কিংবা মূর্খকে তার হিতসাধন সম্পর্কে প্রীতি আনয়ন, ইত্যাদি বিপর্যয়ে বিজ্ঞানচর্চা—যার স্বার্থ সবার ওপরে স্থান পাওয়ার যোগ্য এবং যা অত উপকারী—বিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে সক্ষম।

ভাদিম সাবধানে পা ফেলে, ভারাক্রান্ত মনে বেড়ে ফিরে চলল।

এরপর চ্যালি ফিরে এল। চ্যালি খুব খুশি। হাতে থলে ভর্তি খাবার-দাবার। ওর টেবিল-আলমারি পাভেল আর ওর বেডের মাঝখানে নয়, তার পরের সারিতে। ও নিজের টেবিল-আলমারিতে থলে খুলে তৃপ্তির হাসি হাসল। "এই হয়ত শেষ বারের মত ভাল-মন্দ খেতে পাচ্ছি। অপারেশনের পর পেটে নাড়ি-ভুঁড়ি ছাড়া কিছুই থাকবে না।"

চ্যালির হাবভাব পাভেলের আরো ভাল লাগল। কি দারুণ আশাবাদী মানুষ। চমৎকার লোক!

"লেবুতে জারানো টমাটো......" চ্যালি থলে খুলে চলল। ও আঙুল দিয়ে জার থেকে একটা টমাটো তুলে মুখে পুরেই, চোখ বুজল। "আঃ বেড়ে হয়েছে!" ও বলল, "এ দেখছি মাংসের রসা, কাইও রয়েছে।" ও আঙুল ডুবিয়ে দেখে আঙুল চেটে নিল। "মেয়েদের হাতগুলো সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়।"

চ্যালি নিঃশব্দে মদের একটা আধ লিটার বোতল আলমারিতে লুকাল। ওর দেহ ওর কাজ-কর্মকে ঘরের সবার দৃষ্টি থেকে আড়াল করলেও, পাভেল

সবই দেখতে পাচ্ছিল। ও পাভেলকে চোখ টিপল। "আপনি স্থানীয় লোক?" পাভেল প্রশ্ন করল।

"না-আ। আমি স্থানীয় নই। কখনো কখনো এ অঞ্চল দিয়ে নিজের কাজে যাতায়াত করি বটে।"

"কিন্তু আপনার স্ত্রী ত' এখানে থাকেন, তাই নয়?"

চ্যালি ততক্ষণে খালি থলে ফেরৎ দিতে চলেছে বলে পাভেলের প্রশ্ন শুনতে পেল না।

চ্যালি ফিরে এসে আবার নিজের আলমারি খুলল। একটা টমাটো মুখে পুরে, আলমারির দরজা বন্ধ করে দিল। খুশিতে দু'পাশে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "আরে, আমাদের খেলা থেমে আছে কেন? খেলা চলুক, চলুক।"

ইতিমধ্যে আহমদজান একটি চতুর্থ খেলোয়াড় জোগাড় করে ফেলেছিল। খেলোয়াড়টি সিঁড়ির বাঁকে জায়গা পাওয়া এক কাজাক্ যুবক। আহমদজান হাত-পা নেড়ে, অনেক সময় ব্যয় করে ওকে 'আমাদের রুশ ছেলেরা' কি করে তুর্কীদের হারিয়েছিল সেই কাহিনী শোনাচ্ছিল। [আহমদজান গত সন্ধ্যায় অন্য এক বিভাগে গিয়ে 'প্লেভ্না দখল' নামে একটি ছায়াছবি দেখে এসেছিল। ১৮৭৭-৭৮ এর রুশ-তুর্কী যুদ্ধে রুশরা প্লেভ্না অধিকার করেছিল। পরিহাসের বিষয় হল, আহমদজান আর কাজাক্ যুবক দু'জনই তুর্কী উপজাতির মানুষ]

আহমদজান আবার দুই বেডের মাঝখানে তক্তা জুড়ে টেবিল তৈরি করল। আগের চেয়ে খুশি চ্যালি চটপটে হাতে কয়েক বার তাস ফেটিয়ে নিয়ে খেলোয়াড়দের কয়েকটা খেলার উদাহরণ দেখিয়ে ছিল। "এই দেখুন, পাঁচটা তাসের মধ্যে তিনটে এক রঙ আর দুটো আরেক রঙের হলে চেক্‌মেক্ হবে। আপনি চেক্‌মেক হলেন, বুঝলেন?"

"আমি চেক্‌মেক্ নই," আহমদজান মাথা নেড়ে, কিন্তু না চটে গিয়ে বলল, "ফৌজে যোগদানের আগে আমি চেক্‌মেক্ ছিলাম।" [রুশরা উজ্‌বেক্‌দের বিদ্রূপ করে ঐ নামে ডাকে]

"আচ্ছা বেশ। এবার দেখুন পাঁচটা তাসই এক রঙের হলে, ফ্লাশ হবে। অর্থাৎ সে বেশী নম্বর পেল। তার নিচে, কেউ একই রঙের চার তাস আর অন্য রঙের একটি তাস পেলে স্ট্রেট ফ্লাশ হবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী নম্বর হবে যদি রয়্যাল স্ট্রেট ফ্লাশ হয়··· এই যে··· "

খেলাটা সবার কাছে পরিষ্কার হ'ল না। চ্যালি বলল, খেলতে খেলতে আরো ভাল করে বোঝা যাবে। চ্যালি এত অকপট, সোজাসুজি আর বন্ধুত্ব-পূর্ণ সুরে কথা বলছিল যে পাভেলের ওকে ভাল লেগে গেল। পাভেল ভাবতেও পারেনি, হাসপাতালে ওর মত মিশুকে, ভাল মানুষের দেখা পাওয়া যাবে। এখানে একটা ছোট্ট, সুন্দর, বন্ধুত্বপূর্ণ 'গোষ্ঠী' গড়ে উঠছে যার বৈঠক

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলবে। হয়ত রোজই বৈঠক বসবে। তবে আর অসুখের কথা ভেবে কি হবে? অন্য অপ্রিয় কথাই বা কি দরকার? চ্যালি ঠিকই বলেছে।

পাভেল সবে ভাবছিল বলবে যে, খেলাটা পুরোপুরি আয়ত্ব না হতে ওরা টাকা-পয়সা বাজী রেখে খেলবে না, এমন সময় দোরগোড়ায় কাউকে দেখা গেল। সে বলল, "আপনাদের মধ্যে চ্যালি কে?" "আমি চ্যালি।"

"আমার সঙ্গে আসুন। আপনার স্ত্রী দেখা করতে এসেছেন।"

"বোকা কুত্তি!" চ্যালি বিরক্তির অভিব্যক্তি ছাড়াই বলে উঠল, "ওকে বলেছিলাম শনিবারে এসো না, রোববারে এসো। এখন দু'জনে নিশ্চয় দেখা হয়ে গিয়েছে, হয়নি? বন্ধুগণ, আমাকে মাফ করুন। আমি দেখা করে আসছি।"

খেলায় বাধা পড়ল। আহমদজান আর কাজাক্ ছেলেটি তাস নিয়ে নিজেদের জায়গায় চলল। ওরা সেখানে খেলাটা রপ্ত করে নেবে।

পাভেলের মনে টিউমার আর পাঁচই মার্চ-এর দুর্ভাবনা ফিরে এল। ও আবার বুঝতে পারছিল, পেঁচা-চোখো কু-নজরে তাকিয়ে আছে। পাভেল পাশ ফিরল। দেখল হাড্ডি-চুষ ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে। হাড্ডি-চুষ আদৌ ঘুমোয়নি।

ওলেগ্ এর মধ্যে একটুও ঘুমোয়নি। পাভেল আর ভাদিম খবরকাগজ নাড়াচাড়া করার জন্য খসখস শব্দ হচ্ছিল। ওরা দু'জন চাপা গলায় কথা বলছিল। ওলেগ্ তার সবই শুনেছে। পাঁচই মার্চ সম্পর্কে ওদের মনোভাব পুরোপুরি জানার জন্য ওলেগ্ চোখ খোলেনি। ওর খবরকাগজের জন্য পাগলামি করার দরকার নেই। যা জানার, ও আগেই জেনেছে।

বুকটা আবার ধক্‌ধক্ করে উঠল। আবার, বারবার। ও যেন দু'হাতে একটা লৌহ কপাট ঠেলছিল। কপাট কিছুতেই নড়তে চায় না। তবু কেন জানি হঠাৎ ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। একটু নড়লও। ক্রমে কব্জাগুলো থেকে মরচে খসে পড়ল।

ওলেগ্ বাইরে যা কিছু শুনেছে তা বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছিল। দু'বছর আগে এই দিনে বৃদ্ধরা অশ্রুপাত করেছে আর যুবতীরা ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। দুনিয়া যেন অনাথ হয়ে গিয়েছিল। আজকের পরিস্থিতির কল্পনাও উদ্ভট লাগছিল, কারণ দু'বছর আগে এ দিনটা ওদের কাছে কি রূপে প্রতিভাত হয়েছিল তা ওর স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন হঠাৎ ওদের দৈনন্দিন কাজে নিয়ে গেল না। ব্যারাকের কুঠরীগুলোর তালাও খোলা হ'ল না। বন্দীরা কুঠরীতেই তালাবন্ধ রয়ে গেল। ব্যারাকের প্রাঙ্গণে যে লাউড-স্পিকার সব সময় শোনা যায়, তাও বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যেন অত্যন্ত বড় সমস্যায় পড়ে ওপরওলাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওপরওলাদের সমস্যা মানেই বন্দীদের আনন্দ। কাজে যেতে হবে না। সারা দিন শুয়ে

শূন্যে কাটবে। দিনের বরাদ্দ খাওয়া দরজাতেই দিয়ে যাবে। ওরা প্রথমে খুব কষে ঘুমাল। তারপর ভাবল, কি হচ্ছে? একটু-আধটু গিটার বাজিয়ে গান করল। শেষে এ-বাঙ্ক ও-বাঙ্ক ঘুরে কি হয়েছে জানার চেষ্টা করল। সভ্যতা থেকে যত দূর দূরান্তরেই রেখে দেওয়া হোক না কেন, বন্দীরা প্রকৃত ঘটনা জেনে ফেলবেই ফেলবে—জল গরম করার ঘর, পাঁউরুটি কাটার ঘর, বা রান্নাঘর, যেখান থেকে হোক জানবে। সুতরাং খবর ছড়িয়ে পড়ল। বাঙ্কে বাঙ্কে বন্দীরা বলাবলি করতে লাগল, "এই শুনেছিস, বুড়ো রাক্ষসটা পটল তুলেছে ···" "কি বললি, যাঃ!", "আমি বিশ্বাস করি না, করবও না!" "তা মরবার বয়স হয়েছে বৈকি!" তার সঙ্গে হাসাহাসির হুল্লোড়। গিটার বাজিয়ে গান। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুঠরীগুলোর তালা খুলল না। পর দিন সকালে (সাইবেরিয়ায় তখনো অত্যন্ত বেশী তুষার পড়ে) শিবিরের সব বন্দ কে প্যারেড করার সময়কালীন পদ মর্যাদানুযায়ী দাঁড করানো হ'ল। মেজর, ক্যাপ্টেন আর লেফটেনাণ্টের ছড়াছড়ি। শোক—থমথমে মেজর ঘোষণা আরম্ভ করলেন, "গভীর দুঃখসহ জানাই · ···আমি জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে··· গতকাল মস্কোয়···"

বন্দীরা একসঙ্গে হেসে উঠল। চওডা চওড়া, শক্ত হাড বেরোনো, রোদে পোড়া, হাড বজ্জাত বন্দীগুলো যেন বিজয় গর্বে হেসে উঠল। অত্যন্ত বিচলিত মেজর তা দেখে হুকুম দিলেন, "টুপি খোলো!"

হুকুম মানতে গিওে শ'য়ে শ'য়ে বন্দী ইতস্ততঃ করল। টুপি খুলতে অস্বীকার করার, অর্থাৎ স্ট্যালিনের স্মৃতিকে অশ্রদ্ধা করার, কোন প্রশ্নই তখনো ওঠে না। তেমিনি টুপি খোলাও অতি আত্মগ্লানিকর। একজন পথ দেখাল। সে শিবিরের সঙ্, জনপ্রিয় রঙ্গ-তামাশা পরিবেশক। ও নিজের কৃত্রিম ফারের তৈরি স্ট্যালিনকা টুপিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল। ও ঐভাবে হুকুম তামিল করল।

শ'য়ে শ'য়ে বন্দী তা দেখল। তারাও টুপি শূন্যে ছুঁডে দিল। তা দেখে রাগে মেজরের দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি।

আর তারপর ওলেগ্ দেখেছে বয়স্করা অশ্রু বিসর্জন করেছে, যুবতীরা ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, আর গোটা পৃথিবী যেন অনাথ হয়ে গিয়েছে ···

চ্যালি ফিরে এল। আগের চেয়ে খুশি-খুশি ভাব। আরেক থলে ভর্তি খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে। কেউ মুচকি হাসল। চ্যালি খোলাখুলি হেসে বলল, "ব্যাপারটা ভালই, কি বলেন? এই মেয়েলোকগুলোকে নিয়ে কি করব, বলতে পারেন? একটু সুখ দিলে ওরা যদি খুশি হয়, তাহলে তা না দেওয়া কেন? একটু আরাম পেয়ে যদি খুশি থাকে ত' আমিও রাজী। ওতে কারো ক্ষতি ত' নেই। কথায় বলে না,

"ম্যাথরানি, চাকরানী কিংবা ক্লিওপেট্রা রাণী,
দেহ দানের খেলায় সবাই সমান সুখী জানি।"

চ্যালি হাসিতে ফেটে পড়ল। শ্রোতারাও যোগ দিল। পাভেলও বাদ গেল না। চ্যালি ভারি রগুড়ে লোক যা হোক।

"তা, আপনার স্ত্রী…কোনটি?" হাসিতে দম আটকানো আহমদজান জিজ্ঞেস করল।

"ওকথা জিজ্ঞেস করো না ভায়া," চ্যালি খাবারগুলো আলমারিতে রাখতে রাখতে বলল, "আমাদের আইনের সংশোধন প্রয়োজন। মুসলিম ব্যবস্থা অনেক বেশী মানবতা পূর্ণ। আর, এই আগামী আগস্ট মাস থেকে ওরা আবার গর্ভপাতের অনুমতি দিচ্ছে। তাতে জীবন অনেক সহজ হবে। কোন স্ত্রীলোকের নিঃসঙ্গ বেঁচে থাকার কি দরকার? কেউ যদি বছরে কয়েক বার সেই সঙ্গহীনার ঘরে যায় তাতে দোষ কি? এ ব্যবস্থা হলে সব শহরেই পুরুষের লঘু জলযোগের যোগাড় হয়ে যাবে।"

এবারও ওর আলমারিতে গাঢ় রঙের একটা বোতল চক্চক্ করে উঠল। চ্যালি আলমারি বন্ধ করে থলে ফেরৎ দিতে চলল। স্পষ্টতঃ এবার দেখা করতে আসা স্ত্রীলোকটিকে ও তেমন খাতির-যত্ন করতে চায় না। ও তাড়াতাড়ি ফিরে এসে চলাচলের পথের মাঝে এসে দাঁড়াল, যেমন ইয়েফেম দাঁড়াত। পাভেলের দিকে চেয়ে নিজের ঘাড়ে নেমে আসা, জঙ্গলের মত বেড়ে ওঠা, খড় আর শনের মিশ্রিত রঙের কোঁকড়ানো চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "কিছু খেলে কেমন হয়, ভায়া?"

পাভেল সহানুভূতি ভরে হাসল। দুপুরের খাওয়া একটু বেলা করেই দিয়েছিল। তার ওপর চ্যালি অত খুশি মনে খাবার-দাবারগুলো আলমারিতে তুলে রাখছে দেখে পাভেলের খাওয়ার ইচ্ছে চলে গিয়েছিল। কিন্তু চ্যালির আচরণে, ওর মোটা মোটা ঠোঁটের হাসিতে কাছে টানার মত এমন কিছু ছিল যা পাভেলকে ওর সঙ্গে বসে খেতে আকর্ষণ করল। "ভালই ত'," পাভেল ওকে নিজের টেবিলে ডাকল, "আমার এখানেও কিছু আছে…"

"মদও চলবে নাকি?" চ্যালি সুপটু হাতে খাবার-দাবার আর মদের বোতল নিয়ে পাভেলের টেবিলে চলে এল।

"আমাদের মানা আছে…" পাভেল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "এই রোগে মদ খাওয়া নিষেধ…"

গত এক মাসে ওয়ার্ডের কেউই মদ খাওয়ার সাহস করেনি। কিন্তু চ্যালির পক্ষে মদ যেন অতি স্বাভাবিক এবং অনিবার্য।

"আপনার নাম কি?" চ্যালি পাভেলের মুখোমুখি বসে বলল।

"পাভেল নিকোলায়েভিচ্ রুসানভ্।"

"পাশা!" চ্যালি পাভেলের কাঁধে বন্ধুর মত হাত রাখল। "আপনি ডাক্তারদের কথায় কান দেবেন না। ওরা এ রোগ সারাবে বটে, কিন্তু আপনাকে কবরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে দেবে। আমরা চাই বাঁচতে, শুধু বেঁচে থাকতে

নয়।" চ্যালির অকপট মুখ, বড় আকারের লালচে নাকটা বন্ধুত্ব আর প্রত্যয়ের দীপ্তিতে চকচক্ করছিল।

দিনটা শনিবার। ক্যানসার ওয়ার্ডের তাবৎ চিকিৎসা সোমবার পর্যন্ত মুলতুবি। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ধূসর হয়ে যাওয়া জানলার সার্সি পাভেলকে তার পরিবার এবং বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল। খবরকাগজে না প্রয়াত নেতার ছবি না শোকবার্তা থাকার বেদনা ওর আত্মাকে পীড়ন করছিল। সুদীর্ঘ সন্ধ্যে শুরু হওয়ার অনেক আগেই জ্বেলে দেওয়া ওয়ার্ডের বাতিগুলো জ্বলজ্বল করছিল। এমন অবসরে চ্যালির মত ভাল মানুষের সঙ্গে বসে ভাগ করে কিছু খাওয়া, মদও খাওয়া আর তার সঙ্গে রামি খেলা মন্দ কি। বন্ধু-বান্ধব একটা গল্প করার মত বিষয় পাবে বটে—পাভেলও রামি খেলছে!

ওস্তাদ চ্যালি এর মধ্যে বোতলটা বালিশের তলায় লুকিয়ে ফেলেছিল। তার আগে দু'হাঁটুর মধ্যে বোতলটাকে ধরে, ও হাত দিয়ে ছিপি খুলে নিয়েছিল। ওরা ঐভাবেই মদ ঢেলে, দু'জনে গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় সেরে নিয়েছিল।

খাঁটি রুশ পাভেল এতক্ষণে ভীতি, সংকোচ আর প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়েছিল। ও কেবল তরল পানীয়ের সাহায্যে অন্তরকে হতাশা মুক্ত করতে, আর একটু উত্তাপ ফিরে পেতে চাইছিল।

"তোফা সময় কাটবে, পাশা! তোফা সময়!" চ্যালি প্যাভেলকে বোঝাল। পাভেলের বুড়ো মুখ কঠোর হয়ে উঠল, একটু ভয়ালও বটে। চ্যালি বলল, "আর সবাই যত খুশি ব্যাঙের মত নীতিবাক্য কপ্‌চাক গে। আমরা দু'জন মজা লুটলেই হ'ল।" পানীয় ওদের সেই মজা দিল।

পাভেল এক মাসে অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ওরা খেল লাল মদ, যা কড়া নয়। তাতেই পাভেলের দেহে আগুন ধরে গেল। প্রতি মুহূর্তে তাপ দেহের প্রতিটি রোমকূপে সঞ্চারিত হয়ে ওর মনে বিশ্বাস এনে দিল যে বিষণ্ণ মনে মাথা নিচু করে থাকা নিষ্প্রয়োজন। ক্যানসার ওয়ার্ডেও জীবন উপভোগ করা সম্ভব। তাতে আরোগ্য ব্যাহত হবে না।

"ওতে কি খুব ব্যথা হয় এই পলিপস্ হলে?" পাভেল জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, একটু হয়। আমি আমল দিই না। ভদ্‌কা খেলে সে ব্যথা যে বাড়ে এমন নয়। ভদ্‌কা প্রায় সব রোগের বিশল্যকরণী, বুঝলে পাশা? অপারেশনের ঠিক আগে আমি কিছু নির্জলা, কড়া মদ খাব। একটা ছোট্ট বোতলে এখানে রেখে দিয়েছি। নির্জলা, কড়া মদ কেন? কারণ ঐ বস্তু অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দেহে মিশে যাবে, জলীয় অংশ নেই যে। ডাক্তার পেট কেটেও কোন মদের চিহ্ন পাবে না। সাফ-সুতর। হ্যাঁ, মাতাল হয়ে যাব! তুমিও ত' রণাঙ্গনে ছিলে, ছিলে না? রণাঙ্গনে ত' আক্রমণ করার আগে ভদ্‌কা খেতে দেয়। যুদ্ধে কি তুমি জখম হয়েছিলে?"

"না, হইনি।"

"দুর্ভাগ্য। আমি দু'বার হয়েছি। এই দেখো, এই যে, এখানে…" এর মধ্যে দুটি গ্লাসে আরো একশো গ্রাম করে মদ ঢালা হ'ল।

"আমাদের আর মদ খাওয়া ঠিক নয়," পাভেল মৃদু আপত্তি জানাল, "খুব বিপজ্জনক।"

"কিসের বিপজ্জনক? কে তোমার মাথায় ওসব ঢোকাল? নাও, ক'টা টমাটো খাও। আহ্, টামাটো!"

সত্যিই ত,' দু-একশো গ্রাম বেশী মদ খেলে কি এমন বিপদ বাড়তে পারে, বিশেষতঃ, বেড়া একবার টপকানোর পর? মহান স্ট্যালিন যে আজ নেই, কেউ তাঁকে যে আর শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে না, তাতেই বা কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হচ্ছে? প্রয়াত নেতার স্মৃতিতে পাভেল আরেক গ্লাসও পান করল। ও উপাসনাকারী মানুষের মত, বিষণ্ণভাবে ঠোঁট নাড়তে নাড়তে পান করল। কয়েকটা ছোট টমাটোও খেল। ওরা দু'জনে কপাল ছোঁয়া-ছুঁয়ি হওয়ার মত কাছাকাছি ঘেঁষে এসেছিল! পাভেল মন দিয়ে চ্যালির কথা শুনছিল।

"কি সুন্দর, লাল টমাটো!" চ্যালি খুশি উপচানো সুরে বলল, "এখানে এক রুবলে এক কিলো মেলে। কিন্তু কারাগাণ্ডায় এই টমাটো নিয়ে যাও, তিরিশ রুবল দামে বেচতে পারবে। পাহারাদাররা তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। কারাগাণ্ডায় কোন কিছু নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। ট্রেনের লাগেজ কম্পার্টমেন্টেও নিয়ে যেতে দেবে না। কেন দেবে না? বলো ত কেন দেয় না?"

চ্যালি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গিয়েছিল। ও কর্তৃপক্ষের আচরণের স্বপক্ষে যুক্তি দেখতে পাচ্ছিল না। ও বলে চলল, "কর্তৃপক্ষ এমনিতে কিছু রেলে নিয়ে যেতে দেবে না। কিন্তু পুরানো জ্যাকেট পরা একজন ব্যাপারী হয়ত স্টেশন মাস্টারের অফিসে ঢুকে পড়ে বলল, 'আপনি ও ত' বেঁচে থাকতে চান, চান না?' স্টেশন মাস্টার টেলিফোন রিসিভার ধরল, তার মনে ভয় যে লোকটি হয়ত খুন করতে এসেছে। লোকটি, কিন্তু তিনটে একশো রুবলের নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি যা নিতে চাই রেলে নিতে দেবেন না কেন, শুনি? আমাকেও বেঁচে থাকতে দিন…. আমার ঝুড়ি ক'টা লাগেজ গাড়িতে তুলে দিতে বলে দিন।' ট্রেন চলল। টমাটোর ঝুড়িতে কামরাগুলোর চাল অব্দি ঠাসা। গার্ড ভাগ পেল, টিকিট চেকার ও পেল। রেল অঞ্চলের সীমানা পেরোতে নতুন টিকিট চেকার এল। সেও ভাগ পেল।"

পাভেলের মাথা ঘুরতে আরম্ভ করেছিল! দেহে নতুন উত্তাপ সঞ্চারিত হয়ে ও রোগ জয় করার মত মনোবল ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু চ্যালি এমন কিছু বলছিল যা ঠিক খাপ খায় না …. একেবারে বিপরীত……"ওটা আইন বিরুদ্ধ," পাভেল বলল, "ওটা ঠিক নয়……"

"ঠিক নয় ?" চ্যালি বেশ অবাক হ'ল, "বেশ, কিছু আচার আর মাছের ডিম নাও · শোনো, কারাগাণ্ডায় পাথরে খোদাই করে লেখা আছে 'কয়লার অপর নাম রুটি'। মানে, কয়লা শিল্পের আহার্য্য। কিন্তু জনসাধারণের খাদ্য টমাটোর বেলায় সব শূন্য। কোন ব্যবসাদার কারাগাণ্ডায় টমাটো নিয়ে এলে তবেই মিলবে। লোকে কিলো প্রতি পঁচিশ রুবল দামে সেই টমাটো ত' কেনেই, তার সঙ্গে ধন্যবাদও দেয়। যাহোক ঐভাবে কিছু টমাটো জোগাড় ত' হয়। নইলে আদৌ মিলত না। কারাগাণ্ডা অঞ্চলের শাসনভার আছে কয়েকটা অপোগণ্ডর হাতে। ওদের অধীনে পাহারাদার আর গুণ্ডার অভাব নেই। ওরা পাহারাদার আর গুণ্ডাদের ওয়াগন বোঝাই করে টমাটো কিংবা আপেল আনতে পাঠাবে না। বরং যারা আপেল কিংবা টমাটো বিক্রি করতে আসে তাদের ধরবার জন্য স্তেপভূমির সব পথে ঐ পাহারাদার আর গুণ্ডাদের পাহারা লাগিয়ে দেবে। ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। যত আহাম্মকের দল।"

"তুমি ঐ রকম ঘুষ দিয়ে মাল পাচার করো···তুমিও করো ?" পাভেল ব্যথিত স্বরে বলল।

"আমি কেন করব ? আমি ঝুড়ি বয়ে বেড়াই না। আমার সঙ্গে থাকে আমার স্যুটকেস আর ব্রিফকেস। ট্রেনের টিকিট সব আগেই বিক্রি হয়ে যায়। সব সময় তাই! আমি টিকিট ঘরের জানলায় দাঁড়াই না। টিকিট ত' ট্রেনেই পাওয়া যায়। সব স্টেশনেই কোথায় ঠিক চা-ওলাকে পাওয়া যাবে, কোথায় পাওয়া যাবে লাগেজ গাড়ীর ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে তা আমার জানা। সব সময়ই জীবনের জয় হয়। এটা জানা থাকা চাই, পাশা।"

"তুমি কি করো ? মানে, কি কাজ করো ?"

"আমি ? আমি কারিগরি কাজ করি, যদিও টেকনিক্যাল স্কুলের পড়া শেষ করতে পারিনি। তাছাড়া কিছু দালালিও করে থাকি। আমার পকেট তাতে সব সময় ভর্তি থাকে। কোন মালিক আমাকে ন্যায্য মজুরি না দিলেই তার কাজ ছেড়ে অন্য কাজ ধরি। বুঝেছ ?"

পাভেল ক্রমশঃ বুঝতে পারছিল যে অনেক কিছুই ঠিক অনুমোদিত পথে বিচরণ করে না। তা অন্যায়। কিন্তু চ্যালি এত আমুদে, ভাল মানুষ, যে ওর সঙ্গ ভাল লাগে। গত এক মাসে ওর মত মানুষের দেখা মেলেনি। ওর সঙ্গ ত্যাগ করাও বেদনাদায়ক। "তুমি যা করো তা কি উচিত ? পাভেল ওকে বোঝাতে চাইল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরোপুরি উচিত। এই নাও, বাছুরের মাংসটা চমৎকার হয়েছে, খাও। এর পর আরেকটু মদ খাওয়া যাবে। শোনো, পাশা, আমরা যখন একটি মাত্র প্রাণ পাই তখন প্রাণভরে বাঁচব না কেন ?"

পাভেল তাতে আপত্তি করে কি করে ? চ্যালি মন্দ কথা বলেনি। ও ভাল করে বাঁচবে নাই বা কেন ? কিন্তু, ঐ যে······"দেখো চ্যালি, লোকে এটা

ভাল নজরে দেখবে না যে……" ও নরম ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল।

"শোনা পাশা," চ্যালি ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, "সেটা তুমি কোন্ দৃষ্টিতে দেখছ তার ওপর নির্ভর করে। একই কাজ হয়ত এখানে ভাল আর অন্য কোথাও মন্দ বিবেচিত হবে। কিন্তু এর বেলায় সবাই একমত :

ধুলোর কণা পড়লে বিবি
কেঁদে ফোলান চোখ,
অভিসারে জখম হলেও
হয় না বিবির শোক।"

চ্যালি হো-হো করে হাসতে হাসতে পাভেলের হাঁটু চাপড়াল। পাভেলও না হেসে পারল না। পাভেল বলল, "বেশ ক'টা ছড়া জানো ত' তুমি। জানো, তুমি একটা আস্ত কবি।"

"তা না হয় হ'ল, তুমি কি করো? কি কাজ করো?" পাভেলের নতুন বন্ধু বলল।

ওরা দু'জন এতক্ষণে প্রায় কাঁধ জড়াজড়ি করে বসেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে পাভেল একটু হোমড়া-চোমড়া ভাব দেখাতে চাইল। ওর পদের কিছু দায়িত্ব আছে ত'। "আমি ব্যক্তিগত তথ্য বিভাগে কাজ করি।" পাভেল তবু কিছুটা কম করে বলল, ও আসলে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করে।

"কোথায় কাজ করো?" পাভেল ওকে জানাল।

"শোনো" চ্যালি খুশি মনে বলল, "আমি একটি যোগ্য লোককে চিনি যার জন্য আমাদের দু'জনেরই কিছু করা উচিৎ। তার জন্য যা খরচা-পাতি দরকার হবে, সে নিয়ে তোমার একটুও ভাবতে হবে না।"

"তার মানে? তুমি ওকথা ভাবতে পারলে কি করে?" পাভেল অপ্রসন্ন হ'ল।

"কেন, এতে ভাবা-ভাবির কি আছে?" চ্যালি অবাক। বেঁচে থাকার অর্থের নবতর সন্ধান ওর দৃষ্টিতে কম্পমান, তফাৎ শুধু ওর চোখের দৃষ্টি সম্প্রতি মদ্যপান জনিত ঈষৎ ঝাপসা। "ব্যক্তিগত তথ্যাদি বিভাগের কর্মীরা যদি ঐ সব খরচা-পাতি আদায় না করে তবে ওদের চলে কি দিয়ে? ছেলেপিলে মানুষ করে কি দিয়ে, শুনি? শুধু মাইনের টাকায়? তোমার ক'টি ছেলেপিলে বলবে?"

"আপনাদের কাগজ পড়া হয়েছে?" ওদের মাথার ওপর ফাঁপা, অ-মধুর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'ল।

পেঁচা-চোখো নিজের কোণা থেকে উঠে এসেছে। ওর ড্যাবডেবে চোখের দৃষ্টি আরো কঠোর। ড্রেসিং গাউনের সামনেটা হাঁ করে খোলা।

দেখা গেল পাভেল কাগজের ওপর বসে আছে। কাগজটা দুমড়িয়ে, মুচড়িয়ে গিয়েছে। চ্যালি পেঁচা-চোখোকে বলল, "নিশ্চয়।" ও পাভেলকে বলল, "পাশা, একটু সরো। এই যে, দাদু, নিন।"

পেঁচা-চোখো শুলুবিন গোমড়া মুখে কাগজ নিয়ে এগোচ্ছিল, কিন্তু ওলেগ্‌ আটকাল। শুলুবিন যেমন নিরবচ্ছিন্নভাবে চুপচাপ লোকের দিকে চেয়ে থাকে, ওলেগ ও ওর দিকে ঐ রকম করে তাকাল। ওলেগ্‌ ওকে অত্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

মানুষটার আসল পরিচয় কি? কি অসাধারণ ধরণের মুখ। যেন সবে ছদ্মবেশ খুলে ফেলা এক ক্লান্ত অভিনেতা। শিবিরে থাকতে ওলেগ্‌ লোকের সঙ্গে আলাপ জমানোর এক কৌশল রপ্ত করেছিল। সে কৌশল অনুযায়ী ও প্রথম দেখা হতেই লোকের থেকে জ্ঞাতব্য তথ্য জানার চেষ্টা করত। আধ-শোয়া অবস্থায় ওলেগ্‌ শুলুবিনকে প্রশ্ন করল, "আপনি কি কাজ করতেন, দাদু?"

শুধু শুলুবিনের চোখ দুটো নয়, মাথাটাই ওলেগের দিকে ঘুরল। কয়েক মুহূর্ত ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল। তার মধ্যে ও কয়েকবার ঘাড় নাচানোর চেষ্টা করল, যেন জামার কলার অত্যন্ত আঁট লাগছে। অথচ ওর জামার কলার এত ঢিলে যে আঁট লাগতে পারে না। ও হঠাৎ জবাব দিল, "আমি গ্রন্থাগারিক।"

"কোথাকার?" ওলেগ্‌ আরেকটা প্রশ্ন করার সুযোগ হারাতে চায় না।

"কৃষি কারিগরি মহাবিদ্যালয়ে।"

হয় শুলুবিনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, নয় ওর এক কোণে পেঁচার মত চুপচাপ বসে থাকা, বা আর কোন কারণে পাভেলের ওকে হতমান করতে, ওর সঠিক স্থান কোথায় তা বুঝিয়ে তর সইছিল না। এটা ভদকার গুণও হতে পারে। পাভেল প্রয়োজনাতিরিক্ত জোর গলায় এবং তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "আপনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নন, তাই নয়?"

পেঁচা-চোখো তামাক-বাদামী চোখে পাভেলের দিকে তাকাল। চোখ পিটপিট করল, যেন প্রশ্নটা বিশ্বাস করতে পারছে না। আবার পিটপিট করল। হঠাৎ পেঁচা-চোখো ঠোঁট খুলল, "বরং তার বিপরীত," ও ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ওর চলনও অস্বাভাবিক। যেন কোথাও কিছু ফুটছে বা জ্বালা করছে। ও অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে, অন্ধের পথ চলার মত করে, সামনে একটু ঝুঁকে, এগিয়ে চলল। ড্রেসিংগাউনের দু'টো ধার দু'পাশে বেরিয়ে ঝুলে রইল। যেন অসমান করে ডানা কেটে দেওয়া এক বড় পাখী। যাতে উড়ে যেতে না পারে।

রক্ত প্রদান

ওলেগ্‌ বাগানের একটা বেঞ্চির নিচে একটা বড় পাথরের ওপর বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। বুট পরা পা দুটো গোটানো। হাঁটু দুটো মাটি থেকে একটু ওপরে। বাহু দুটো নিষ্প্রাণ বস্তুর মত ঝুলছিল। অনাবরিত মাথা সামনে

ঝোঁকানো। বুক খোলা ড্রেসিং গাউন। ও যেন পাথরটার মত কোণাকৃতি আর নিশ্চল। ওর মাথার কালো চুলগুলো তেতে উঠেছিল। মার্চ মাসের তাপ ভরা রোদ ওর পিঠে পড়ছিল। ও চুপ করে বসেছিল। কোন কিছু ভাবছিল না। বিগত দিনগুলোয় খাদ্য-পানীয় থেকে যে উত্তাপ মেলেনি অনেকক্ষণ ধরে শূন্য মনে বসে সূর্যালোক থেকে সে উত্তাপ সংগ্রহ করতে ওলেগের মন্দ লাগছিল না।

ও এত চুপচাপ বসেছিল যে নিঃশ্বাসের তালে তালে ওর কাঁধের ওঠা-নামাও দূর থেকে বোঝা যায় না। যাহোক, অতক্ষণ চুপচাপ বসে থেকেও ও কোন এক পাশে হেলে পড়েনি, ঠিক মত বসেছিল।

হাসপাতালের এক মোটাসোটা পরিচারিকা পথ দিয়ে এগিয়ে এল। ঐ পরিচারিকাটিই এক সময় ওলেগ্‌কে বারান্দা নোংরা করার জন্য ধমকিয়েছিল। বিশালকায়া পরিচারিকাটির সূর্যমুখী ফুলের দানার নেশা আছে। ও কয়েকটা দানা খাওয়ার লোভেই বাগানে এসেছে। ও এগিয়ে এসে বলল, "ও খুড়ো, শুনছ? ও খুড়ো?"

ওলেগ্‌ মাথা তুলল। রোদ পড়া চোখ কুঁচকিয়ে তাকাল। আধ-খোলা চোখে পরিচারিকার অবয়ব রেখা বিকৃত দেখাল।

"ড্রেসিং কামরায় যাও, খুড়ো। তোমাকে ডাক্তার ডাকছে।"

অতক্ষণ রোদে বসে থেকে ওলেগ্‌ একটা উত্তপ্ত পাথর হয়ে গিয়েছিল। নড়তে চড়তে ইচ্ছে করছিল না। "কোন্‌ ডাক্তার?"

"যে ডাক্তার তোমাকে খোঁজার সেই খুঁজছে," পরিচারিকা গলা চড়িয়ে জানাল, "সে আমাকে হুকুম করেছে, যে রোগীরা বাগানে রয়েছে তাদের ডেকে নিয়ে এসো। যাও, ভেতরে যাও।"

"কিন্তু আমার কোন ক্ষতের ড্রেসিং করা দরকার নেই। আমাকে ডাকছে না।"

"তোমাকেই ডাকছে," পরিচারিকা আরো কিছু সূর্যমুখীর দানা মুখে পুরতে পুরতে বলল, "তোমাকে ভুল করিনি বাপু, বকের মত লম্বা নাক, খুড়ো। এখানে তোমার মত আর কেউ নেই।"

ওলেগ্‌ দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা ছড়াল। দু'হাতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। পরিচারিকার তা দেখে ভাল লাগল না। বলল, "চলো, চলো। কিছু শক্তি সঞ্চয় করে রাখোনি কেন? শুয়ে থাকলেই ত' পারতে।"

"ওঃ," ওলেগ্‌ আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "যা কিছু ঘটবে তার সব কি আগে থেকে জানা যায়?" ও হাসপাতালে ফিরে চলল। ও বেল্ট বাঁধেনি। চলনে ফৌজী ভাবও নেই। পিঠ একটু বেঁকে গিয়েছে।

ওর লক্ষ্য ড্রেসিং কামরা। ও ভাবছিল, হয়ত নতুন কোন ঝামেলার মুখে পড়তে হবে, আর তা কাটানোর জন্য লড়াই করতে হবে।

দশ দিন আগে ভেরা গ্যাঙ্গার্টের জায়গা নেওয়া ইলিয়া রাফাইলোভ্‌না

ড্রেসিং কামরায় ছিল না। ইলিয়ার বদলে ছিল আরেক যুবতী। তার গাল দুটো স্বাস্থ্যের আভায় লাল। অনেক বেশী হৃষ্টপুষ্ট গড়ন। ওলেগ্ ওকে এই প্রথম দেখল। ওলেগ্ দোরগোড়ায় দাঁড়াতেই ও প্রশ্ন করল, "আপনার নাম কি ?"

তখন রোদ না লাগলেও ওলেগ্ চোখ কুঁচকিয়ে, যথা সম্ভব বিরক্ত ভাব ফুটিয়ে তাকাল। প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই। বরং যা ঘটতে চলেছে তার আভাস পেতে সচেষ্ট। কখনো কখনো নাম গোপন করে সুফল মেলে। আসলে ওলেগ্ কি করবে স্থির করতে পারছিল না।

"হ্যাঁ, আপনার নাম বলুন ?" হৃষ্টপুষ্ট ডাক্তারটি আবার বলল।

"ওলেগ্ কস্টোগলোটভ্," ও অনিচ্ছাভরে জবাব দিল।

"এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ? চট করে জামা-কাপড় খুলে শুয়ে পড়ুন। এখানে।"

ওলেগের মনে পড়ল। ব্যবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে বুঝল—ওকে রক্ত দেওয়া হবে। ও ভুলে গিয়েছিল যে ঐ কাজটা ড্রেসিং কামরাতেই করা হয়। ওর আপত্তি দুটি কারণে। প্রথম ওলেগ্ ওর প্রাক্তন নীতি আঁকড়িয়ে থাকতে চায় : ও কারো রক্ত নেবে না, কাউকে দেবেও না। দ্বিতীয়তঃ এই অল্প বয়সী ধৃষ্ট ডাক্তারটি, যাকে দেখে মনে হয় সে নিজের দেহে অনেক দাতার রক্তই ঢুকিয়ে ফেলেছে, ওর মনে একটু বিশ্বাস এনে দিতে পারেনি। ভেরা নেই। তার জায়গায় এই নতুন ডাক্তার এসেছে। অর্থাৎ নতুন চাল-চলন এবং নতুন ভুল! এত বদলানোর কি দরকার ? ডাক্তারদের স্থায়ীভাবে এক জায়গায় রাখলে কি ক্ষতি হয় ?

ওলেগ্ জোর মনে ড্রেসিং গাউন খুলে ফেলল। ও কোথায় ড্রেসিং গাউন টাঙিয়ে রাখবে খুঁজে পাচ্ছিল না। নার্স দেখিয়ে দিল। ও ড্রেসিং গাউন টাঙিয়ে রাখতে রাখতে রক্ত নেওয়া এড়ানোর নতুন ফিকির খুঁজতে লাগল। জ্যাকেট খুলে টাঙিয়ে রাখল। বুট জোড়া এক কোণে ঠেলে দিল। লিনো-লিয়াম বিছানো মসৃণ মেঝের ওপর খালি পায়ে হেঁটে গিয়ে গদীমোড়া উঁচু টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ল। রক্ত নিতে অস্বীকার করার স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পেল না। তবু বার বার মনে হচ্ছিল, একটা যুক্তি নিশ্চয় খুঁজে পাবে।

রোগীকে রক্ত দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, তার সঙ্গে রবার আর কাঁচের নল, টেবিল থেকে কিছু উঁচুতে ইস্পাতের তৈরি যন্ত্রের স্ট্যাণ্ড থেকে ঝুলছিল। ঐ স্ট্যাণ্ডেই কয়েকটা গোল আংটায় নানা মাপের বোতল : আধ লিটার, সিকি লিটার এক-অষ্টমাংশ লিটার। শেষের আংটা ভর্তি। বাদামী রঙের রক্ত ভর্তি বোতলে লেবেল আঁটা। লেবেল রক্ত দাতার নাম, রক্তের গ্রুপ, রক্ত নেওয়ার তারিখ লেখা।

যা ওর দেখার কথা নয় এমন জিনিষ দেখা ওলগের অভ্যাস। টেবিলে

ওঠবার সময় ও লেবেলে যা লেখা আছে তা পড়ে নিয়েছিল। বালিশে মাথা রাখার বদলে ও বলে উঠল, "বা-বাঃ! ২৮শে ফেব্রুয়ারি! পুরানো রক্ত। এ ব্যবহার করা উচিত নয়।"

"আপনি ওকথা বলার কে?" ডাক্তার বিরক্তি প্রকাশ করল, "পুরানো রক্ত, নতুন রক্ত, আপনি রক্ত সংরক্ষণের কতটুকু জানেন? রক্ত এক মাসের ওপর রেখে দেওয়া যায়।"

ডাক্তারের গোলাপী মুখ লাল হয়ে গেল। কনুইয়ের নিচে ওর অনাবরিত বাহুও গোলাপী। কিন্তু বাহুতে কাঁটা ওঠা। শীতের জন্য নয়। কাঁটাগুলো স্থায়ী ধরণের। আর সব বাদ দিয়ে ডাক্তারের কাঁটা ওঠা বাহু দেখেই ওলেগ্ সিদ্ধান্ত করল, কিছুতেই রক্ত নেবে না।

"আস্তিন গুটিয়ে, আপনার বাহু সহজ ভাবে রাখুন," ডাক্তার বলল।

রক্ত প্রদান করার কাজে মহিলা ডাক্তারটির এটি দ্বিতীয় বছর। ওর এমন একজন রোগীর কথাও মনে পড়ে না যে সন্দিগ্ধ হয়নি। সব রোগীই এমন ভাব করে যেন তার রক্ত সবচেয়ে অভিজাত ধরণের, যা কলুষিত হওয়ার ভয়ে সে ভীত। রক্ত নেওয়ার আগে ওরা নির্ঘাৎ আড়চোখে রক্তের দিকে তাকাবে এবং বলবে নতুন রক্ত সঠিক রঙের নয়, কিংবা সঠিক গ্রুপের নয়, কিংবা রক্তটা হয় অত্যন্ত গরম নয় অত্যন্ত ঠাণ্ডা, কিংবা রক্তটা একেবারে জমাট বাঁধা। কিংবা হয়ত সোজাসুজি বলে বসবে, "আমাকে বাজে রক্ত দিচ্ছেন কেন?" "বাজে রক্ত হতে যাবে কেন?" "লেবেল যে লেখা আছে —'ছোবেন না'," "হ্যাঁ, তার কারণ রক্তটা আর কারো জন্য চিহ্নিত ছিল, কিন্তু তার আর রক্তের প্রয়োজন নেই।" রোগীটি ছুঁচ ফোটাতে দেওয়ার পরেও বিড়বিড় করতে থাকে, "তার মানে রক্তটা সঠিক মানের নয়।" এসব মুর্খ সন্দেহ ভাঙবার একমাত্র পথ, কঠোর হওয়া। তাছাড়া ডাক্তারটির তাড়াও ছিল। রোজই কয়েকটি জায়গায় এক নির্দিষ্ট সংখ্যক রোগীকে রক্ত দিতে হয়।

ওলেগ্ এর মধ্যে হাসপাতালে কিছু রোগীকে দেখেছে রক্ত নিতে গিয়ে যাদের দেহে লাল, ফোলা দেখা দিয়েছে। ডাক্তারি ভাষায় তার নাম 'হেমাটোমা'। ঐ রকম ফুলে ওঠার কারণ কোন শিরা হয়ত দু'বার ফুটো হয়েছে, কিংবা ছুঁচ বেঠিক লক্ষ্যে ঢুকেছে। রক্ত নেওয়ার পর এক একজনের দেহে কাঁপুনি আসে, জ্বরভাব হয়। দেহে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি রক্ত ঢোকানোর ফল। কাঁটা ওঠা, অধীর, গোলাপী বাহুওলো মহিলা ডাক্তারের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে ওলেগের মন চাইল না। ওর নিজের রশ্মি-চিকিৎসায় নষ্ট হওয়া, মন্দগতি, অসুস্থ রক্তও নতুন রক্তের চেয়ে মূল্যবান। ওর রক্ত আজ হোক কাল হোক ভাল হয়ে যাবেই।

"না," ওলেগ্ আস্তিন গোটাতে অস্বীকার করল। "আপনি পুরানো রক্ত এনেছেন। তাছাড়া, এমনিও আমার আজ রক্ত নিতে ইচ্ছে করছে না।"

ওলেগ জানত এক সঙ্গে দুটো অজুহাত দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু দুটোই যে এক সঙ্গে এসে গেল।

"বেশ, এক্ষুনি আপনার রক্ত-চাপ কত তা দেখে নিচ্ছি," ডাক্তার একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল। নার্স ডাক্তারকে রক্ত চাপ মাপার যন্ত্র এগিয়ে দিল।

ডাক্তার পুরোপুরি নবাগতা। কিন্তু নার্সটি হাসপাতালের পুরনো কর্মী। ও ড্রেসিং কামরাতেই কাজ করে। ওলেগের অবশ্য, এর আগে ওর সঙ্গে কাজ পড়েনি। নার্সটি কৈশোর উত্তীর্ণা, কিন্তু বেশ লম্বা, একটু কালচে রঙ, চোখ দুটো জাপানীদের মত তেরছা। চুলগুলো এমন করে জড়ো করে রাখা যে কোন টুপি বা স্কার্ফের তাকে ঢেকে রাখার সাধ্য নেই। চুলের প্রতিটি চূড়া সযত্নে অনেকগুলি ফিতে দিয়ে বাঁধা। নিশ্চয় ডিউটি আরম্ভ হওয়ার পনেরো মিনিট আগে এসে চুল সাজিয়েছে।

মেয়েটির মাথায় লাগানো সাদা টায়রা মন দিয়ে দেখতে দেখতে ওলেগ্ ওর টুপির আড়ালে চুলের আসল রূপ কেমন তা কল্পনা করছিল। ওলেগ্ শুরু করেছিল ডাক্তারের সঙ্গে তর্কাতর্কি আর আপত্তি দিয়ে, যাতে ওকে রক্ত দেওয়া বন্ধ হয়। অথচ জাপানী চোখওলা মেয়েটাকে দেখতে দেখতে ওর তর্কের ছন্দ কেটে গেল। সব মেয়ের মত এ মেয়েটিও এক ধরনের রহস্যের প্রতিমূর্তি, যেহেতু মেয়েটি যুবতী। মেয়েটির প্রতিটি পদক্ষেপই এক রহস্য। ওর প্রতিবার মাথা ঘোরানোয় বোঝা যাচ্ছিল যে, ও যে রহস্য ও তা জানে।

ইতিমধ্যে ওলেগের বাহুতে রক্ত-চাপ মাপার মোটা, কালো সাপটা পেঁচিয়ে, চাপ দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। ও আরেকটা আপত্তি তোলার জন্য সবে মুখ খুলেছে এমন সময় দোরগোড়া থেকে কেউ ডাক্তারকে ডাক দিল। চমকিয়ে উঠে, ডাক্তার ফোন ধরতে চলল। নার্স রক্ত-চাপ মাপার সরঞ্জাম গুটিয়ে বাক্সে ঢোকাতে লাগল। ওলেগ্ শুয়েই ছিল। ও প্রশ্ন করল, "এ ডাক্তারটি কোথা থেকে এসেছে?"

মেয়েটির কণ্ঠস্বরের প্রতিটি গ্রামও এক একটি রহস্য, এবং ও তা জানে। মেয়েটি যে কথা বলল তাও যেন নিজের কণ্ঠস্বর মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনার চেষ্টা। "স্থানীয় রক্ত প্রদান কেন্দ্র থেকে" মেয়েটি বলল।

"ডাক্তার পুরনো রক্ত এনেছে কেন? যদিও নেহাৎ অল্প বয়সী তবু ওর তর্ক করার ক্ষমতা যাচাই করার জন্য ওলেগ্ প্রশ্ন করল।

"না, পুরনো নয়," মেয়েটি জবাব দিয়ে, মাথার টায়রা দুলিয়ে ঘরের অপর দিকে সরে গেল।

ওর যতটুকু জানা উচিত ও যে তা জানে, মেয়েটির এ বিশ্বাস আছে। হয়ত তাই ঠিক।

ড্রেসিং কামরায় রোদ এল। সরাসরি এল না, দুটো জানলার সার্সিতে রোদ পড়ে তা ঘরের চালের একটা বড় অংশে ঠিকরে পড়ল। রোদে ভরে যাওয়া ঘরটায় বেশ লাগছিল।

ওলেগের দৃষ্টি পথের বাইরে একটা দরজা খুলে গেল। কেউ ভেতরে এল। আরেকজন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক এগিয়ে এল, প্রায় জুতোর শব্দ

না তুলে। অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অল্প অল্প জুতোর শব্দে চাপা পড়ল না।

স্ত্রীলোকটি কে, ওলেগ্ তা অনুমান করতে পারল। আর কেউ ঐ রকম ভঙ্গী করে চলে না। ওলেগের প্রাণ-মন ওকেই খুঁজছিল। আর কাউকে নয়।

ভেরা গ্যাঙ্গার্ট! ভেরা ওর দৃষ্টি পথে এল। সহজ ভাবে। যেন ভেরা কখনই ওর দৃষ্টিপথের বাইরে সরে যায়নি।

"কোথায় ছিলে ভেরা?" ওলেগ্ মৃদু হেসে প্রশ্ন করল। যদিও ওর দহ টেবিলের সঙ্গে বাঁধা ছিল না, ও তবু উঠে বসার চেষ্টা করল না।

ঘরটা আবার চমৎকার আরাম দায়ক লাগছিল।

ভেরারও প্রশ্ন ছিল। "তুমি নাকি বিদ্রোহ করেছ?" ভেরা মৃদু হাসল।

ওলেগের সব প্রতিবাদ ইতিমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শুয়ে থাকতে এত ভাল লাগছিল যে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। ও বলল, "আমি? না, না, বিদ্রোহ করিনি · তুমি কোথায় ছিলে? এক সপ্তাহের ওপর তোমাকে দেখিনি।"

"আমি ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করার কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। স্বাস্থ্য প্রচার অভিযান করে ক্যানসার রোধ করার কাজ করছিলাম," ভেরা ওলেগের কাছাকাছি এসে এমন ভাবে কথাগুলো বলল যেন তা কোন অতি অল্প বুদ্ধি মানুষকে অপরিচিত বিষয় বোঝানোর প্রয়াস।

"কোথায়, কোন অনাবাসী দূর অঞ্চলে?" "হ্যাঁ"

"সে অভিযান শেষ হয়েছে?" "এখনকার মত শেষ হয়েছে। কিন্তু তোমার কি অবস্থা? শরীর ভাল নেই?"

ভেরার চোখে কিসের আভাস? ব্যস্ততা বিহীন গভীর মনোযোগের। তখনো অসমর্থিত প্রথম দুশ্চিন্তার আভাস। ডাক্তারের দৃষ্টি ভঙ্গী।

ঐটুকু বাদ দিলে ভেরার চোখ দুটো ফিকে বাদামী রঙের। দুধের ছিটে পড়া এক গ্লাস কফির মত। কত বছর যে ওলেগ্ কফি খায়নি। কফি মানেই বন্ধুত্ব। ভেরার চোখ দুটোও অতি পুরনো বন্ধুর চোখ।

"না, না, ওসব কিছু নয়। খুব বেশী রোদ লেগে কেমন করছিল। কতক্ষণ যে রোদে বসেছিলাম মনে নেই। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"তুমি রোদে বসে থাকলে কি করে! এত দিন এখানে থেকেও কি তুমি জানো না যে টিউমারে রোদ বা তাপ লাগানো নিষেধ?"

"আমি জানতাম শুধু গরম জলের বোতলই নিষিদ্ধ।"

"রোদ আরো বেশী নিষিদ্ধ।"

"তার মানে আমি আর কখনো কৃষ্ণ সাগরের তীরে যেতে পাব না?" ভেরা মাথা হেলাল। ওলেগ্ আবার বলল, "কি সাংঘাতিক হবে সে জীবন! আমি বরং রাশিয়ার উত্তরতম শহর নরিলস্ক-এ নির্বাসন চেয়ে নেব..."

ভেরা কাঁধ ঝাঁকাল। এ ব্যাপারে কিছু করা ওর সাধ্যের অতীত।

ওলেগের আক্ষেপও ওর হৃদয়ঙ্গম হওয়ার বাইরে। ওলেগ্ বলল, "তুমি কথা ভাঙলে কেন?"

"কোন্ কথা?" ভেরা অবাক।

"তুমি কথা দিয়েছিলে, তুমি নিজে আমাকে রক্ত দেওয়া তদারক করবে, কোন শিক্ষার্থী'র হাতে ছেড়ে দেবে না।"

"ও শিক্ষার্থী নয়, বরং বিশেষজ্ঞ। ও থাকতে আমাদের রক্ত দেওয়া তদারক করার অধিকার নেই। যাহোক, ও এখন চলে গিয়েছে।"

"চলে গিয়েছে—তার মানে?"

"ওকে ডেকে পাঠিয়েছে।"

বাঃ রে পালা বদলের খেলা! এক পালা বদল শেষ হয় ত' আরেকটা শুরু হয়।

"তাহলে তুমি তদারক করবে?"

"হ্যাঁ, আমিই করব। কিন্তু পুরানো রক্ত নিয়ে এসব কি কথা?" ওলেগ্ মাথা দিয়ে বোতলটা ইঙ্গিত করল। "এটা পুরানো রক্ত নয়। তাছাড়া, এ রক্ত তোমার জন্য নয়। তোমাকে দু'শো পঞ্চাশ গ্রাম দেওয়া হবে। এই যে!" ভেরা আরেকটা টেবিল থেকে একটা বোতল নিয়ে এল। "নাও, নিজে লেবেল দেখে নাও।"

"আমার জীবন যে কত দুর্বিসহ তা ত' জানো। আমি কোন কিছু যাচাই না করে সরাসরি বিশ্বাস করতে পারি না। যাচাই করার প্রয়োজন বোধ না করলে যে আমি কত স্বস্তি পাই তা কি বোঝো?" ওলেগ্ কথা ক'টা শ্রান্ত গলায়, মুমূর্ষু মানুষের মত বলল। তবু ওর সজাগ দৃষ্টি দেখে নিল, লেবেল লেখা আছে: 'গ্রুপ 'এ' ইরিনা ইয়ারোস্লাভেৎসেভা, ৫ই মার্চ।'

"আঃ, ৫ই মার্চ! এ রক্ত ঠিক হতেই হবে।" ওলেগ্ উৎসাহ ভরে বলল, "এতে আমার ভাল হবে।"

"এখন বুঝতে পারছ, এতে ভাল হবে। অবশেষে! আর তুমিই কিনা গোড়ায় অত ঝামেলা বাঁধিয়েছিলে।" ভেরা ওলেগের উল্লাসের অন্তর্নিহিত কারণ না বুঝেই বলল।

ওলেগ্ আস্তিন গুটিয়ে বাহু ঢিলে করে রাখল।

ওলেগের মত মানুষের পক্ষে, যে পাকাপাকি ভাবে সন্দিগ্ধ আর সজাগ হতে বাধ্য হয়েছে, কাউকে বিশ্বাস করতে পারা, কারো ওপর ভরসা করতে পারা সত্যিই তৃপ্তিদায়ক। আর ওলেগ্ বিশ্বাস করছে যাকে সে এই নম্র, দেবী-প্রতিম ভেরা। ওলেগ্ জানত ভেরার চলাফেরা লঘু পদে। কিন্তু ভেরার প্রতিটি পদক্ষেপ সুচিন্তিত, সামান্যতম ভুলের সম্ভাবনা বিহীন। তাই টেবিলে শায়িত ওলেগের মনে হচ্ছিল, ও বিশ্রাম নিচ্ছে।

যেন জাল ছেঁকে বেরিয়ে আসা, নরম, মিহি রোদ ঘরের চালে এক অসমান বৃত্ত রচনা করছিল। রোদ কোথা থেকে ঠিকরে পড়ে ঘরের চালে পৌঁছল তা

বোঝা না গেলেও ঐ রোদের বৃত্তের জন্যই ঘরটা আরো সুন্দর, পরিচ্ছন্ন লাগছিল।

ভেরা একটু অবিশ্বস্ততা করে ছুঁচের সাহায্যে সামান্য রক্ত ওলেগের শিরা থেকে টেনে নিয়েছিল। ও সেই রক্ত সেণ্ট্রিফিউজ-এ চার ভাগে বিভক্ত করছিল।

"চার ভাগে কেন?" ওলেগ্ প্রশ্ন করল। সারা জীবন, সর্বত্র ও প্রশ্ন করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর প্রশ্ন নেহাৎ অভ্যাস বসে করা। ও জানতে তেমন উৎসুক ছিল না।

"এক ভাগ, তোমার রক্তের সঙ্গে মিল যাচাই করার জন্য। তিন ভাগ, রক্ত বিতরণ কেন্দ্রের জন্য। যদি গ্রুপ যাচাই প্রয়োজন হয়, সেই কারণে।"

"কিন্তু দাতা আর গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ যদি একই হয় সেক্ষেত্রে রক্তের মিল যাচাই করতে হয় কেন?"

"যদি রোগীর রক্তের জলীয় অংশ নতুন রক্তের সংস্পর্শে এসে শুকিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এটা কাজে লাগে। ঐ রকম ঘটনা বিরল হলেও, ঘটে থাকে।

"বুঝলাম। কিন্তু, আমার থেকে নেওয়া রক্তটুকু সেণ্ট্রিফিউজে ঘোরানো হ'ল কেন?"

"রক্তের লোহিত কণিকাগুলোকে পেছনে ঠেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তোমার কি সবই জানতে হবে?"

না, ওলেগের সব জানার দরকার নেই। ও ঘরের চালে রোদের বৃত্তের দিকে চেয়ে রইল। পৃথিবীর সব জানা যাবে না। জানলেও বোকার মতই মরতে হবে।

সাদা টায়রা পরা নার্সটি এসে ৫ই মার্চ তারিখের বোতলটা স্ট্যাণ্ডে লাগানো একটা আংটায় রেখে, উল্টিয়ে দিল। ও তারপর ওলেগের বাহুর নিচে একটা ছোট্ট বালিশ দিল। এবার ওলেগের কনুইয়ের ওপর দিকে বাহুতে একটা রবারের ফাঁস উত্তরোত্তর কষে বেঁধে দিতে লাগল। আর জাপানী চোখ দিয়ে দেখতে থাকল প্রয়োজনানুযায়ী কষে বাঁধা হয়েছে কিনা।

নার্সটি আর পাঁচটি মেয়ের মতই সাধারণ। তবু ও যেন এক রহস্যে ঘেরা। ভাবতেও অবাক লাগে।

সিরিঞ্জ হাতে ভেরা এল। সাধারণ সিরিঞ্জ, তার মধ্যে বর্ণহীন তরল পদার্থ। কিন্তু ছুঁচটা অসাধারণ। ছুঁচ নয়, বরং একটা নল, যার মাথা তেকোণা। নলটা এমনিতে আপত্তিজনক মনে হয় না, অন্ততঃ যতক্ষণ ঐ নলটা কারো দেহে না ঢোকাচ্ছে।

"তোমার শিরা খুব সুন্দর বেরিয়ে পড়েছে," ভেরা ভুরু নাচিয়ে বলল। তারপর ভেরা গভীর মনযোগ দিয়ে এত নিখুঁতভাবে ওলেগের হাতের চামড়া ফুটো করল যে ওলেগ্ প্রায় টেরই পেল না। ভেরা এবার ঐ অতিকায় নলটা ঢোকাল।

ওদের অনেক কাজই ওলেগ্ বুঝতে পারল না। কনুইয়ের ওপর দিকে

-রবারের বাঁধনটা অত চেপে বাঁধল কেন ? সিরিঞ্জে বর্ণহীন তরল পদার্থই বা কেন রাখা আছে ? হয়ত শিরায় বাতাস ঢুকে যাওয়া এবং সিরিঞ্জেও রক্ত উঠে আসা রোধ করার জন্য ঐ ব্যবস্থা।

ছুঁচটা ওলেগের শিরায় ঢোকানোই রইল। কনুইয়ের ওপর দিকের বাঁধন খুলে ফেলা হ'ল। নিপুণভাবে সিরিঞ্জ বের করে নিয়ে নার্স সিরিঞ্জের মাথা এক গামলা জলে ধুয়ে সাফ করে নিল। এবার ভেরা ওলেগের হাতে ঢুকে থাকা ছুঁচের সঙ্গে সিরিঞ্জের মাথা পরিয়ে দিল। ছুঁচটা ঠিকমত ধরে রেখে ভেরা রক্ত প্রদান যন্ত্রের স্ক্রু একটু করে খুলল।

রক্ত প্রদান যন্ত্রের চওড়া হয়ে যাওয়া কাঁচের নলে এক এক করে অনেকগুলো স্বচ্ছ বুদবুদ উঠতে লাগল। ওলেগের মনেও প্রশ্নের বুদবুদ উঠছিল। অত চওড়া ছুঁচ কি করতে লাগে ? সিরিঞ্জে লেগে থাকা ওর রক্ত ঝেঁকে ফেলে দিল কেন ? বুদবুদ উঠল কেন ? এক মুর্খের সব প্রশ্নের জবাব দিতে একশো জন পণ্ডিতও হিমসিম খেতে পারেন।

তবু ওলেগের প্রশ্নের কি শেষ আছে ? আরো কত কি যে জানতে ইচ্ছে করছিল। ঘরের চালে রোদের বৃত্ত দেখে ওর মন প্রফুল্লতায় ভরে গিয়েছিল।

ছুঁচটা অনেকক্ষণ ধরে হাতে লেগে থাকল। বোতলে রক্তের উচ্চতা অল্পই কমেছিল। প্রায় আদৌ কমেনি বলা চলে। "আমাকে কি আপনার আর দরকার, ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট ?" জাপানী চোখ নার্সটা নিজে গলার মধুরতা শুনতে শুনতে প্রশ্ন করল।

"না, তোমাকে দরকার নেই।"

"আমি একটু বাইরে যেতে চাই……আধ ঘণ্টার জন্য যাব ?"

"আমার তোমাকে প্রয়োজন নেই।"

টায়রা পরা নার্সটি প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। ঘরে রইল ভেরা আর ওলেগ্। বোতলে ধীরে ধীরে বুদবুদ উঠছিল। ভেরা স্ক্রুয়ে হাত দিল। বুদবুদ ওঠা বন্ধ হ'ল।

"তুমি রক্ত প্রদান বন্ধ করে দিয়েছ ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন বন্ধ করলে ?" "তোমার সব সময় কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, তাই নয় ?" ভেরা উৎসাহ বর্দ্ধক মৃদু হাসল।

ড্রেসিং কামরার ভেতরে এবং বাইরে শান্ত পরিবেশ। পুরানো দেওয়াল, আর দরজা-জানলা বেশ মজবুত। স্বচ্ছন্দে ফিসফিসের চেয়ে একটু জোরে কথা বলা চলে। "আমি কত যে সমস্যা সৃষ্টি করি তা আমি বুঝি ··সব সময় এমন অনেক কিছু জানতে চাই যা আমার জানতে চাওয়া উচিত নয়।"

"তুমি যে এখনো জানতে চাও এটা ভাল···" ভেরা বলল। ও ঠোঁটে মনের ভাব না ফুটিয়ে কথা বলতে পারে না। মুখের ছোট ছোট উত্থান-পতন, ডান -বা বাঁ দিকে ঈষৎ বাঁকা, ওর মনোভাব রূপায়িত করে। "প্রথম পঁচিশ সি.সি.

রক্ত দেওয়ার পর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে দেখতে হয় রোগীর শারীরিক অবস্থায় কি পরিবর্তন ঘটল।" ভেরা এক হাতে ছুঁচটা চেপে ধরেছিল। ও একটু ঝুঁকে, চোখে উৎসাহ ব্যঞ্জক হাসি ফুটিয়ে বলল, "এখন কেমন বোধ করছ ?"

"বর্তমান মুহূর্তে, অপূর্ব।" "এটা কি একটু অতিশয়োক্তি হ'ল না ?"

"না, আমার সত্যিই অপূর্ব লাগছে। ভাল'র চেয়ে অনেক বেশী ভাল।"

"কোন কাঁপুনি বা বিস্বাদ ভাব হচ্ছে ?" "না।"

রক্তের বোতল, ছুঁচ আর গোটা রক্ত প্রদান প্রক্রিয়া যেন ওদের দু'জনের থেকে পৃথক এক তৃতীয় ব্যক্তিকে আরোগ্য করে তোলার যৌথ উদ্বেগে দু'জনকে একত্রিত করেছে। "ঠিক এই মুহূর্ত ছাড়া, সাধারণ ভাবে কেমন বোধ করছ ?" ভেরা বলল।

"ঠিক এই মুহূর্ত ছাড়া ?" দু'জনে দু'জনের চোখে চেয়ে মিনিটের পর মিনিট পার করে দিতে, বিশেষতঃ যখন ওদের তা করার পুরোপুরি অধিকার আছে এবং যখন দু'জনের চোখ ছাড়া আর কোন দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই, অবশ্যই চমৎকার লাগে। "কিন্তু···সাধারণ ভাবে বলতে পারি, খুব বিশ্রী লাগে।"

"খুব বিশ্রী লাগে ? কেন ?" ভেরা সহানুভূতিপূর্ণ বন্ধুর মত উদ্বেগ সহ বলল।

এটাই ওকে আঘাত দেওয়ার প্রকৃষ্ট সময়, এবং আঘাতই ভেরার প্রাপ্য। ওর উজ্জ্বল, ফিকে-বাদামী চোখের চাউনি যত নরমই হোক না কেন, ওকে আঘাত এড়িয়ে যেতে দেওয়া অনুচিত। "আসলে আমার মনোবলটাই বিশ্রী হয়ে গিয়েছে। বিশ্রী হয়ে গিয়েছে এই কারণে যে, আমি জানি শুধু প্রাণ ধারণের জন্য আমার কত বড় মূল্য দিতে হচ্ছে। আরেকটা কারণ আমাকে আরোগ্য করে তোলার প্রক্রিয়াটাই প্রতারণাময়, যে প্রতারণায় তুমিও জড়িত। হ্যাঁ, তুমিও আমাকে প্রতারণা করছ।"

"আমি !"

যখন দু'টি চোখ অবিরাম পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে তখন তাতে এক সম্পূর্ণ নতুন গুণ সঞ্চারিত হয়। চলতে-ফিরতে এক ঝলক দেখে যা স্পষ্ট হয় না সে সবই পরিস্ফুট হয়। ঐ ভাবে চেয়ে থাকলে অক্ষিপটের সুরক্ষা আবরণ খসে পড়ে। ভাষাহীন সত্যকে আর কোন মতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না। ওলেগ্ বলল, "তুমি কি করে অত ঐকান্তিক আশ্বাস দিয়েছিলে যে ইন্‌জেকশন গুলো নেওয়া আমার পক্ষে অত্যাবশ্যক, এবং কেন আবশ্যক আমি তা বুঝতে অপারগ ? ইন্‌জেকশন ত' আসলে হর্মোন চিকিৎসা, তাই না ? ওর আর বোঝবার কি আছে শুনি ?"

সুরক্ষা বর্ম বিহীন ফিকে-বাদামী চোখ দুটোকে অমন আচমকা অপ্রস্তুত করা ভাল কাজ নয়। কিন্তু সত্যে উপনীত হওয়ার আর কোন পথ নেই যে। ভেরার চোখে কি যেন পড়ল। ও বেশ অবাকও হ'ল। ভেরা (না, ডাঃ

গ্যাগার্ট নয়, শুধু ভেরা) চোখ ফিরিয়ে নিল। যেন যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হওয়ার আগেই দুই বিবদমান পক্ষ রণাঙ্গণ থেকে ফৌজ সরিয়ে নিল।

ভেরা রক্তের বোতলের দিকে তাকাল। কিন্তু রক্তের স্রোত বন্ধ করে রাখা বোতলটা দেখার কি আছে? ও দেখল বুদবুদ উঠছে কিনা? বুদবুদও উঠছিল না।

ভেরা স্ক্রু ঘুরিয়ে দিল। বুদবুদ উঠতে লাগল। এমনিও রক্তের স্রোত চালু করার সময় হয়েছিল। ভেরা রক্তের বোতল থেকে ঝুলন্ত রবারের নলটাকে টোকা দিল, নলে কোন বাধা থাকলে তা দূর হয়ে যাবে। আঠা লাগানো ফিতে দিয়ে ভেরা নলটা ওলেগের হাতে আটকিয়ে দিল। তারপর নলটা ঐ হাতেরই কয়েকটা আঙুলে পেঁচিয়ে দিল। এভাবে নলটা দুমড়িয়ে যাওয়া রোধ হ'ল।

ভেরার আর নলটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। ওলেগের চোখে চেয়ে থাকারও দরকার নেই। বুদবুদের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে করতে ওর মুখ মেঘলা, কঠোর হয়ে উঠল। আরো ঘন-ঘন বুদবুদ উঠছিল। "হ্যাঁ, এইভাবে থাকো। নড়-চড়া করো না।"

ভেরা চলে গেল।

না, ভেরা ঘর ছেড়ে যায়নি। কেবল ওলেগের দৃষ্টির বাইরে সরে গিয়েছিল। ওলেগের চুপ করে শুয়ে থাকতে হবে। অর্থাৎ রক্ত প্রদানের যন্ত্রপাতি, বোতলে রাখা বাদামী রক্ত আর রক্তের বুদবুদ, সূর্যালোকিত জানলার ওপরের অংশ, চাল থেকে ঝুলন্ত বাতির ঘষা কাঁচের শেডের ওপর ছ'টা জানলার সার্সি থেকে ঠিকরে পড়া রোদের প্রতিফলন, আর ঘরের চালে ফিকে রোদের বৃত্ত ছাড়া ওলেগ্ কি বা দেখতে পারে?

ভেরার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রশ্নটা ব্যর্থ হয়েছে। যেন কোন জিনিষ অনাদর আর অবহেলায় পথে পড়ে আছে। ভেরা তা কুড়িয়ে নেয়নি। ওলেগের আবার তা নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। ওরই যত দায়।

ঘরের চালে চেয়ে থাকতে থাকতে ধীরে আলোড়িত হতে থাকা ওর মনের কথা ভাষায় উচ্চারিত হ'ল: "আমার জীবন যদি পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকে, যদি আমার অস্থি-মজ্জা থেকে এ কলঙ্কময় স্মৃতি মুছে না যায় যে আমি এক চিরকালের জন্য নির্বাসিত বন্দী এবং 'অপরাধী', ভাগ্য যদি আমার জন্য এর চেয়ে ভাল কিছু বরাদ্দ না করে, জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগে কৃত্রিম উপায়ে খুন হওয়াতেই যদি আমার প্রত্যাশা সীমিত রাখতে হয়, তবে এ জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেই বা কি হবে?"

ভেরা সবই শুনল, ওলেগের দৃষ্টিপথের বাইরে থেকে।

"প্রথমে আমার থেকে ছিনিয়ে নিল আমার আয়ু। এখন আমার অধিকার

……আমার স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করে রাখার অধিকারও ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ফলে আমি এক দুর্ভাগ্যজনক পঙ্গু হয়ে যাব। তখন কারো কোন উপকারে লগার ক্ষমতা থাকবে? দয়ার পাত্র হয়ে যাব। দয়ার পাত্র!"

ভেরা কোন মন্তব্য করল না।

ঘরের চালের রোদের বৃত্তটা মাঝে মাঝে কাঁপছিল, এক একটা কোণা কুঁচকিয়ে যাচ্ছিল। যেন বৃত্তটাও চিন্তিত মনে ভ্রূকুটি করছিল। শেষে বৃত্তটা আরেক বার স্থির হ'ল।

রক্তের বোতলে বুদবুদ ওঠার বিরাম ছিল না। রক্তের স্তর নামছিল। বোতলের সিকি ভাগ রক্ত এর মধ্যে ওলেগের দেহে ঢুকে গিয়েছিল। কোন স্ত্রীলোকের রক্ত। ইরিনা ইয়ারোস্লোভেৎসেভা'র রক্ত। ইরিনা কি কিশোরী, না যুবতী? না প্রৌঢ়া? ছাত্রী, না এক সাধারণ স্ত্রীলোক? ওর রক্তও দান, দয়া……

যতক্ষণ ওর দৃষ্টির বাইরে ছিল ভেরা ততক্ষণ কথা কাটাকাটি এড়িয়ে থেকেছে। ও হঠাৎ ওলেগের সামনে এসে বলল, "না, না, এসব সত্যি নয়! ওসব তুমি নিজেও বিশ্বাস করো না, শুধু কোথা থেকে ধার করেছ। ভেবে দ্যাখো, ধার করোনি?"

ভেরা কখনো এত বেশী জোর দিয়ে কথা বলেনি। ওর বাক্যস্রোত, আহত মনের উদ্গীরণ। ওলেগের তা অপ্রত্যাশিত।

ভেরা যেমন হঠাৎ কথা শুরু করেছিল তেমিন হঠাৎ থেমে গেল। "আমাকে তাহলে, কি বিশ্বাস করতে বলো তুমি?" ওলেগ্ ভেরার মন জানার জন্য সাবধানে টোপ ফেলল।

কি দুঃসহ নীরবতা! বোতলে রক্তের বুদবুদ ওঠার শব্দও যেন শোনা যায়। ভেরার পক্ষে আর কিছু বলা দুষ্কর। ওর কণ্ঠস্বর চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ও যে গভীর খাদে পড়ে গিয়েছিল ও সেখান থেকে ওঠার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু ওঠা ওর সাধ্যের অতীত।

"মনে রেখো, এমনও মানুষ আছে যার চিন্তাধারা তোমার সঙ্গে মেলে না। তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য হতে পারে, কিন্তু পৃথক চিন্তাধারা অস্বীকার করা যায় না। সবাই যদি তোমার মত ভাবে, আমরা কাকে নিয়ে বাঁচব বলো ত'? কি নিয়ে, কিসের জন্য বাঁচব? আদৌ বাঁচতে পারব?"

ভেরা খাদ থেকে উঠে এসেছিল। ওর শেষ কথাগুলো যেন এক নতুন হতাশার ক্রন্দনরোল। ভেরা যত তুচ্ছ শক্তি সম্পন্নাই হোক না কেন ওর প্রতিবাদের ধাক্কা ওলেগের অত্যন্ত লাল হয়ে আসা দেহ মুক্তি লাভের একমাত্র সম্ভাব্য স্থানে অপসারিত করল।

কিশোরের হাতের গুলতি থেকে নিক্ষিপ্ত গুলির মত, অথবা বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে লম্বা নলওলা কামান থেকে গোলা যেমন হুশ করে বড় আকারের শিস্ দিয়ে বাতাস চিরে শূন্য পথে ধেয়ে যায়, ওলেগ্ও তেমিন নিক্ষিপ্ত হ'ল।

অধীত এবং মুখস্থ করা সব কিছুর বন্ধন ছিঁড়ে, অপরের থেকে আহৃত সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, এক অধিবৃত্ত পথে ধাবিত ওলেগ্ একের পর এক জীবনের উর্বর ভূমি অতিক্রম করে অবশেষে বহু যুগ আগের এক দেশে অবতীর্ণ হ'ল।

সে দেশ ওর শৈশবের দেশ। ও প্রথমে চিনতে পারেনি। কিন্তু যে মুহূর্তে চোখের ধোঁয়াটে, পিটপিট ভাব কাটল ও সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল, আর লজ্জিত হ'ল। ও অল্প বয়সে যা বিশ্বাস করত তা মনে পড়ল। তাতে লজ্জাও লাগল। কারণ কোথায় ও নিজে ভেরাকে সে কথা বলবে তা নয়, ভেরাই ওকে স্মরণ করাল।

তার সঙ্গে আরো কিছু স্মৃতির অতল তল থেকে ভেসে উঠল। পরিস্থিতির পক্ষে তা অত্যন্ত মানানসই। কথাটা ভাল করে মনে না এলেই নয়। শেষে মনে পড়ল।

বিদ্যুৎ চমকের মত মনে এল। কিন্তু, ওর বলার ভঙ্গী হ'ল ধীর, একের পর একটি প্রসঙ্গ আসতে থাকল: "১৯২০-এর দশকে ডাঃ ফ্রিডল্যাণ্ড নামে এক যৌন-বিদ্যা বিশারদ কয়েকটি বই লিখেছিলেন। বইগুলো অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। লোকে ভাবতে লাগল মানুষের, যুবকদের, গোটা জাতিরই চোখ খুলে যাচ্ছে, এবং তা ভাল। প্রসঙ্গটা হ'ল সবচেয়ে অনুল্লেখ্য বিষয়ে ডাক্তারি তথ্যাদি। তথ্যগুলো সত্যিই প্রয়োজনীয়, এবং ঐ বিষয়ে ছদ্ম নীবরতার চেয়ে নিঃসংশয়ে অনেক ভাল। মনে পড়ে, একটা বইয়ের নাম ছিল 'রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে', আরেকটার নাম 'প্রেমের যাতনা'। তুমি কি বই দুটো পড়েছ? তুমি ডাক্তার, হয়ত পড়ে থাকতে পারো।"

বোতলে রক্তের বুদবুদ ওঠার বিরাম নেই। আর দৃষ্টিপথের বাইরে হয়ত ভেরার নিঃশ্বাসের উত্থান-পতন ঘটেছিল।

"স্বীকার করতেই হয় যে," ওলেগ্ বলে চলল, "আমি খুব অল্প বয়সেই বই দুটো পড়েছিলাম। হয়ত তখন প্রায় বারো বছর বয়স। আমি যে পড়ছি তা, অবশ্য, বয়স্কদের জানতে দিইনি। বই দুটো মনে প্রচণ্ড দাগ কেটেছিল, অনেক দিক থেকে মনটা শূন্য ও করে দিয়েছিল। সত্যিই আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করত না…"

হঠাৎ ভেরা বলে উঠল, "আমিও…আমিও বই দুটো পড়েছি।" ওর কথায় মনোভাব বোঝা গেল না।

"তুমি পড়েছ, তুমিও?" ওলেগ্ সানন্দে বলল। 'তুমিও' কথাটা এমন করে উচ্চারণ করল যেন ভেরাও যে বই দুটো পড়েছে তা এক নবাবিষ্কৃত সত্য এবং ওলেগ্ ঐ বিশেষ সত্যের ওপর জোর দিতে চায়। "অত সঙ্গীতপূর্ণ, যুক্তি-নির্ভর, অকাট্য বাস্তববাদ, আর তার ফল হ'ল…বেঁচে থেকে কি হবে? ক'জন স্ত্রীলোক চরম আনন্দ অনুভব করেন, আর ক'জন কিছুই অনুভব করেন না, এ সবই শতকরা হিসেবে লিপিবদ্ধ। নিজের স্বরূপ সন্ধানে সচেষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কাহিনী……" ওলেগ্ শ্বাস রোধ করল, যেন

এসব মনে করার প্রক্রিয়ায় ও নিজেকে আঘাত করেছে। "... নর-নারীর দৈহিক মিলনে মনস্তত্ত্বের ভূমিকা গৌণ, এ জ্ঞান কি নিষ্ঠুর বাস্তব! লেখকের মিল বা মতে গরমিলের মূলে থাকে শারীরতত্ত্ব। তোমারও নিশ্চয় মনে পড়ছে, পড়ছে না? তুমি কখন পড়েছিলে?"

ভেরা জবাব দিল না। ওলেগের ওকে ঐভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা ঠিক হয়নি। প্রশ্নগুলো স্থূল এবং রুক্ষ হয়ে গিয়েছে। আসলে ওর স্ত্রী-লোকের সঙ্গে কথা বলার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না।

ঘরের চালে রোদের বৃত্তে হঠাৎ যেন নাচন লাগল। রুপোর মত দেদীপ্যমান বিন্দুর মালিকা যেন কোথা থেকে ধেয়ে এল। বিন্দু মালিকার আবর্তন শুরু হ'ল। ওলেগ্ দ্রুত ধাবমান আলোর বুদবুদ আর তরঙ্গরাশির দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে ওর মনে হ'ল ঘরের চালে রহস্যময় আলোর মালা বাস্তবে জানলার বাইরে এক ডোবায় জমে থাকা জলে রোদের প্রতিফলন ব্যতীত কিছুই নয়। তখনো না শুকানো ডোবার জলে বাতাস হিল্লোল তোলার ফল।

ভেরা নীরবই ছিল। "আমাকে ক্ষমা করো," ওলেগ্ বলল। ওর ক্ষমা চাইতে একটু গ্লানি বোধ হচ্ছিল না।"আমি কথাগুলো ঠিক মত বলতে পারিনি . ..." ও মাথা ঘুরিয়ে ভেরাকে দেখার চেষ্টা করে অসফল হ'ল, "আসলে ঐ ধরনের চিন্তাধারা মানবিক সবকিছু বিনষ্ট করে। তুমি যদি একবার তা মেনে নাও, এবং তার আনুষঙ্গিক সবকিছু যদি স্বীকার করে নাও... " ওলেগ্ এখন ওর প্রাক্তন বিশ্বাসের কাছে ত' সানন্দে আত্মসমর্পণ করছিলই, ভেরাকেও তাই বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছিল।

ভেরা ফিরে এল। ওলেগের দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়াল। ওর কণ্ঠস্বরে যে নৈরাশ্য বা কঠোরতার আভাস মনে হয়েছিল, মুখে তার চিহ্ন নেই। মুখে বরং বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি লেগে। "আমি চাই না যে তুমি ঐ চিন্তাধারা মেনে নাও," ভেরা বলল, "আমার দৃঢ় ধারণা, তুমি অতীতেও কখনো মেনে নাওনি।"

ভেরা দীপ্তিতে ভাস্বর। সত্যিই ভাস্বর।

হ্যাঁ, ও ওলেগের ছেলেবেলার বান্ধবী, স্কুলের বান্ধবী। ওলেগ্ আগে কেন ওকে চিনতে পারেনি?

ওলেগের ওকে সহজ, সরল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কোন কথা, যেমন "এসো, করমর্দন করো" বলতে ইচ্ছে করছিল। বলতে ইচ্ছে করছিল, "তোমার সঙ্গে শুধু কথা বলতেই কত ভাল লাগে!"

অথচ ওর ডান হাতে তখনো ছুঁচ বেঁধানো, অনড়। থাকগে, শুধু যদি ওকে ভেগা বলে ডাকতে পারত, কিংবা স্রেফ ভেরা! না, তাও সম্ভব নয়।

এর মধ্যে বোতলের অর্দ্ধেক রক্ত খালি হয়ে গিয়েছিল। এ রক্ত একদা অপর এক দেহে প্রবাহিত হয়েছে যে দেহের ছিল স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, নিজস্ব চিন্তাধারা,

আর এখন তা ওর দেহে প্রবিষ্ট হচ্ছে। স্বাস্থ্যের লালচে-বাদামী প্রবাহ ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে কিছু আপন বৈশিষ্ট্যও আছে বৈকি।

ওলেগ্ দেখল ভেরা ঘোরাফেরা করছে। ভেরা ওর কনুইয়ের নিচে রাখা বালিশটা ঠিক করে রাখল, ছুঁচের কাছে তুলোও ঠিক মত লাগিয়ে দিল। রবারের রক্তবাহী নলে ক'টা টোকা দিয়ে, রক্তের বোতল রাখা স্ট্যাণ্ডের উচ্চতা বাড়িয়ে দিল।

ওলেগের মনে হচ্ছিল ভেরার করমর্দন করে তৃপ্তি পাবে না। ওকে চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল। ওলেগ্ যা কিছু বলেছে এটা তার বিপরীত হবে। তা হোক।

ভেগা

ভেরা উৎসবের মেজাজে, গুনগুনিয়ে গান করতে করতে হাসপাতাল থেকে বেরোল। পরনে বসন্তের উপযোগী ফিকে-ধূসর কোট। পথ-ঘাট শুকনো বলে রবারের জুতো পরেনি। ওর নিজেকে লঘু এবং লাফিয়ে চলার মত সতেজ লাগছিল। যেন সব কিছুতে লঘুভাব, বিশেষতঃ পা-দুটোয়। হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল। হাঁটতে অত ভাল লাগলে গোটা শহরই হেঁটে দেখা যায়।

সন্ধ্যের অন্ধকার নামেনি। তখনো বেশ রোদ ঝলমলে। বাতাসে শীতের রেশ লেগে থাকলেও, বসন্তের আবির্ভাব অনুভূত হচ্ছিল। এমন পরিবেশে ভিড়ঠাসা বাসে ওঠা এক অর্থহীন আহাম্মকি। তার চেয়ে হাঁটাই ভাল। ভেরা হেঁটে চলল।

খোবানির ফুল ফোটার সময় আগতপ্রায়। তার চেয়ে সুন্দর ঋতু হয় না। ওর হঠাৎ মনে হ'ল বসন্ত আসার ঠিক আগে অন্ততঃ একটা ফুল ফোটা খোবানি গাছ দেখতে হবে। দূর থেকে, কোন বেড়া বা মাটির দেওয়ালের আড়াল থেকে দেখতে পেলেও চলবে। গোলাপী রঙের ফুলগুলো দেখলেই চেনা যায়।

না, এখনো ঠিক ফুল ফোটার সময় হয়নি। দেরী আছে। গাছগুলো ধূসর থেকে সবুজ হয়ে আসছে বটে, তবু ধূসরের ভাগই বেশী। শহরের পাথুরে অভিযানের বিরুদ্ধে স্বাধিকার বজায় রেখে টিকে থাকা গোটা কয়েক ছোট-খাটো বাগানের মাটির দেওয়ালের ফাঁকে শুধু লালচে, শুকনো মাটি দেখা যায়। তার বেশী নয়। এখনো দেরী আছে।

ভেরার সব সময় তাড়া। কিন্তু বাসে উঠলে ভেরা স্প্রিঙ্-ভাঙা সীটগুলোর একটায় যথাসম্ভব আরাম করে বসে, কিংবা একটা রড ধরে নিয়ে ভাবতে থাকে, "আমি আর কিছু করব না।"

অথচ ওর প্রতিটি সন্ধ্যের ঘণ্টাগুলো কোন মতে কাটাতে হয় আর সকালে একই রকম একটা বাসে চড়ে আবার হাসপাতালে আসতে হয়।

কিন্তু আজ ও তাড়াহুড়া না করে হেঁটে চলেছে। অথচ ওর অনেক কিছু করার আছে, ও করতে চায়। অনেকগুলো কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়েছে। দোকানে যেতে হবে। লাইব্রেরিতেও যেতে হবে। বাড়ীর কিছু কাজ আছে। কিছু সেলাই করাও বাকি। এছাড়া কিছু সুখকর কাজও করা বাকি যেগুলো করার মানা বা বাধা কিছু না থাকলেও ভেরা কোন না কোন কারণে ফেলে রেখেছে। এখন মনে হচ্ছে ঐ কাজগুলো অবিলম্বে সেরে ফেলা দরকার। অথচ ওর না ইচ্ছে করছে তাড়াহুড়া করে বাড়ী ফিরতে, না ঐ কাজগুলোর একটাও তক্ষুনি আরম্ভ করতে। ভেরা ওসব না করে, শুকনো ফুটপাথে প্রতিটি পদক্ষেপে আনন্দ উপভোগ করতে করতে ধীর পায়ে হেঁটে চলল। সারি সারি দোকান। ওদের বন্ধ হওয়ার সময় হয়নি। ভেরা খাবার-দাবার বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে ঢুকল না। কয়েকটা থিয়েটারের বিজ্ঞাপনও সেঁটে রেখেছে। ভেরা একটাও পড়ল না, যদিও ওর এখনকার মেজাজে ওগুলো পড়া চলে।

ভেরা শুধু হেঁটে চলল। হেঁটেই আনন্দ। এখন একমাত্র আনন্দ। ও মাঝে মাঝে মৃদু হাসছিলও। খোবানির ফুল দেখতে পেলে খুব ভাল হ'ত। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি দেখা যাবে না।

গতকাল ছুটির দিন ছিল। কিন্তু গতকাল ওর মনমরা, নির্জীব লেগেছিল। আজ সাপ্তাহিক কর্ম দিবস হলেও ওর মনে নিরুদ্বেগ, খুশির ভাব।

ওর ছুটির মেজাজের কারণ, ও সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। যে ছোট ছোট যুক্তির সূত্র অবলম্বন করে মানুষ ভয়াবহ খাদের কিনারে দাঁড়িয়েও সাহস পায় কিন্তু উপহাস সহ নাকচ হওয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে উচ্চারণ করে না, হঠাৎ যেন সেই যুক্তিগুলিই ইস্পাতের মত মজবুত রজ্জু প্রমাণিত হয়েছে। সে যুক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা এক দুনিয়া-চেনা, পাকা-মাথা, সন্দেহ প্রবণ ব্যক্তি দ্বারা স্বীকৃত, এবং সে স্বয়ং পূর্ণ আস্থা সহ ঐ রজ্জু অবলম্বন করতে প্রস্তুত।

ওরা দুজন যেন উত্তুঙ্গ পাহাড়ে যোগাযোগকারী এক কেব্‌ল কার-এর আরোহী। ওদের নিচে তাৎপর্য বোধের অভাব জনিত ভয়াবহ খাদ। আর ওরা দু'জনের ওপর আস্থাবান। ভেরা এই মানসচিত্রে বিমোহিত।

ভেরার ধারণা ও মনোবিকারগ্রস্ত ত' নয়ই, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু জানাই যথেষ্ট নয়। ও শুনতে চেয়েছে যে ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ও তা শুনেছে। ওকে যে ঐ কথা বলেছে সে কি যে এক অপূর্ব মানুষ! জীবনে অত পশ্চাদপসরণ সত্ত্বেও সে যে তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছে শুধু এই জন্য ভেরার ওকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে ইচ্ছে করছিল।

ওলেগ্‌ অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তারই অছিলায় হর্মোন চিকিৎসার খাতিরে কিছু অজুহাত খোঁজা ভেরার কর্তব্য। ওলেগ্‌ যেমন ফ্লিডল্যান্ডকে বর্জন করেছে তেমনি হর্মোন চিকিৎসাও নাকচ করেছে। এখানেই তার্কিক দ্বন্দ্বের অবকাশ। মানুষ ডাক্তারের কাছে যুক্তি নির্ভর আচরণ প্রত্যাশা করে, রোগীর কাছে নয়।

তার্কিক দ্বন্দ্বের অবকাশ থাক বা না থাক ওকে বুঝিয়ে হর্মোন চিকিৎসায় রাজী করতেই হবে। ভেরা ওকে টিউমারে পচে মরতে দিতে পারে না। এই একটি রোগীর একগুঁয়েমি, বোঝানোর শক্তি দিয়ে জয় করে সারিয়ে তুলতে হবে। অবাধ্য, একগুঁয়ে মানুষটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বোঝাতে হবে যে অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস অবলম্বন না করে তার উপায় নেই। ভেরা তাই ওর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

ওলেগ্ যখন হর্মোন চিকিৎসার বিরুদ্ধে বলছিল তখন হঠাৎ ভেরার মনে পড়ে গিয়েছিল, যে-টিউমারগুলোর অধিকাংশতঃ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য অখিল রুশ সাধারণতন্ত্র ব্যাপী এক সাধারণ নির্দেশাবলী অনুযায়ী হর্মোন চিকিৎসার প্রচলন হয়েছিল। 'সেমিনোমা' নামের টিউমার চিকিৎসার পদ্ধতি ঠিক কোন্ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বর্ণিত হয়েছিল তা ওর মনে পড়ে না। হয়ত একাধিক পত্রিকায় বর্ণিত হয়েছে, কোনটা হয়ত বিদেশীও। ওলেগ্‌কে বোঝানোর জন্য ওর সব ক'টাই পড়তে হবে। অথচ অত পড়ার সময় ভেরা সাধারণতঃ পায় না।

কিন্তু এখন ওর সবকিছুর জন্যই সময় পেতে হবে। ভেরা সবই পড়বে।

ওলেগ্ একবার তর্ক করেছিল যে ওর ভেষজ ওষুধ বিশারদ, চিকিৎসক হিসেবে ভেরার চেয়ে হীন হতে পারে না। ওলেগ্ বলেছিল চিকিৎসা শাস্ত্র গণিতের মত চুলচেরা হিসেব নির্ভর নয়। ভেরা তখন একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে মনে হয়েছে ওলেগের মত অংশতঃ নির্ভুল। যেমন দুষ্ট কোষ ধ্বংস করার জন্য রশ্মি-চিকিৎসা প্রয়োগ করার বেলায় দুষ্ট কোষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুস্থ কোষও যে ধ্বংস হয় তার শতকরা হিসাব, এমন কি আনুমানিক, কি আমরা পাই? ভেষজ ওষুধ বিশারদের দাঁড়িপাল্লার সহায়তাবিহীন এক মুঠো শুকনো শিকড়-বাকড় বিতরণের চেয়ে কি এ প্রক্রিয়া একটুও নিশ্চিত? অথবা, আজকাল সবাই যে পাগলের মত পেনিসিলিন চিকিৎসার বরাদ্দ দিচ্ছে, যেহেতু পেনিসিলিনে দ্রুত ফল মেলে। কিন্তু ঠিক কোন্ কারণে পেনিসিলিনে ফল পাওয়া যায়, তা কি চিকিৎসা জগতের কেউ সত্যিই ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন? এগুলি চিকিৎসা জগতের অনালোকিত অঞ্চল, তাই নয়? অনেক পড়ে, অনেক অনুসন্ধান করে, চিন্তা করে যদি আলোর দেখা মেলে। এসব কাজের জন্য ভেরার সময় পেতেই হবে।

কি আশ্চর্য, ও যে কখন ওর ফ্ল্যাট বাড়ীর উঠোনে পেঁছিয়ে গিয়েছে তা ভেরা লক্ষ্যই করেনি। ও যে কত তাড়াতাড়ি হেঁটেছে তাও বুঝতে পারে নি। রেলিঙে কার্পেট আর পাপোষ ঝোলানো, সিমেন্ট উঠে গর্ত হওয়া সর্ব সাধারণের বারান্দা পেরিয়ে ভেরা এগিয়ে চলল। ও নিজের ফ্ল্যাটের তালা খুলল। সামনের বারান্দায় বিছানো কার্পেটও জায়গায় জায়গায় ক্ষত-বিক্ষত। বেশ অন্ধকার। তবু সব আলো জ্বালার উপায় নেই। প্রত্যেকটার সুইচ এক জায়গায় নয়।

ও আরেকটা চাবি দিয়ে ভেতরের ঘরের দরজা খুলল। সন্ন্যাসিনীদের

প্রকোষ্ঠের মত ঘরটা ওর একটুও নিরানন্দ লাগল না। জানলায় শিক লাগানো। শহরের সব একতলার ঘরে চোরের উপদ্রবের জন্য ঐ ব্যবস্থা। ঘরে এখন গোধূলির আলো-আঁধারি। সকালে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য ছাড়া সোজাসুজি রোদ আসে না। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভেরা কোট না খুলেই ঘরটাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার দেখল। ঘরটা নতুন লাগছিল। এ রকম একটা ঘরে জীবন সুন্দর এবং উপভোগ্য হতে পারে। টেবিলক্লথটা এক্ষুনি বদলানো দরকার। অনেক কিছু ঝাড়পোঁছও করতে হবে। ছবি দুটো—বরফ-শুভ্র চাঁদনি রাতে পেত্রোপাভ্‌লভস্ক্‌ কেল্লার ছবি, আর ক্রিমিয়ার কৃষ্ণ সাইপ্রেস বৃক্ষের ছবি—নতুন জায়গায় লাগাতে হবে।

ভেরা কোট খুলে, এপ্রন পরে নিল। রান্নাঘরে গেল। স্টোভ ধরিয়ে কিছু খাবার বানাতে হবে।

কিন্তু ওর পড়শীর স্কুল-খারিজ জোয়ান তাগড়া ছেলে রান্নাঘরে আড়ভাবে নিজের মোটর সাইকেল রেখে, তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ খুলে ঘরময় সাজিয়ে, শিস্‌ দিতে দিতে সেগুলো তেল চুকচুকে করছিল। ঘরটা পড়ন্ত সূর্যের আলোয় আলোকিত। মোটর সাইকেলকে পাশ কাটিয়ে রান্নার টেবিলে পৌঁছনোর মত জায়গা ছিল। কিন্তু ভেরার হঠাৎ আর রান্নাঘরে যেতে ভাল লাগল না। নিজের ঘরে একলা থাকতে ইচ্ছে করল।

তেমন খিদেও পায়নি। আদৌ খিদে ছিল না। ভেরা দরজায় খিল দিয়ে দিল। বাইরে বেরনোর কোন প্রয়োজন নেই। টিনে চকোলেট আছে। খিদে পেলে খাওয়া যাবে।

ভেরা মায়ের থেকে পাওয়া একটা টেবিলের সামনে বসল। একটা ভারী দেরাজ ধরে টানল। ঐ দেরাজে অপর টেবিলক্লথটা আছে।

থাকগে, তার আগে সব ঝেড়ে সাফ করে নেওয়া যাক। তার জন্য একটা সহজ ধরনের পোষাক পরে নেওয়া দরকার।

ভেরার প্রতিটি চলাফেরায় আনন্দ লাগছিল। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন নাচের তালে পা বদল।

সবার আগে কেল্লা আর সাইপ্রেসের ছবি দুটো নতুন জায়গায় টাঙিয়ে নেবে? না, তার জন্য হাতুড়ি আর পেরেক লাগবে। ওসব পুরুষের কাজ, ভারি বিরক্তিকর কাজ। ছবি দুটো যেভাবে আছে আপাততঃ তাই থাক।

ভেরা ঝাড়ন হাতে কাজে নেমে পড়ল। তার সঙ্গে গুনগুন করে গান।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরশুদিন পাওয়া একটা রঙীন ছবিওলা পোস্টকার্ডে চোখ পড়ল। পেট-মোটা সেন্টের শিশিতে হেলান দিয়ে রাখা পোস্টকার্ডটার সামনের দিকে সবুজ রিবনে বাঁধা লাল গোলাপ গুচ্ছের ছবির সঙ্গে নীল রঙে বড় আকারের '৮' লেখা। পেছন দিকে টাইপ করা অভিনন্দন বাণী। ওর শ্রমিক সংগঠন সমিতি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। [৮ই মার্চ সোভিয়েত দেশে আন্তর্জাতিক সর্বহারা নারী সংহতি দিবস হিসেবে

চিহ্নিত ছিল। অধুনা নর-নারীর ফুল এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের উপলক্ষ্য পরিগণিত।]

নিঃসঙ্গ মানুষের জাতীয় ছুটির দিনগুলো কাটে না। যে নিঃসঙ্গ নারীর বছরগুলো এক এক করে পেরিয়ে যাচ্ছে, নারী দিবস উপলক্ষ্যে ছুটির দিন তার কাছে অসহ্য। অবিবাহিতারা আর বিধবারা এদিন একত্রিত হ'য়ে গুচ্ছের মদ গেলে, গান গায়, আর ভাণ করে ওরা কত সুখে আছে। গত রাতে ওদেরই একটা দল হৈচৈ করে উঠোনে উৎসব পালন করল। ওদের মধ্যে মাত্র একজন বিবাহিত পুরুষ ছিল। মাতাল হয়ে যাওয়ার পর ঐ পুরুষটিকে চুমু দেওয়ার জন্য মেয়েদের লাইন লাগানোর সে কি ঘটা।

ভেরার শ্রমিক সংগঠন সমিতি আর কোন ভাবে মন ভেজানোর চেষ্টা না করে, শুধু কাজে সফলতা আর ব্যক্তিগত জীবনে সুখের শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

ব্যক্তিগত জীবন? ভেরা পোস্টকার্ডটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দিল।

ও প্রথমে ক'টা সেন্টের শিশি ঝেড়ে সাফ করল, তারপর ক্রিমিয়া'র ছবিওলা কাঁচের আলমারি, রেডিওর পাশে রাখা রেকর্ডের বাক্স, সব শেষে কোণাকৃতি প্লাস্টিকের বাক্সে রাখা রেকর্ড-প্লেয়ার।

অতগুলো রেকর্ডের যে কোন একটা শুনলে এখন আর ওর মন খারাপ হবে না। এখন সেই অসহ্য রেকর্ডটা লাগালে মন্দ হয় না, "সাথী হীন আমি, আগেরই মত সাথী হীন ..." কিন্তু, না, ও আরেকটা রেকর্ড খুঁজতে লাগল। সেই রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে, ভেরা মায়ের গদীমোড়া ডেক-চেয়ারে মোজা পরা পা গুটিয়ে আরাম করে বসল। হাতে তখনো ঝাড়ন ধরে রাখা। ঝাড়নটা হাত থেকে মেঝেয় ঝুলতে থাকল।

ধুসর হয়ে আসা ঘরের আলোয় রেকর্ড-প্লেয়ারের সবুজ আলো জ্বলজ্বল করে উঠল। 'নিদ্রিত সুন্দরী' গীতিনাট্য। প্রথম অংশে 'এ্যাডাজিও'র কথা', পরের অংশে 'পরীদের আগমন'।

ভেরা শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে কল্পনা করার চেষ্টা করল 'নিদ্রিত সুন্দরী' গীতিনাট্যাভিনয় দেখে ওলেগের কি মনোভাব হত। রঙ্গশালার এক কোণে বৃষ্টি ভেজা, রোগের দরুণ নিঃসঙ্গ এবং কখনো সুখের মুখ না দেখা ওলেগের মুখ মানশ্চক্ষে ভেসে উঠল।

ভেরা আরেকবার রেকর্ডটা বাজাল। আরো একবার।

তারপর ভেরা কথা বলতে শুরু করল, স্বরে প্রকাশিত কথা। ও ওলেগের সঙ্গে কথা বলছিল। ওলেগ্ যেন সবুজ আলোয় ভরে ওঠা ঘরে ওর সামনে বসে আছে। ওর যা কিছু বক্তব্য তার সবই বলছিল, ওলেগের কথা শুনছিল ও। ওলেগ্ যা কিছু বলতে পারে, ওর কান তার জন্য নির্ভুলভাবে তৈরি। ওলেগের মনোভাব আগে থেকে আঁচ করা কঠিন, বিশেষতঃ যেমন ওর প্রতিটি আধ নিয়ে প্যাঁচানো অভ্যাস। ভেরা, যাহোক অভ্যস্ত হয়ে এসেছে।

আজ ওদের দু'জনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে ভেরা তা-ই শেষ করছিল। ভেরা যা বলছিল তা এমনিতে বলা যায় না। তার কারণ ওদের দু'জনের বর্তমান সম্পর্ক। কিন্তু এখন সেকথা বলতে অসুবিধে নেই। ভেরা নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। ওর মতে লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের অতিমানবরা এখনো মানবিক স্তরে পেঁাছোননি। ফলতঃ হেমিংওয়ে সম্পর্কে বলা চলে, তিনি এক অগভীর জলে ফড়ফড় করা মাছ মাত্র। (ওলেগ্ অবশ্যই গলা ফাটিয়ে বলবে যে ও আদৌ হেমিংওয়ে পড়েনি। এমন কি কিছুটা দম্ভ দেখিয়ে বলবে, ওসব বই ফৌজে কিংবা বন্দী শিবিরে ছুঁতে দেওয়া হয় না) ভেরার মতে, হেমিংওয়ে যা বলেছেন নারী পুরুষের কাছে মোটেই তা চায় না, নারীর তা প্রয়োজন নেই। নারী পুরুষের কাছে যত্ন চায়, ভালবাসা চায়, নিরাপত্তা চায়। বুঝতে চায় পুরুষটি তার বর্ম এবং আশ্রয়। (মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত, নাগরিক হিসেবে সব তাৎপর্য বিরহিত ওলেগ্ই কোন এক কারণে ভেরার মনে নিরাপত্তা বোধ এনে দিয়েছে)

নারীর স্বরূপ কি হওয়া উচিত সে নিয়েও নানা জনের নানা ধারণা। অধিকাংশের মতে কারমেন চরিত্রই নারীত্বের পরাকাষ্ঠা। তাদের মধ্যে নারীত্বের উৎকর্ষ তখনই দেখা যায় যখন নারী তার সুখ ভোগের ব্যাপারে অতিশয় আগ্রাসী। কিন্তু ভেরার মতে নারীর ঐ রূপ পুরুষের নামান্তর, নারীর পোষাকে সজ্জিত পুরুষ।

এই বিশেষ প্রসঙ্গে আরো চিন্তা-ভাবনা এবং ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ওলেগ্ ত ওর কথা শুনে চমকিয়ে উঠলই। ওলেগ্ এ ধরনের কথা শোনার জন্য তৈরি ছিল না। সুতরাং ওর ভাবতে হবে।

ভেরা রেকর্ডটা আবার বাজাল।

বেশ অন্ধকার হয়ে এল। ভেরা এর মধ্যে ঝাড়পোঁছের কথা ভুলে গিয়েছিল। রেকর্ড প্লেয়ারের সবুজ আলো আরো গাঢ় লাগছিল। তার দ্যুতি আরো, আরো দূরে বিস্তৃত। ভেরার ঘরের বাতি জ্বালতে ইচ্ছে করল না। আধো-আঁধার ঘরে চোখ মেলে বসে থাকতে ভাল লাগল।

আধো-অন্ধকারেই ও নিঃসঙ্কোচে দেওয়ালে টাঙানো, ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছোট্ট ফটোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সস্নেহে ফটোটা রেকর্ড-প্লেয়ারের সবুজ আলোর কাছে এনে রাখল। তারার মত দপ্দপ্ করে জ্বলতে থাকা সবুজ আলোটা নিভে গেলেও ভেরার ফটোটার সব খুঁটিনাটি চিনে বের করতে অসুবিধে হয় না: একটি সবে কৈশোর উত্তীর্ণ যুবকের পরিচ্ছন্ন মুখ; আঘাত সইবার অনুপযোগী, অনভিজ্ঞ, স্বচ্ছ দুটি চোখের চাউনি; পরিপাটি সাদা শার্টের ওপর টাই—তার শেষ টাই। ঐ স্যুটটাও ওর জীবনের প্রথম। অথচ তখনই যে কোটের ল্যাপেলটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাতে তার পরোয়া নেই; কারণ ল্যাপেলে এক ভীষণ-দর্শন ব্যাজ আঁটা ছিল। ব্যাজে ছিল একটি ছোট্ট বৃত্তে ঘেরা একটি মানুষের পাশ থেকে দেখা অবয়বরেখা। ছয় সেঃ মিঃ চওড় আর ১০ সেঃ মিঃ লম্বা ফটোটার ব্যাজও তেমনি ছোট্ট, কিন্তু দিনের আ

স্পষ্ট বোঝা যেত অবয়বরেখাটি লেনিন-এর। (ভেরার মনশ্চক্ষে এখনো ব্যাজটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে) ছবিতে যুবকটির হাসি-হাসি মুখ। যেন বলতে চায়, "আমার এই ফটোটার চেয়ে বড পুরস্কার চাই না।" এই যুবকই ওর জন্য ভেগা' নাম উদ্ভাবন করেছিল।

এ্যাগেভ্-এর ফুল [এ্যাগেভ্ এক ধরনের লতানে উদ্ভিদ, ইওরোপ এবং আমেরিকার পাওয়া যায়] জীবনে একবারই ফোটে। অল্প পরেই মরে যায়।

এভাবেই ভেরা গ্যাঙ্গাট প্রেমে পড়েছিল। ভেরাও এখন কিশোরী। স্কুলের ছাত্রী।

যুবকটি বিশ্বযুদ্ধে মারা গিয়েছিল। তারপর থেকে যত রকমেরই যুদ্ধ হয়েছে—ন্যায় সঙ্গত, দেশের স্বার্থে অথবা ধর্মযুদ্ধ- ভেরার কাছে ঐ যুদ্ধটাই শেষ যুদ্ধ হয়ে রয়ে গিয়েছে, যে যুদ্ধে ও যাকে ভালবাসত সে মারা গিয়েছে। তার সঙ্গে ভেরাও।

ঐ ঘটনার পর ভেরাও মরে যেতে চেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল। রণাঙ্গণে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ও জার্মান বংশোদ্ভূত বলে ওকে রুশ ফৌজে নেয়নি।

যুদ্ধের প্রথম গ্রীষ্মের দু-তিন মাস ওরা দু'জন একত্র থাকতে পেরেছিল। বোঝাই গিয়েছিল শীঘ্রই যুবকটির যুদ্ধে যেতে হবে। আজ এক যুগ পরে একথা বুঝিয়ে বলা যাবে না, ওরা কেন এর মধ্যে বিয়ে করে উঠতে পারেনি। বিয়ে না হয় নাই করুক, মিলনের শেষ ক'টা মাস ওরা কি করে অযথা নষ্ট হতে দিল তাও কাউকে বোঝানো যাবে না। চার পাশের সব অচলায়তনগুলো ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার ঐ সময় কোন্ বাধা ওদের পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল ?

কিন্তু, ছিল। আজ সে বাধার কথা ভেরা কাউকে বোঝাতে পারবে না। নিজেকেও না।

"ভেগা! আমার ভেগা!" ও রণাঙ্গন থেকে ডেকে বলত, "তুমি আমার হয়েছ না জেনে আমি মরতেও পারব না। যদি মাত্র তিন দিনের ছুটি নিতে পারি কিংবা অসুস্থতার অছিলায় হাসপাতালে ভর্তি হতে পারি, তাহলেও আমরা বিয়ে করে ফেলতে পারি। পারি না, ভেগা ?"

"ওসব কথা ভেবে একটুও মন খারাপ করো না। আমি আর কারো হবো না, কখনই হবো না। আমি তোমার; তোমারই থাকব। শুধু তোমার," ভেরা লিখে জানাত। যুবকটি তখনো বেঁচে ছিল।

ওর ছুটি নেওয়া হয়নি। হাসপাতালে যাওয়াও হয়নি। ও যুদ্ধে মারা গিয়েছিল।

ও আর নেই। কিন্তু ওর তারাটা আজও জ্বলছে। শুধু সে তারার আলো ব্যর্থ, ব্যর্থ। ঐ ধরনের তারারা নিভে গিয়েও আলো দেয়। আজও আলো দিচ্ছে। সে আলো সবাই দেখতে পায় না। সবার প্রয়োজনও নেই।

ভেরাকে ফৌজে নিল না। রণাঙ্গণে মরা হ'ল না। ওর সামনে খোলা ছিল শুধু বেঁচে থাকা, মেডিক্যাল কলেজে ফিরে যাওয়া। মেডিক্যাল কলেজে ফিরে ভেরা গ্রুপ মনিটর হ'ল। [রুশ দেশের কলেজে ছাত্রদের এক একটি দল বা গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রতি গ্রুপে একটি করে মনিটর বা নেতা। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে ছাত্রদের সংগঠিত করা মনিটরের কর্তব্য] ও সাগ্রহে ক্ষেত-খামারের কাজ, সাফ-সুতর করার কাজ কিংবা রোববারের কাজের স্বেচ্ছাসেবী দলে নিজের নাম লেখাত। আর কি বা করবার ছিল?

ভেরা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম শ্রেণীর স্নাতক হ'ল। ওর শিক্ষা গুরু ডাঃ ওশচেঙ্কভ ওর ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনিই ওকে সুপারিশ করে ডন্টসোভার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ওর এখনকার ধ্যান-জ্ঞান ওর রোগীরা এবং তাদের চিকিৎসা। তাতেই ওর মুক্তি!

ফ্রিজল্যাণ্ডের স্তর থেকে বিবেচনা করলে, অবশ্য এ সবই অনর্থক, রোহিসেবী পাগলামি। ঐ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে সিদ্ধান্ত হবে, প্রেতাত্মার ধ্যান করার চেয়ে জীবিত ব্যক্তির সন্ধান শ্রেয়ঃ।

কিন্তু এ যে সম্ভব নয়। আর যা হোক দেহের কোষ তন্তু, রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আর বার্দ্ধক্যের নিয়মগুলি অকাট্য। তাদের এড়ানো অসম্ভব।

তাই কি? ভেরা জানে, ঐ নিয়মগুলির কোনটিই ওর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ওর ক্ষেত্রে ওসব নিয়ম বর্জিত।

ভেরা নিজেকে "আমি তোমার। তোমারই থাকব" প্রতিশ্রুতির সঙ্গে শাশ্বতভাবে আবদ্ধ মনে করে না। কিন্তু আসল সমস্যা হ'ল একবার কারো সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলে সে কখনই পুরোপুরি মরে না। সে বেঁচে থাকে। কিছু দেখে, কিছু শোনেও। সেই যুবকটির অস্তিত্বও বাস্তব। সহায়হীন, ভাষাহীন সে দেখবে, ভেরা বিশ্বাসভঙ্গ করল।

সেক্ষেত্রে দেহের কোষতন্তুর বৃদ্ধি, ক্ষরণ বা ক্রিয়া-বিক্রিয়ার তাৎপর্য কতটুকু? ওর মত যদি আরেকটিও পুরুষ না পাওয়া যায় তবে ওসব তথ্য অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে না? না, ওর মত আর কেউ নেই। দেহের কোষ-তন্তুর বৃদ্ধি বা তাদের ক্রিয়া-বিক্রিয়া দিয়ে কি হবে?

আসলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক ভোঁতা, অনেক ক্লান্ত হয়ে যাই। দুঃখিত হওয়ার বা বিশ্বস্ত থাকবার প্রকৃত বোধই হারিয়ে ফেলে নিজেদের কালের হাতে সমর্পণ করি। অথচ তখনো দৈনন্দিন খাদ্য গোগ্রাসে গিলি, আঙুল চেটে চেটে রসাস্বাদন করি। এ ব্যাপারে বোধ শক্তি একটুও হ্রাস পায় না। দু'দিন খেতে না পেলে ত' আমরা পাগলই হয়ে যাই। কি উন্নতিই না হয়েছে মনুষ্য সমাজের।

ভেরা বদলায়নি, গুঁড়িয়ে গিয়েছে। ওর মাও মারা গিয়েছে। ও মায়ের কাছে থাকত। শুধু মা-বেটিতে। মা মারা গেল, কারণ মাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভেরার বড় ভাইয়ের দরুণ। ভেরাব দাদা ইঞ্জিনিয়ার ছিল।

সে ১৯৪০-এ গ্রেফতার হ'ল। গ্রেফতার হওয়ার কয়েক বছর পর অব্দি চিঠি লিখিত। ভেরারাও বুরিয়াৎ-মঙ্গোলিয়ার কোন এক ঠিকানায় তাকে ডাক যোগে এটা-ওটা পাঠাত। তারপর একদিন ওরা পোস্ট অফিস থেকে এক অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তি পেল; তার সঙ্গে দাদাকে পাঠানো একটা পার্সেলও ফেরৎ পেল। পার্সেলের সব দিকে এক গাদা ডাক মোহর লাগানো। প্রাপকের ঠিকানা কেটে দেওয়া। মা পার্সেলটাকে একটা কফিনের মত বয়ে নিয়ে এল। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই দাদার দেহ ঐ পার্সেলে ধরে যেত।

মা নিঃশেষ হয়ে গেল। তার ওপর একটু পরেই ওর বৌদি আরেক জনকে বিয়ে করল। বৌদির কথা মায়ের বোঝার সাধ্য ছিল না। মা ভেরাকে বুঝত। ভেরা তাই একলাই রয়ে গিয়েছে।

ঠিক একলা নয়। ভেরা একাই ঐ রকম নয়। ওর মত লক্ষাধিক মেয়ে আছে! রুশ দেশে কত যে নিঃসঙ্গ নারী আছে তার সঠিক হিসেব কে জানে? কে গুণে দেখেছে ওদের ক'জন অবিবাহিতা, আর ক'জন বিবাহিতা? নিঃসঙ্গ নারীরা সবাই প্রায় ভেরার বয়সী, একই দশকে জন্মেছে, যে পুরুষরা যুদ্ধে মারা গিয়েছে তাদের কাছাকাছি বয়সী।

যুদ্ধ পুরুষদের কৃপা করেছে, তাদের নিয়ে নিয়েছে। রেখে গিয়েছে মেয়েদের, অন্তিম দিন অব্দি কষ্ট ভোগ করতে।

যে অবিবাহিত পুরুষরা যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে নিজেদের ঘষটিয়ে বের করে নিয়ে আসতে পেরেছে তারা তাদের চেয়ে অনেক কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে করেছে। যুদ্ধ-ফিরতি পুরুষদের থেকে কিছু কম বয়সীরা যেন একেবারে এক নতুন প্রজন্মের, প্রায় নাবালকের দল। যুদ্ধ তাদের একটা ট্যাঙ্কের মত পিষে দিয়ে যায়নি।

লক্ষ লক্ষ মেয়ে তাই পড়ে আছে। কেউ তাদের ফৌজে নেয়নি। ওরা কোন বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পৃথিবীতে আসেনি। ইতিহাসের বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে ওরা এক ঊষর প্রান্তর।

ওদের মধ্যে যারা জীবন যেমন তাই মেনে নিয়েছে তাদের বরাত তত দুঃখের নয়।

তারপর অনেকগুলো ঘটনা বিহীন, আটপৌরে বছর কেটে গিয়েছে। ঐ বছরগুলোয় ভেরা যেন এক পাকাপাকি গ্যাস-মুখোস এঁটে চলাফেরা করেছে। ওর মাথাটা যেন আঁটসাঁট, কষ্টদায়ক রবারের খোলসে আঁটা। গ্যাস-মুখোসটা ওকে পাগল, অত্যন্ত দুর্বল করে তুলেছিল। ও বাধ্য হয়ে মুখোসটা ছিঁড়ে ফেলেছিল।

তার পর থেকে ওর জীবন অনেক বেশী মানুষের মত হয়ে এসেছে। ও সবকিছুতে মানানসই হতে রাজী হয়েছে। আর লোকজনকে এড়িয়ে থাকে না। যত্ন করে সাজেও।

বিশ্বস্ত থাকায় তৃপ্ত আছে। বোধ হয় সবচেয়ে বেশী তৃপ্ত। সে

বিশ্বস্ততার কেউ মূল্য না দিক, এমন কি কেউ তা না জানুক, তবু।

শুধু যদি সে বিশ্বস্ততার প্রভাব কারো ওপর পড়ত! কিন্তু কারো ওপর যদি প্রভাব না পড়ে, তবে? কারো যদি তাতে না প্রয়োজন থাকে?

গ্যাস-মুখোসের চশমা যত বড়ই হোক না কেন তার মধ্যে দিয়ে অল্পই দেখা যায়। কিছু ভাল দেখা যায় না। সে চশমা খুলে ফেলার পর থেকে ভেরার অনেক ভাল দেখতে পাওয়ার কথা।

কিন্তু ভেরা তা পায় না। অনভিজ্ঞ ভেরা পদে পদে আঘাত পায়। ও অসাবধান, তাই ভুল পা পড়ে যায়। হ্রস্ব, অযোগ্য ঘনিষ্ঠতায় জীবন আলোকিত হয় না, জীবনে স্বস্তিও আসে না। সমন্বয় হারা, কলুষিত ভেরা অবমানিত বোধ করে।

ভুলে যাওয়া অসম্ভব। মুছে ফেলার প্রশ্নই ওঠে না।

না, জীবন যে রকম তা মেনে নেওয়ার ক্ষমতা ভেরার নেই। যে মানুষ যত ক্ষণ-ভঙ্গুর তাকে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসতে তত বেশী একই সময় ঘটে যাওয়া ঘটনা সমন্বয় প্রয়োজন হয়। প্রতিটি ঘটনা সমন্বয় যেমন এই নৈকট্য বৃদ্ধিতে এক একটি ভগ্নাংশের আকারে সহায়ক, এক একটি ছোট ছোট গরমিল তেমনি এক লহমায় সবকিছু ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। ভেরার ক্ষেত্রে এই গরমিল প্রাথমিক পর্যায়েই দেখা দিত, আর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকত। এই পরিস্থিতিতে ও কি করবে, কি করে বাঁচবে সে উপদেশ দেওয়ার মত কেউ নেই।

সব মানুষেরই জীবনের পথ পৃথক হতে বাধ্য। ভেরারও।

ওকে অনেকে অনেক করে বুঝিয়েছিল, একটা শিশুকে পোষ্য নাও। ও এ ব্যাপারে অনেক স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাও বলেছিল। ওর বুদ্ধিটা ভাল লাগল। অনাথ আশ্রমে যাতাযাতও করল। কিন্তু, শেষে ছেড়ে দিল। হঠাৎ কোন শিশুকে ভালবাসা যায় না। যেহেতু ও হতাশায় ভুগছে কিংবা স্রেফ ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে কোন এক শিশুকে সত্যিই ভালবেসে ফেলবে, এমন হয় না। তার সঙ্গে ভয়ও আছে, ভেরা হয়ত পবে শিশুটিকে আর ভালবাসতে পারল না। আরো বড় ভয়, শিশুটি যদি ওর বিপরীত হয়ে ওঠে।

ওর যদি একটা মেয়ে থাকত! ধার করা নয়, নিজের মেয়ে। মেয়েদের যেমন নিজের মনের মত করে মানুষ করা যায়, ছেলেদের তা পারা যায় না। নিজের মেয়ে থাকলে আবার একবার বেঁচে ওঠার চেষ্টা করা যেত।

ভেরা মাঝ রাত অব্দি চেয়ারে বসে রইল। সন্ধ্যায় যে কাজগুলো করবে স্থির করেছিল তার একটাও করা হয়নি। ঘরের আলোও জ্বালেনি। রেকর্ড-প্লেয়ারের আলোই যথেষ্ট। ঐ আলোয় চোখ রেখেই চিন্তার জাল বুনে সময় কেটে গেল।

অনেকগুলো রেকর্ডও শুনে ফেলল। সবচেয়ে বিষাদময় রেকর্ড শুনেও মন

উদাস হ'ল না। কয়েকটা ফৌজী মার্চের রেকর্ড'ও শুনল। মার্চের রেকর্ড শুনতে শুনতে মনে হ'ল ও যেন বিজয়িনীর মত আরাম করে সিংহাসনে পা গুটিয়ে বসে আছে, আর ওর সামনে দিয়ে ফৌজ বিজয় উৎসবের প্যারেড করে চলেছে।

চোদ্দটা মরুভূমি পেরিয়ে ভেরা এত দিনে বাড়ী পৌঁচেছে। পাগলামি ভরা চোদ্দটা বছর। অথচ ভেরা তার মধ্যে একটুও ভুল করেনি।

আজ, এই দিনে, ওর বিশ্বস্ততার বছরগুলো এক নতুন, চরম তাৎপর্য পেয়েছে।

প্রায় বিশ্বস্ততা। কেউ তাকে বিশ্বস্ততাও বলতে পারে। যে বিশ্বস্ততা কাজে আসে সেই বিশ্বস্ততা।

আজই ভেরা বুঝেছে, যে মারা গিয়েছে সে এক কিশোর মাত্র, কোন মতেই ভেরার কাছাকাছি বয়সী এক পুরুষ নয়। তার সেই সহজে বাগ না মানা পুরুষ সুলভ ভারী ভাব নেই যা নারীর একমাত্র আশ্রয়স্থল। তার না হয়েছে পুরোপুরি যুদ্ধটা দেখা বা যুদ্ধের শেষ অব্দি লড়াই করা, না যুদ্ধ পরবর্তী অত্যন্ত অসুবিধেয় ভরা বছরগুলি দেখার অভিজ্ঞতা। সে আঘাত সইবার অনুপযোগী, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন এক নব যুবক রয়ে গিয়েছে।

ভেরা শুয়ে পড়ল, কিন্তু তক্ষুণি ঘুম এল না। রাতে যে খুব বেশী ঘুম হবে না, ওর এ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল না। ঘুমিয়ে পড়ার পরও অনেকবার ঘুম ভেঙে গেল। অনেকগুলো স্বপ্নও দেখল। কয়েকটা ঘাবড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন। বাকিগুলো মন্দ নয়। ও সেগুলো সকালে মনে করবে ভাবল।

সকালে ঘুম ভেঙে ভেরার হাসি পেল। ও মৃদু হাসল।

আবার প্রাত্যহিক ভিড় বোঝাই বাসে ঠেলাঠেলি করে ওঠা। কেউ ওর পা মাড়িয়ে দিল। বিনা প্রতিবাদে তা সহ্য করতে হ'ল।

ও সাদা কোট গায়ে চড়িয়ে কাজ আরম্ভের আগে প্রাত্যহিক পাঁচ মিনিটের বৈঠকে যোগ দিতে চলল। বারান্দায় গোরিলার মত বেখাপ্পা এবং শক্তিশালী গড়ন, অমায়িক লেভ্ লিওনিডোভিচ্-কে ওর দিকে আসতে দেখল। লেভ্ মস্কো থেকে ফেরার পর দেখা হয়নি। ওঁর লম্বা লম্বা বাহু দুটো এত ভারী যেন ভারের চোটে কাঁধও ঝুলে পড়েছে। হয়ত কেউ ওঁর কাঁধের গড়নে খুঁত দেখতে পাবে, কিন্তু ওঁর শরীরে কাঁধ দুটোই প্রকৃত সুন্দর। মাথাটা যেন বিভিন্ন স্তরে ছেনির বড় বড় ঘা মেরে কেটে তৈরি করা। মাথার চাঁদি অনেকটা পেছোনো। তার ওপর একটা হাসি পাওয়ানো গোছের ছোট টুপি আঁটা, যেমন টুপি পাইলটরা পরে থাকে। সে টুপিও লেভের অভ্যাস মত অযত্নে পরা। টুপির সামনের দিকটা দোমড়ানো, পেছন দিকের দু'কোণ শুয়োরের কানের মত উঁচু হয়ে আছে। একটা আঁটসাঁট, সামনে আঁটা, সাদা কোট গায়ে দেওয়া লেভ্কে তুষারে লড়াইয়ের ছদ্মবেশে সজ্জিত ট্যাঙ্কের মত দেখাচ্ছে। কোঁচকানো, পাশে দৃষ্টি ফেরানো চোখ, আর মুখে কঠোর, ভয় পাওয়ানো ভাব ফোটানো

লেভ্ এগিয়ে আসছিলেন। কিন্তু ভেরা জানে, লেভ্ মুখ ফেরালেই মুখে হাসি ফুটবে।

সিঁড়ির মুখে দু'জনের দেখা হয়ে যেতে লেভের মুখে হাসি ফুটল। ভেরা বলল, "আপনি ফিরে এসেছেন দেখে ভাল লাগছে। আপনি না থাকলে সত্যিই ভাল লাগে না।"

লেভের হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে গেল। ওঁর দুলতে থাকা এক হাত ভেরার কনুই ধরল। ও বলল, "তোমাকে খুব খুশি-খুশি লাগছে। বিশেষ খুশির কি আমিও ভাগ পেতে পারি?"

"না, না, সে সব কিছু নয়। মস্কোয় কেমন কাটল?"

লেভ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "মন্দ কাটেনি। কিন্তু একটু অসুবিধেয় পড়েছিলাম। আসলে মস্কো জায়গাটাই বেশ গোলমেলে।"

"পরে সবিস্তারে শুনব।"

"তোমার জন্য কয়েকটা রেকর্ড এনেছি। তিনটে।"

"তাই নাকি? কোন্গুলো?"

"দ্যাখো, দোকানদারগুলোর ব্যাপারে আমি কখনই তেমন নিশ্চিত হতে পারি না···গাম্-এ [মস্কোর সবচেয়ে বড ডিপার্টমেণ্ট স্টোর] এখন লং প্লেয়িং রেকর্ডের একটা পৃথক বিভাগ হয়েছে। আমি তাদের তোমার তালিকা দিয়েছিলাম। ওরা সেই তালিকা থেকে তিনটে রেকর্ড মোড়ক করে আমাকে দিয়েছে। আগামীকাল নিয়ে আসব। আজকের বিচার সভায় আসছ ত, ভেরা?'

"কিসের বিচার?"

"কেন, তুমি জানো না? একজন সার্জনের বিচাব হচ্ছে। ও তিন নম্বর হাসপাতালের সার্জন।"

"রীতিমত আদালতে বিচার হবে?"

"না, এখনো সহকর্মীদের বিচার সভায় বিচার হচ্ছে। [রুশ দেশে এ ধরনের বিচার সভায় সহকর্মীদের সামাজিক অপকর্মের বিচার হয়ে থাকে। এ বিচার সভার আইনগত ক্ষমতা নেই, কিন্তু এরা নিয়ম মাফিক বিচারালয়কে মামলা পাঠাতে পারে] কিন্তু অনুসন্ধানেই আট মাস লেগে গিয়েছে।"

জোয়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। ও সবে রাত ডিউটি সেরে বেরোচ্ছে। ও দু'জনকে সুপ্রভাত জানাল। দু'চোখে হাসির রোশনি।

লেভ্ আবার বললেন, "একটি শিশু অপারেশনের পর মারা গিয়েছে। এখনো আমার শরীরে মস্কোয় সংগৃহীত তেজ মজুদ থাকতে থাকতে যাই, অনেক চেঁচামেচি করতে হবে। এখানে এক সপ্তাহ থাকলেই সব উৎসাহ জুড়িয়ে যায়। বিচারে আসছ ত'?"

ভেরা উত্তর দিতে পারল না। মনস্থির করতে পারল না। প্রাত্যহিক আলোচনা সভায় যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। আলোচনা কক্ষে সেই পরিচিত

উজ্জ্বল-নীল টেবিল ক্লথ ঢাকা টেবিল আর তাকে ঘিরে কয়েকটা ছোট ছোট চেয়ার।

ভেরা লেভের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। লেভ্ আর ডন্ট্সোভা যতটা ওর ঘনিষ্ঠ ততটা আর কারো নয়। লেভের সঙ্গে ভেরার সম্পর্কের সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ এবং নারীর মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক সচরাচর দেখা যায় না। পুরুষরা যে বিশেষ ভঙ্গীতে চেয়ে থাকে লেভ্ কখনো তা করেন না, লেভ্ ভুলেও কোন ইঙ্গিত করেন না, একটুও মাত্রা ছাড়ান না, কখনো কোন দাবী-দাওয়া করার প্রশ্নই ওঠে না। ভেরাও, অবশ্য, করে না। দু'জনের এক নির্দোষ, মানসিক টানা-পোড়েন বর্জিত বন্ধুত্ব। যে প্রসঙ্গগুলি ওরা কখনো উল্লেখ করে না, এড়িয়েই চলে, তা হল: প্রেম, বিয়ে আর তৎসম্পর্কিত সবকিছু। যেন ঐ জিনিষ দু'টির অস্তিত্বই নেই।

লেভ্ও বোঝেন যে ঐ ধরনের সম্পর্কই ভেরার প্রয়োজন। লেভ্ একবার বিয়ে করেছিলেন, সে বিয়ে ভেঙে যায়। তারপর কারো সঙ্গে 'বন্ধুত্ব' পাতিয়েছেন। হাসপাতালের স্ত্রীলোকরা, অর্থাৎ গোটা হাসপাতালই, ওঁর বিষয়ে আলোচনা করতে ভালবাসে। ঐ মহলের সন্দেহ, লেভ্ সম্প্রতি একটি অপারেশন-থিয়েটার নার্সের সঙ্গে মজেছেন। এক যুবতী সার্জন, এ্যাঞ্জেলিকা, লেভ আর নার্সের প্রণয় কাহিনীর সত্যতা জাহির করেছে। কিন্তু অনেকের ধারণা এ্যাঞ্জেলিকাই লেভ্কে গেঁথে তুলতে চায়।

আলোচনা সভার পাঁচ মিনিট সময়ে ডন্টসোভা একটা কাগজের টুকরোয় কোণাকৃতি রেখা অঙ্কন করতে করতে কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেন। ভেরা অন্য দিনের চেয়ে অনেক শান্তভাবে বসে রইল। ও নিজের মধ্যে এক অচেনা স্থির ভাবের উপস্থিতি অনুভব করছিল।

আলোচনা সভা শেষ হতে ভেরা স্ত্রীলোকদের ওয়ার্ডে রাউণ্ড দিতে লাগল। এ ওয়ার্ডে অনেক রোগী। বেশী সময় লাগে। ভেরা প্রত্যেক বেডে বসে রোগীকে পরীক্ষা করে, রোগীর সঙ্গে নরম ভাবে কথা বলে। ওর রাউণ্ডের সময় ভেরা ওয়ার্ডে পুরোপুরি নীরবতা বজায় রাখার ওপর জোর দেয় না। স্ত্রীলোকদের অতক্ষণ কথা কওয়া বন্ধ করে রাখা সম্ভব? পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ওয়ার্ডে চিকিৎসকের অনেক বেশী কৌশলী এবং সাবধান হতে হয়। ডাক্তার হিসেবে ভেরার পদমর্যাদা এখানে অত বিনা শর্তে স্বীকৃত নয়। ভেরা যদি স্বাভাবিকের একটু বেশী খোশ মেজাজ আর ফুর্তি ভরা সুরে ওদের আশ্বাস দেয় যে, ওদের সব অসুস্থতা ভাল হয়ে যাবে—অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের কৌশল অবলম্বন করে—, ও দেখবে রোগিনীরা ওর দিকে উদ্ধত ভাবে তাকিয়ে আছে, ঈর্ষান্বিত ভাবে তেরছা চোখে দেখছে। যেন ওদের মনের কথা: "তোমার আর কিসের ভাবনা?" কিংবা 'তোমার ত' এ অসুখ হয়নি; তুমি কি বুঝবে?" অথচ মনোবিজ্ঞানের রীতি অনুযায়ী

ভেরার এই অসম্ভব ঘাবড়িয়ে যাওয়া রোগিনীদের নিজের চেহারার যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হয়। ভেরা বোঝানোর ফলে ওরা চুলের যত্ন নেয়, প্রসাধন ব্যবহার করে। অথচ ভেরা নিজে যদ যত্ন করে সাজে কিংবা প্রসাধন ব্যবহার করে, ওরা ওকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে না।

আজও ধরা-বাঁধা কাজের পরিবর্তন ঘটল না। যথাসম্ভব শালীন এবং সভ্য ভাব করে, ওয়ার্ডের সাধারণ হৈ চৈ-এ কান না দিয়ে, ভেরা একের পর এক রোগিনীকে পরীক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ একটা অত্যন্ত কর্কশ আর বেহায়া গলা অপর দিকের দেওয়াল থেকে শোনা গেল: "এখানকার রোগী-দের কথা আর বলিসনি বাপু! এক একজন ত' সকাল, দুপুর, রাত কখনই কামাই দেয় না! কোমরে বেল্ট আঁটা, ঝাঁকড়া চুলওলা ঐ লোকটার কথাই ধর না·· ও ত' কোনও রাতে জোয়াকে খাবলা-খাবলি না করে ছাড়ে না!"

"কি বললে? কি বললে তুমি?" ভেরা রোগিনীটিকে পরীক্ষা করতে করতে বলল, "কি বললে, শুনি?"

রোগিনীটি তার অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করল।

(জোয়া গত রাতে ডিউটিতে ছিল। তাহলে কি গত রাতে যখন রেকর্ড-প্লেয়ারের সবুজ আলো জ্বলছিল···)

'হ্যাঁ, যা বললে, তা গোড়া থেকে বলো, আবার ···· "

অপূর্ব উত্তম

একজন শল্য চিকিৎসক, নতুন নয় অভিজ্ঞ, কখন ঘাবড়িয়ে যান? অপারেশনের সময় নয়। অপরেশনের সময় তিনি নিষ্ঠা এবং সততা সহ নিজের কাজ করেন। তিনি যা করছেন তা তিনি জানেন। তাঁর কর্তব্য যতটুকু বাদ দেওয়া দরকার তা যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন ভাবে বাদ দেওয়া, যাতে কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যাওয়ার দরুন পরে অনুশোচনায় ভুগতে না হয়। কখনো কখনো যে অপ্রত্যাশিত জটিলতা দেখা দেয় না, এমন নয়। কখনো হয়ত অপারেশনের সময় রক্তস্রাব বেড়ে যায়। হয়ত মনে পড়ে, তুচ্ছ হার্নিয়া অপারেশন করাতে গিয়ে বেচারী রাদারফোর্ড মারা গিয়েছিলেন। দুশ্চিন্তা আরম্ভ হয় মূলতঃ অপারেশনের পর, যখন দেখা যায় কোন কারণে রোগীর জ্বর কমছে না, কিংবা পেট ফুলে রয়েছে ইত্যাদি। তখন ছুরির চেয়ে মনের সাহায্যই বেশী নিতে হয়। জটিলতার সঠিক কারণ খুঁজে বের করে তার প্রতিকার করতে হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে সার্জনকে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করতে হয়।

এই জন্য লেভ্ লিওনিডোভিচ্ প্রাত্যহিক আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার আগে অপারেশন হওয়া রোগীদের একবার দেখে যান। অপারেশনের আগের দিনের রাউন্ড হয় অনেকক্ষণ ধরে। তখনই উনি জেনে নেন অমুকের পেট কেমন আছে, কিংবা ডিওম্কা কেমন আছে। লেভ্ এখন পেটের রোগ-

ওলা রোগীটিকে দেখলেন। ওর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালর দিকে যাচ্ছে। ওকে কি পানীয় কতটুকু দিতে হবে তা নার্সকে বললেন। এবার পরের ঘরে চললেন, ডিওম্‌কাকে দেখতে। ছোট্ট ঘর, দুটির বেশী রোগী থাকতে পারে না।

অপর রোগীর অবস্থা ভালর দিকে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ডিওম্‌কা চিৎ হয়ে শুয়েছিল। বুক অব্দি কম্বল ঢেকে আর মুখে অত্যন্ত ধূসর ভাব নিয়ে। চোখ দুটো ঘরের চালে চেয়ে। দৃষ্টিতে স্বস্তি নেই। চোখের পাশের সরু'টা পেশীর ওপর অত্যন্ত চাপ পড়ছে। যেন ঘরের চালে কোন একটি অতি ক্ষুদ্র নিশানা দেখার চেষ্টা করেও পারছে না। ভীত ভাব।

লেভ্‌ ডিওমকার এক পাশে নীরবে দাঁড়ালেন। পা দুটো ঈষৎ ফাঁক করে, হাত দুটো ঝুলিয়ে। মুখভাব থমথমে। লেভ্‌ নিজের ডান হাতটা একটু পেছনে হেলালেন মনে হ'ল। যেন ডিওম্‌কার ডান চোয়ালে ঘুষি মারবেন। ডিওম্‌কা মাথা ঘোরাল। ওর মুখ হাসিতে ভরে গেল।

সার্জন লেভেরও ভয় পাওয়ানো মুখভাব বদলিয়ে হাসি ফুটল। লেভ্‌ চোখ টিপে, দুই সমান বয়সী পুরুষের আলাপের ভঙ্গীতে বললেন, "কি, সব ভাল ত' ? সব কিছু নিয়ন্ত্রণেই আছে ত' ?"

নিয়ন্ত্রণে ? অভিযোগ করার মত ডিওম্‌কার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু দুই সমান বয়সী পুরুষের আলাপে তা কি জানানো চলে ?

লেভ্‌ বললেন, "ব্যথা লাগে ?" "হ্যাঁ।"

"একই জায়গায় ?" "হ্যাঁ।"

"আরো কিছুকাল ঐরকম লাগবে, ডিওম্‌কা। আগামী বছরও তোমার ঐ রকম মনে হবে, যদিও রোগটা আর ওখানে নেই। যখনই ব্যথা লাগবে মনে করার চেষ্টা করবে, ওখানে রোগ নেই। তাতে অনেক স্বস্তি পাবে। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি এখন সেরে উঠতে চলেছ, বুঝেছ ? আর, তোমার পা চুলোয় যাক পা।" লেভ্‌ অনায়াসে কথাটা উচ্চারণ করলেন। চিকিৎসক হিসেবে ঠিকই বলেছেন, দুর্বিসহ ব্যথা হতে থাকা পা-টা চুলোয় যাক ! "বেশ, আমি পরে আবার তোমায় ভাল করে দেখব।"

ডিওম্‌কার বিষণ্ণ ভাব কামানের গোলার মুখে উড়িয়ে দিয়ে লেভ্‌ পাঁচ মিনিটের আলোচনা সভায় যোগ দিতে চললেন। (দেরী হয়ে গিয়েছে। উনি সবার শেষে পৌঁছলেন। নিজামুদ্দিন বহরামোভিচ্‌ কারো দেরীতে আসা অপছন্দ করেন) সাদা কোটটা লেভ্‌কে ভারি আঁট করে জড়িয়ে ধরেছে। কোটের বোতাম পেছন দিকে। দুপাশ মেশে না, জোর করে মেশাতে হয়। হাসপাতালে যখন আপন মনে চলাফেরা করেন তখন লেভের গতি হয় দ্রুত, এক সঙ্গে দুধাপ সিঁড়ি ওঠেন, হাত-পায়ের ভঙ্গি থাকে দৃপ্ত। ও'র সতেজ, বেগবান গতিবিধির জন্য রোগীরা জানে উনি প্রকৃত কাজ করেন, সময় নষ্ট করেন না।

পাঁচ মিনিটের আলোচনা সভা শুরু হয়ে আধ ঘণ্টা পরে ভাঙল। নিজামুদ্দিন উপযুক্ত মর্যাদা সহ, অকারণ তাড়াহুড়া বর্জন করে, সভা

পরিচালনা করেন। স্পষ্টতঃ উনি নিজের কণ্ঠস্বরে বিমোহিত। যখনই কারো দিকে ফিরে তাকান কিংবা ভাব প্রকাশার্থ কোন অঙ্গভঙ্গী করেন, তাও যেন নিজের তারিফ করার জন্য। ওঁর ধারণা ওঁকে উচ্চ পদস্থ, প্রথিতযশা, শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান দেখায়। দূর গ্রামাঞ্চলে যেখানে উনি জন্মেছিলেন সেখানকার মানুষ অবশ্যই ওঁর যশোকীর্তন করে। এ শহরেও উনি বেশ সুখ্যাত। মাঝে-মধ্যে খবরকাগজে নাম ওঠে।

টেবিল থেকে একটু পেছনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে লেভ্ বসলেন। এক পায়ের ওপর অপর পা তুলে দিয়ে, হাতের থাবা দুটো পেটের ওপর রেখে বসলেন। পাইলটের টুপির নিচে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। কিন্তু যেহেতু উনি প্রায় সব সময় ওপরওলার সামনে ভ্রূকুটি করেন, নিজামুদ্দিন তাই বুঝলেন না যে এ ভ্রূকুটির কারণ তিনি নিজে।

নিজামুদ্দিন বহরামোভিচ্ নিজের পদকে এক নিরবচ্ছিন্ন এবং ক্লান্তিকর দায়িত্ব ত' মনে করেনই না, বরং নিজেকে জাহির করার, হরেক রকম পুরস্কার আদায় করার এবং সব রকমের বিশেষ সুযোগ-সুবিধে আদায় করার এক সীমাহীন উৎস মনে করেন। ওঁর পদের নাম 'প্রবীণ ডাক্তার'। উনি বিশ্বাস করেন যে ঐ পদই তাঁকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডাক্তার প্রতিপন্ন করেছে; উনি আর সব ডাক্তারের চেয়ে বেশী জানেন (হয়ত খুঁটিনাটিগুলো জানেন না কিন্তু তাতে কি হয়েছে?); ওঁর অধস্তনরা যা কিছু চিকিৎসা করে উনি তার সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল, এবং ওঁর সুদক্ষ পরিচালনা আর ভ্রম-সংশোধনের ফলেই ওদের কাজ ত্রুটিশূন্য হতে পারে। শুধু এই কারণেই উনি অতক্ষণ সময় ব্যয় করে রোজকার পাঁচ মিনিটের আলোচনা সভার অধ্যক্ষতা করেন, এবং সে আলোচনা সবাই যে বেশ উপভোগ করে এও স্পষ্ট। বরাত গুণে বড় ডাক্তারের ক্ষমতা তাঁর কর্তব্যের চেয়ে অনেক বেশী। তার ফলে হাসপাতালে কাজের জন্য ডাক্তার, নার্স বা প্রশাসনিক কর্মী নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর খুব বেশী খুঁতখুঁতে না হলেও চলে। আঞ্চলিক স্বাস্থ্য সেবা দপ্তর থেকে টেলিফোন সুপারিশ করা, কিংবা কমিউনিস্ট পার্টির নাগরিক সমিতি অথবা যে মেডিক্যাল কলেজে উনি নিজে শীঘ্রই গবেষণাপত্র দাখিল করার আশা রাখেন তাদের সুপারিশ করা কাউকে উনি কাজে বহাল করতে পারেন। যেমন ডিনার খেয়ে গিয়ে উথলে ওঠা সৌহার্দ্যের ফলে কাউকে কথা দেওয়া থাকলে তাকে, কিংবা নিজের সুপ্রাচীন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কাউকে চাকরি দেওয়ারও অসুবিধে নেই। এর ফলে কোন বিভাগীয় প্রধান যদি কোন অকর্মা এবং অজ্ঞ, নতুন বহাল হওয়া কর্মীর নামে নালিশ করতে আসেন, নিজামুদ্দিন তখন অভিযোগকারীর চেয়ে বেশী বিস্মিত ভাব ফুটিয়ে জবাব দেন, "শিখিয়ে নিন, কমরেড। আপনারা কি করতে আছেন?"

নিজামুদ্দিনের মাথা সাদা চুলে ঢাকা। এক বিশেষ বয়সের মানুষের মাথা সাদা চুলে ঢাকা থাকলে, মানুষটি প্রতিভাবান হন বা আহম্মকই হন,

সন্ত হন বা শয়তান, কর্মচঞ্চল হন বা স্রেফ আলসে জীব হন, মানুষটি আভিজাত্যের আভা মণ্ডিত হয়ে যান। নিজামুদ্দিনের বেশ ভাব্যিযুক্ত, মিষ্টি, মনে রাখবার মত চেহারা, যা মনোবেদনায় না ভোগা মানুষের প্রতি প্রকৃতির দান। তার ওপর ওঁর গায়ের ত্বক মসৃণ, একটু রোদে পোড়া, যা পাকা চুলের সঙ্গে বিশেষ মানানসই। নিজামুদ্দিন ডাক্তার এবং নার্সদের তাদের কাজের ত্রুটিগুলির কথা বললেন এবং বললেন, মূল্যবান মানব জীবন বাঁচানোর সংগ্রাম আরো তীব্র করতে হবে। ময়ূর-নীল টেবিল-ক্লথে ঢাকা টেবিল ঘিরে খাড়া-খাড়া পিঠ হেলান দেওয়ার জায়গাওলা সরকারী চেয়ারে উপবিষ্ট কর্মীদের এভবে উপদেশ দেওয়া নিজামুদ্দিনের অভ্যাস। ঐ কর্মীদের কয়েকজনকে চাকরিতে পাকা করতে পেরেছেন, আবার এমনও কয়েকজন আছে যাদের চাকরি তখনো খতম করা হয়ে ওঠেনি।

লেভ্ লিওনিডোভিচ্ যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে কোঁকড়া চুলওলা হালমুহামেদভ্-কে ভাল করেই দেখতে পাচ্ছিলেন। ও যেন ক্যাপ্টেন কুক্-এর দুঃসাহসিক অভিযানের এক ছবি, অথাৎ জঙ্গল থেকে উঠে আসা এব আদিম মানব। ঠাসা কোঁকড়ানো চুলের নিচে তামাটে মুখ। মুখে ঘোর কালো ছিটে ছড়ানো। বন্য ফুর্তিতে হাসলে এক সারি বড় বড় সাদা দাঁত দেখা যায়। শুধু নাকে একটা আংটা পরানো থাকলেই ওকে জন্তু বলে ভাবা যেত। অবশ্য, ওর চেহারা, বা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ও যে পরিপাটি করে লেখা সার্টিফিকেট পেয়েছে তা কারো শিরঃপীড়ার হেতু নয়। শিরঃপীড়ার কারণ হ'ল, ও ভণ্ডুল না করে একটা অপারেশনও করতে পারে না। লেভ্ ওকে কয়েকটা অপারেশন করতে দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন দাবি করেছেন যে ওকে আর কখনো অপারেশন করতে দেবেন না। অথচ ওকে বরখাস্ত করার প্রশ্নই ওঠে না। বরখাস্ত করার অর্থ হবে দেশীয় মানুষকে প্রশিক্ষিত করে তোলার নীতির বিরোধিতা। ও তাই স্রেফ রোগীদের রোগের ইতিবৃত্ত, তাও সহজ রোগগুলোর, লিপিবন্ধ করে তিন-তিনটে বছর কাটিয়ে দিয়েছে। ও ডাক্তারদের রাউণ্ডে থাকে। তখন হোমড়া-চোমড়া ভাব করে। ড্রেসিং কামরাতেও কখনো সখনো যায়। রাতেও ডিউটি করে—তখন বেমালুম ঘুমোয়। ও যদিও ডিউটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ছেড়ে চলে যায়, তবু সম্প্রতি দেড়গুণ মাইনে নেওয়া শুরু করেছে।

সার্জনের সার্টিফিকেটধারী দু'জন মহিলাও সভায় ছিলেন। একজন প্যান্টিওখিনা, প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের অতি পৃথুলা। উনি কখনই উৎকণ্ঠা ছাড়া থাকেন না। ওঁর দুশ্চিন্তার কারণ দুটি স্বামীর ঔরসজাত মোট ছ'টি উঠতি বয়সের সন্তান, যাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা সময় উনি ব্যয় করতে পারেন না। এসব দুশ্চিন্তার ছায়া হাসপাতালে কাজের সময়ও, অথাৎ যার জন্য তিনি বেতন পান, ওঁর মুখে লেগে থাকে। অপর মহিলা সার্জন এ্যাঞ্জেলিকা। ও যুবতী, সবে দু'বছর হ'ল পাশ করেছে। এ্যাঞ্জেলিক বেশ

ছোট-খাটো, লাল-চুল সুন্দরী। ও লেভ্ লিওনিডোভিচ্‌কে দেখতে পারে না, কারণ লেভ্ ওর প্রতি যথেষ্ট নজর দেন না। সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে লেভের নামে কুৎসার জন্য মূলতঃ এ্যাঞ্জেলিকাই দায়ী। এই দু'জন মহিলা ডাক্তার বহির্বিভাগে রোগীদের অভ্যর্থনার বেশী কোন কাজ করেন না। এঁদের ছুরি-কাঁচি দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না। তবু নিজামুদ্দিন এঁদের বরখাস্ত করেন না। তারও কারণ আছে।

বিভাগীয় কাগজ-পত্রে এ বিভাগের সার্জনের সংখ্যা মোট পাঁচজন। অপারেশনের হিসেবও পাঁচজন সার্জন হিসেবে কষা হয়ে থাকে। অথচ অপারেশন করার যোগ্যতা আছে কেবল দু'জনের।

আলোচনা সভায় কয়েকজন নার্সও ছিল। কয়েকজন নার্স এই ডাক্তার-গুলির মত। অথচ নিজামুদ্দিন বহরামোভিচ্‌ই তাদের কাজে বহাল করেছেন, এদের রক্ষা করে চলেছেনও।

মাঝে মাঝে মনের ওপর এমন চাপ পড়ে যে লেভের মনে হয় আর একদিনও কাজ করতে পারবেন না। ভাবেন, এ হাসপাতাল ছেড়ে আর কোথাও কাজে যোগ দেবেন। কিন্তু কোথায় বা যাবেন? হয়ত দেখা যাবে, নতুন হাসপাতালের বড় ডাক্তারটি নিজামুদ্দিনের চেয়ে খারাপ; নতুন হাসপাতালেও কর্মীর চেয়ে গর্বে ফুলে ওঠা আহাম্মকদের গুঞ্জনই বেশী। নতুন হাসপাতালে নিজে বড় ডাক্তার হতে পারলে ভাল হত, সবকিছু নিপুণভাবে গুছিয়ে করা যেত। প্রকৃত কাজের লোককে রাখতেন, প্রয়োজনের চেয়ে বেশী লোক রাখতেন না। কিন্তু লেভ্ এখনই বড় ডাক্তার হওয়ার মত প্রবীণ হননি, বহু দূরে কোথাও হলে, অবশ্য আলাদা কথা। এ জায়গাটা মস্কোর কাছাকাছি, দরকার মত যাতায়াত করা চলে।

আর যাহোক লেভ্ ঠিক বড় ডাক্তারের দায়িত্ব নিতে চান না। কারণ প্রশাসকরা নিজেদের প্রকৃত পেশায় কালেভদ্রে পটু হয়ে থাকেন। জীবনের একটা পর্যায়ে উনি কয়েকজন হোমড়া-চোমড়া মানুষকে ভূ-লুণ্ঠিত হতে দেখে বুঝেছেন ক্ষমতা কত অসার বস্তু। একজন ফৌজী ডিভিশনাল কমাণ্ডারের ত' এমন অবস্থা হয়েছিল যে তিনি ফৌজের রান্নাঘরে যেকোন কাজ পেলে বর্তে যান। ওঁর শিক্ষা-গুরু, সার্জন কোরিয়াকিভ্-কে ত' লেভেরই ধ্বংস স্তূপ থেকে উদ্ধার করতে হয়েছিল।

পরিস্থিতির কোন পরিবর্তনের ফলে মেজাজ যখন ভাল থাকে লেভ্ ভাবেন, কোন মতে সব সয়ে এই হাসপাতালেই রয়ে যাবেন। ওঁর ভীতি তখন বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। ওঁর ভয় হয়, এরা হয়ত ডাঃ ডণ্ট্‌সোভা, ডাঃ গ্যাঙ্গার্ট আর ওঁকে তাড়িয়ে দেবে। পরিস্থিতি যেন সেই রকমই হয়ে আসছে, প্রতি বছরই নতুন নতুন জট পাকাচ্ছে। কর্ম জীবনে নতুন ভাঙনের ধকল সহ্য করা এখন আর ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বয়স প্রায় চল্লিশ হ'ল। দেহ এখন একটু আরাম আর একটু নিরাপত্তা খোঁজে।

ওঁর নিজের জীবনই এখন এক গোলক-ধাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বীরের মত সবেগে সম্মুখে ধাবমান হবেন না নীরবে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবেন, বুঝে উঠতে পারেন না। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো যে এখনই সবে শুরু হয়েছে এমন নয়। ওঁর কম জীবন গোড়া থেকেই সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল। এক বছর ত' খুব অল্প দূর দিয়ে স্ট্যালিন পুরস্কার ফস্‌কিয়ে গিয়েছে। তার পর উনি যে সংস্থায় কাজ করতেন সেটা হঠাৎ বুদবুদের মত মিলিয়ে গেল। ওঁর গবেষণা ক্ষেত্র কয়েকটা দিকে অহেতুক প্রসারিত হয়েছিল, ফলে অত্যন্ত তাড়া-হুড়া করে কাজ সারতে হয়েছে। ঐভাবে পুরস্কার ফস্‌কিয়ে গিয়ে মানসিক দিক থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত লেভ্‌ আর কখনই গবেষণা পত্র দাখিল করেননি। শিক্ষা-গুরু কোরিয়াকভের পরামর্শ তার জন্য অংশতঃ দায়ী: "শুধু কাজ করে যাও। লেখবার সময় পরে অনেক পাবে।" কিন্তু করে সময় পাওয়া যাবে? তাছাড়া অতসব লিখেই বা কি হবে?

লেভের মুখে এবার যে ভ্রূকুটি ফুটল তা বড় ডাক্তারের অভিমতের বিরুদ্ধ-তার জন্য নয়। নিজামুদ্দিন যখন বললেন আগামী মাসে হাসপাতালে প্রথম বুক অপারেশন করা হবে এবং লেভ্‌ লিওনিডোভিচ্‌ই তা করবেন, সেকথা শুনতে গিয়ে লেভের ভুরু কুঁচকিয়ে উঠেছিল মাত্র।

সবকিছুই শেষ হয়। পাঁচ মিনিটের আলোচনা সভাও শেষ হ'ল। সার্জনরা কামরা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে সিঁড়ির বাঁকে জমায়েত হলেন। থাবা দুটো এখনো পেটের সামনে সরু বেল্টে গুঁজে লেভ্‌ আনমনা, গোমড়া-মুখো কর্নেলের মত নিজের সৈন্য দলকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দলে আছেন পাকা-চুল আর সরল মুখভাব ইউজেনিয়া উস্টিনোভা, কোঁকড়া-চুল হালমুহামেদভ্‌, স্থুলাঙ্গী প্যাণ্টিওখিনা, লাল-চুল সুন্দরী এ্যাঞ্জেলিকা, আর দু'জন নার্স। ওঁরা এবার রাউণ্ড দেবেন।

কতকগুলো রাউণ্ড এমন যেন বিমানে রোগীদের দেখতে আসা। সব ডাক্তার কোন মতে কাজ সেরে পালাতে পারলে বাঁচেন। আজও ডাক্তারদের তড়িঘড়ি কাজ সারার ইচ্ছে আছে। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময় সূচী অনুযায়ী ওঁদের ধীরে ধীরে রাউণ্ড দেওয়ার কথা, যাতে প্রতিটি অপারেশন-রোগীকে পৃথক ভাবে দেখা হয়। নিমরাজী বাতাস চলাচল ব্যবস্থা, রোগীদের গায়ের গন্ধ আর ডাক্তারি গন্ধে মেশা দম বন্ধ করে দেওয়া পরিবেশে বিভক্ত হয়ে সাত-জন চিকিৎসকই ওয়ার্ডে রাউণ্ড দিতে ঢুকলেন। রোগীদের বেডের মাঝে সরু পথে একে অপরকে জায়গা করে দিয়ে তাঁরা পরস্পরের কাঁধের ওপর উঁকি দিয়ে রোগীদের দেখতে থাকলেন। যেমন তাঁরা ইতিমধ্যে ওয়ার্ডের গন্ধে ভারী বাতাস অনুভব করেছেন তেমনি প্রতিটি বেডের পাশে ছোট ছোট বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ধরে এক একটি রোগী দেখার কথা। রোগী দেখার অন্তর্গত রোগের ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান পরিস্থিতি জেনে রোগীর অবস্থার উন্নতি না অবনতি হয়েছে বোঝা, তার দৈহিক এবং মানসিক

বেদনার খোঁজ-খবর নেওয়া এবং প্রয়োজনে প্রতিবিধান করা। অর্থাৎ তাত্ত্বিক এবং বাস্তবিক দিক থেকে যা কিছু করা সম্ভব তার সবই।

রোগীর সংখ্যা যদি আরো কম হত, অর্থাৎ প্রতি চিকিৎসকের যদি এখনকার মত তিরিশটা রোগী দেখতে না হত, যদি সবকটি চিকিৎসক কেবল মাত্র মাইনে নেওয়ার বেলায় ডাক্তার না হয়ে প্রত্যেকে এক একজন বিশেষজ্ঞ হতেন, যদি রোগীদের রোগের ইতিবৃত্ত লিখতে গিয়ে চিকিৎসকদের সবচেয়ে বেশী চাতুরি অবলম্বন করতে না হত (যাতে রাষ্ট্রীয় অভিসংশক ভবিষ্যতে ঐ দলিলটির সাহায্যে খোদ ডাক্তারকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে না পারেন), চিকিৎসকরা যদি নিজেদের রক্ত-মাংস এবং স্মৃতি আর ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়ানো মানুষ না হতেন, এবং যদি তাঁরা এই ভেবে অত গভীর স্বস্তি না পেতেন যে যারা রোগে কষ্ট পায় তারা ডাক্তার নয় রোগী, তাহলে ডাক্তারদের রাউণ্ড সম্ভবতঃ চিকিৎসা সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান গণ্য হতে পারত।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি যা লেভ্ লিওনিডোভিচ্ তা ভালই জানেন। অথচ রাউণ্ডগুলো না যাবে বাতিল করা, না তার বিকল্প ব্যবস্থা করা। উনি অভ্যাস মত দলকে নেতৃত্ব দিয়ে ওয়ার্ডগুলোয় রাউণ্ড দিতে নিয়ে চললেন। লেভ্ এক চোখ অপরটির চেয়ে বেশী কুঁচকিয়ে শুনতে লাগলেন। চিকিৎসকরা ফাইল থেকে প্রত্যেক রোগী সম্পর্কে তথ্য জানিয়ে চললেন: রোগীটি কোথা থেকে এসেছে, কবে ভর্তি হয়েছে (পুরনো রোগীরা কবে ভর্তি হয়েছে তা ওঁর জানা আছে), ভর্তির কারণ, কি ধরনের এবং কি মাত্রায় চিকিৎসা করা হয়েছে, রক্তের কোষ গণনা, ইতিমধ্যে অপারেশন করা হয়েছে কিনা, অপারেশন না করার হলে কেন অপারেশন করা হবে না, অপারেশনের প্রশ্নে এখনো যদি সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকে কেন সিদ্ধান্ত হয়নি ইত্যাদি। লেভ্ কয়েকটি রোগীর বেডে বসে তাদের কথা শুনলেন। কয়েকজনকে ক্ষতস্থান দেখাতে বললেন। কয়েকজনের ক্ষত পরীক্ষা করলেন, অনুভব করলেন, অন্য ডাক্তারদেরও অনুভব করতে বললেন, শেষে হয়ত নিজেই রোগীর ক্ষত কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন।

সত্যিই জটিল রোগের চিকিৎসা এ ধরণের রাউণ্ডে হয়ে ওঠে না। তার জন্য রোগীকে ডেকে পাঠাতে হয়, পৃথকভাবে পরীক্ষা করতে হয়। রাউণ্ডে ডাক্তারদের মধ্যে খুব খোলাখুলি কথা চলে না, রূঢ় সত্যের আলোচনা এড়িয়ে যেতে হয়। কোন রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটেছে, একথা ও বলা চলে না। বড়জোর বলা চলে, "প্রক্রিয়াটা আরেকটু বেশী জটিল মনে হচ্ছে।" কোমল, পরোক্ষ পরিভাষা প্রয়োগ না করে কোন কিছুই আলোচনা করা যায় না। কখনো কখনো বিকল্পের বিকল্প পরিভাষা, এমনকি সত্যের বিপরীত কিছু বলতে হয়। 'ক্যানসার', 'সারকোমা' বা 'কারসিনোমা' পরিভাষাগুলো ত' কখনই উচ্চারণ করা চলে না, এমন কি 'এস-আর' বা 'সি-আর' ও উচ্চারণ করা না, কারণ রোগীরা অনুমান করে ফেলতে পারে। তার বদলে 'আলসার', 'গ্যাসট্রাইটিস,' 'ইনফ্ল্যামেশন' বা 'পলিপস্'-এর মত নির্দোষ পরিভাষা ব্যবহার করতে হয়।

এই পরিভাষাগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য কেবল রাউণ্ডের পর চিকিৎসকরা আলোচনা করতে পারেন। পরস্পরের বক্তব্য আরো সহজে বোঝার সুবিধার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের এই অভিব্যক্তিগুলি প্রয়োগের অনুমতি আছে: 'মেডিয়াস্টিনাম-এর ছায়া আরো প্রসারিত হয়েছে,' 'রোগের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ঈষৎ মর্যাদাহীন', 'অশুভ পরিণতির সম্ভাবনা এড়ানো যাবে না' (অর্থাৎ রোগী অপারেশন টেবিলেই মারা যেতে পারে)। যখন এই কথাগুলিতেও মনোভাব পুরোপুরি বোঝানো সম্ভব হয় না লেভ্ তখন বলেন, "এই রোগীর ইতিবৃত্তটা এক পাশে সরিয়ে রেখে দাও।" তারপর ডাক্তারের দল এগিয়ে চলে।

রোগীর অবস্থা বোঝা বা ডাক্তারদের পারস্পরিক বোঝা-বুঝির ব্যাপারে রাউণ্ডের সময় অল্পই মতৈক্য হয়, কিন্তু মতৈক্য যত কম ঘটে লেভ্ লিওনিডোভিচ্ রোগীর মনোবল বৃদ্ধির উপর তত বেশী জোর দেন। যেন রোগীর মনোবল বৃদ্ধিই রাউণ্ডগুলোর মূল লক্ষ্য।

কোন ডাক্তার এক রোগিনী সম্পর্কে মন্তব্য করলেন 'স্টেটাস আইডেম' (পরিস্থিতি অপরিবর্তিত), লেভ্ কথাটি লুফে নিয়েই বললেন, "তাই নাকি?" তারপরই উনি রোগিনীকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি একটু ভাল বোধ করছেন, তাই নয়?"

"হ্যাঁ, তা হতে পারে", ঈষৎ বিস্মিত রোগিনী লেভের সঙ্গে একমত হন। উনি নিজে না বুঝলেও, যেহেতু ডাক্তাররা লক্ষ্য করেছে যে উনি ভাল আছেন, সুতরাং তাদের মত মেনে নেওয়াই শ্রেয়ঃ।

"এই ত,' বেশ আপনি ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠছেন।"

এমন রোগীও থাকে যে বেশ ভয় পেয়েছে। কোন রোগিনী বলল, "আমার শিরদাঁড়ায় কেন ব্যথা হয় বলতে পারেন? শিরদাঁড়াতেও টিউমার হয়েছে নাকি?"

"আরে, না-না," লেভ্ হেসে জবাব দিলেন "ওটা আপনার রোগের আনুষঙ্গিক বিকাশ মাত্র।" (এটা মিথ্যে কথা নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গরূপী টিউমার বাস্তবে রোগের আনুষঙ্গিক বিকাশ মাত্র)

লেভ্ এক বৃদ্ধ রোগীর বেডে এসে দাঁড়ালেন। শবের মত ধূসর হয়ে যাওয়া বৃদ্ধের চোখ-মুখে এক ভয়াল তীক্ষ্ণতা। বেচারার ঠোঁট নাড়ারও ক্ষমতা নেই। এক ডাক্তার জানাল, "রোগীকে সাধারণ টনিক আর ঘুম পাড়ানো ওষুধ দেওয়া হচ্ছে।" অর্থাৎ, শেষ। রোগীটি চিকিৎসার অতীত, এবং এর ক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য কষ্ট লাঘব করা।

লেভের ভারী ভুরু জোড়া কুঁচকিয়ে উঠল। বৃদ্ধকে যতটুকু প্রবোধ দেওয়া সম্ভব তা দিতে হবেঃ "দাদু, ক'টা কথা আপনাকে খোলাখুলি বলছি। আপনার এখন যা কিছু কষ্ট হচ্ছে এ সবই আগেকার চিকিৎসার প্রতিক্রিয়া

মাত্র। এ নিয়ে ভেবে উতলা হবেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আমরা আপনাকে সারিয়ে তুলবই তুলব। হয়ত ভাবছেন, আপনার জন্য কিছুই করছি না। তা ঠিক নয়। আমরা আপনার আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মজবুত করে তুলছি।"

শেষ হয়ে আসা রোগী মাথা হেলায়। লেভের এ ধরনের খোলাখুলি কথায় বৃদ্ধ কিছুটা আশান্বিত।

একটা এক্স-রে ছবি তুলে ধরে একজন ডাক্তার বললেন, "এতে রোগিনীর ইলিয়াক্ অঞ্চলে এক ধরনের টিউমার গড়ে উঠছে, দেখা যাচ্ছে।" স্বচ্ছ, কালো রঙের ফটোটা আলোর সামনে তুলে ধরে লেভ্ উৎসাহ ব্যঞ্জক মাথা হেলিয়ে মন্তব্য করলেন, "বাঃ চমৎকার ফটো! খুব ভাল!

লেভ্ যখন 'খুব ভাল' মন্তব্য করেছেন তখন রোগিনীর আহ্লাদিত হওয়ারই কথা। ফটোটা 'খুব ভাল' শুধু এই কারণে যে আরেকটা তোলার প্রয়োজন নেই। ঐ ফটোতেই টিউমারের আকৃতি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

নব্বুই মিনিটের সাধারণ রাউণ্ডে প্রবীণ সার্জন লেভ্ ভুলেও নিজের প্রকৃত ধারণা ব্যক্ত করেন না। কণ্ঠস্বরেও মনোভাব প্রকাশ পায় না। অথচ অধস্তন ডাক্তারদের ঐ সময়ই রোগীদের ইতিবৃত্ত, কার্ড ইত্যাদিতে সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হয়। রাউণ্ডের মধ্যে লেভ্ একবারও অর্থপূর্ণ ভাবে মাথা ঘোরান না, শঙ্কিত ভাব সযত্নে চেপে রাখেন। প্রসন্ন ভাব মুখে বিরাজ করে, যাতে রোগীরা বোঝে তাদের রোগ কত সরল। ওদের একজনের রোগও তেমন গুরুতর কিছু নয়।

দেড় ঘণ্টা ধরে বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ আর অভিনয় একজনকে ক্লান্ত করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। রাউণ্ড সেরে লেভ্ হাত ছড়ালেন। ভ্রূকুটিতে কপাল কুঁচকিয়ে উঠল।

এক বৃদ্ধা অভিযোগ করল, কিছু দিন যাবৎ তার বুক থেকে জলীয় পদার্থ বের করে দেওয়া হচ্ছে না। লেভ্ বের করে দিলেন।

এক বৃদ্ধ বলল, "শুনুন, আমার কিছু কথা আছে।' বৃদ্ধ নিজের ব্যথার উদ্ভব এবং বৃদ্ধি সম্পর্ক ব্যাখ্যা সহ এক অগোছাল গল্প ফাঁদল। লেভ্ থেকে থেকে মাথা হেলাতে লাগলেন। "এ ব্যাপারে আপনিও কিছু বলবেন ত', বলবেন না?" বৃদ্ধ লেভের মতামত জানতে চাইল।

লেভ্ হাসলেন, "আমার আর কি বলার আছে? আপনি যা চান, আমরাও ঠিক তাই করতে চাই। আপনাকে সারিয়ে তুলব। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, তাহলেই হবে।"

লেভ্ উজ্‌বেক ভাষার অল্প ক'টা কথা জানেন। দু'একজন উজবেক রোগীর সঙ্গে তাদের ভাষায় সামান্য কিছু বললেন। অতিশয় মার্জিত, চশমা পরা এক রোগিনী ছিল। হাসপাতালের ড্রেসিং গাউন পরে বেড়ে শায়িতা মহিলাকে দেখে লেভ্ বিব্রত বোধ করলেন। স্থির করলেন, ঐ মহিলাকে

সকলের সামনে পরীক্ষা করবেন না। একটি ছোট্ট ছেলের কাছে তার মাও থাকে। লেভ্ ছেলেটির হাতে হাত রাখলেন। তারপর সাত বছর বয়সের একটি ছেলের পেটে টোকা মেরে, দু'জনেই হেসে উঠলেন।

একটি মাত্র রোগিনীর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে হ'ল। রোগিনী এক শিক্ষিকা। তিনি এক স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষার জন্য জেদাজেদি করছিলেন।

রাউণ্ড হয়ে গেল। লেভ্ ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলেন। অত্যন্ত শ্রান্ত, যেন একটা অপারেশন সেরে বেরোলেন। "পাঁচ মিনিটের বিরতি। ধূমপানের জন্য," লেভ্ ঘোষণা করলেন।

লেভ্ আর ইউজেনিয়া উস্টিনোভা ধোঁয়ার দুটো বড় কুণ্ডলী ছড়ালেন। যেন ঐভাবে রাউণ্ডের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘোষিত হ'ল। অথচ ওঁরাই রোগীদের ধূমপান করতে নিষেধ করেন, কারণ ধূমপান ক্যানসার ঘটাতে পারে।

চিকিৎসকরা অতঃপর একটা ছোট ঘরে একটা ছোট্ট টেবিল ঘিরে বসলেন। রোগীদের সম্পর্কে রাউণ্ডের পরবর্তী আলোচনা আরম্ভ হ'ল। রাউণ্ডের সময় রোগীদের অবস্থা সম্পর্কে চিকিৎসকের মন্তব্যে যদি কেউ উৎসাহিত হয়ে থাকেন এ আলোচনা শুনলে তাঁর উৎসাহ উবে যেতে বাধ্য। যে রোগীটি সম্পর্কে 'স্টেটাস আইডেম' বলা হয়েছিল, তাকে অপারেশন করা সম্ভব নয়। রোগের লক্ষণ অনুযায়ী রশ্মি-চিকিৎসার সাহায্যে তার ব্যথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলেছে, কিন্তু আরোগ্যের আশা নেই। লেভ্ যে ছোট ছেলেটির হাতে হাত রেখেছিলেন সেও দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। ওর রোগ দূর বিক্ষিপ্ত টিউমার। শুধু ওর মা-বাপের পীড়াপীড়িতেই ছেলেটিকে কিছু বেশী দিন হাসপাতালে রাখতে হয়েছে। এবার সেই বৃদ্ধার কথা যিনি বুকে জলীয় পদার্থ জমে থাকার অভিযোগ করেছিলেন। লেভ্ বললেন, "রোগিনীর বয়স আটষট্টি বছর। রশ্মি-চিকিৎসা করলে দু'বছর টিকতে পারেন। অপারেশন করলে এক বছরও বাঁচবেন না। আপনি কি বলেন, ইউজেনিয়া?"

ছুরির অত বড় পৃষ্ঠপোষক লেভ্ লিওনিডোভিচ্ যেখানে ছুরি ভরসা পাচ্ছেন না ইউজেনিয়া'র ত' দ্বিমত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

লেভ্ বাস্তবে ছুরির পৃষ্ঠপোষক নন, বরং উনি এক সংশয়গ্রস্ত মানুষ। উনি জানেন যে দেহাভ্যন্তরের প্রকৃত পরিস্থিতি জানার জন্য চর্মচক্ষুর চেয়ে ভাল যন্ত্র হয় না, এবং ছুরিতেও যে রোগের গভীর মূলোচ্ছেদ সম্ভব হয় না সেখানে আর সব যন্ত্র অচল।

একটি রোগী ছিল যে অপারেশন করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এড়ানোর উদ্দেশ্যে, তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। লেভ্ বললেন, "ওর পরিবার বহু দূরে বনাঞ্চলে বাস করে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে করতে লোকটা মারা যাবে। ওকে বুঝিয়ে অপারেশনে রাজী করতেই হবে। আগামীকাল নয়, পরের রাউণ্ডেই রাজী করাতে হবে। ওর ক্ষেত্রে অপারেশন করা মানে, অবশ্যই এক

ঝ‍ুঁকি নেওয়া। কিন্তু অপারেশন না করে উপায় নেই। হয়ত তাতেও সারাতে পারব না। কিছু না করেই আবার সেলাই করে দিতে হবে।"

"কিন্তু, ও যদি অপারেশন টেবিলেই মারা যায়?" হালমুহামেদভ্ ভারিক্কি চালে বলল। অপারেশনের ঝুঁকি যেন ওই নিজে নিচ্ছে।

মাঝখানে মোটা হয়ে যাওয়া লেভের ভুরু দুটো প্রসারিত হ'ল। "যদি যদিই রয়ে যাবে, কিন্তু আমরা যদি ওকে অপারেশন না করি ও তবে মরবেই।" লেভ্ একটু ভেবে নিয়ে যোগ করলেন, "এ হাসপাতালের মৃত্যুর হার এখনো ভালই আছে। ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে।"

প্রত্যেক আলোচনার পর তাঁর অভ্যাস মত লেভ্ প্রশ্ন করলেন, "কেউ মতানৈক্য প্রকাশ করবেন?"

লেভ্, অবশ্য, কেবল ইউজেনিয়া উস্টিনোভার মতামতে আগ্রহী। দু'জনের বয়স, অভিজ্ঞতা এবং চিকিৎসা সম্পর্কে পদক্ষেপে যথেষ্ট প্রভেদ। তবু দু'জনের অভিমত প্রায়ই মিলত, যা থেকে বোঝা যেত যে বিচক্ষণ মানুষের পক্ষে পরস্পরকে বোঝা যথেষ্ট সহজ।

"খড়-রঙের চুলওলা মেয়েটার কি হবে?" লেভ জানতে চাইলেন, "ওর অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কি একান্ত আবশ্যক? আপনি কি বলেন, ইউজেনিয়া?"

"অত্যাবশ্যক," ইউজেনিয়া নিজের গাঢ় রঙ-রঞ্জিত, বাঁকা ঠোঁট ভেতর দিকে টেনে নিয়ে বললেন, "তার পর ওকে এক ডোজ রশ্মি-চিকিৎসাও দিতে হবে।"

"ঐ কাজ করতেও বিশ্রী লাগে," লেভ্ হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হাসি পাওয়ানোর মত মাথার ছোট্ট টুপিটা সামনে নেমে এসেছে। নিজের দু'হাতের নখে দৃষ্টি পড়ল। এক তর্জনীর ওপর রাখা বিশাল এক বুড়ো আঙুলের দিকে চেয়ে বললেন, "অত অল্প বয়সী কারো অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করতে হলে মন প্রায় বিদ্রোহ করে ওঠে……মনে হয় প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করছি।"

এবার লেভ্ তর্জনী দিয়ে বুড়ো আঙুলটাকে জড়ালেন। কিছুতেই যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। মাথা তুলে, বললেন, "আপনারা শুলুবিনের রোগটা বুঝেছেন ত'?"

"সি-আর রেক্টি?" (মলদ্বারের ক্যানসার) প্যাস্টিওখিনা বললেন।

"হ্যাঁ, সি-আর রেক্টি। কিন্তু ওর রোগ সম্পর্কে কি জানা গিয়েছে জানেন? শুনলে বুঝবেন, আমাদের ক্যানসার সম্পর্কে প্রচার অভিযান এবং ক্যানসার কেন্দ্রগুলো কত উপকারী হয়েছে! ওর্শচেঙ্কভ্ এক আলোচনা সভায় মন্তব্য করেছিলেন, যে ডাক্তার রোগীর মলদ্বারে আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে ঘেন্না পায় সে ডাক্তারই নয়। মন্তব্যটা সঠিক। আমরা, ডাক্তাররা যে রোগীদের কত অবহেলা করি তা জানলে হতবাক হতে হয়। শুলুবিন এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতাল ঘুরে বেড়িয়েছে'; ওর রোগ—বারবার পায়খানা পেত, মলদ্বার থেকে রক্ত বেরোত, শেষে ব্যথাও হ'ত। ওর সব রকম চিকিৎসা হলেও সহজতম পরীক্ষা, মলদ্বারে আঙুলের সাহায্যে

পরীক্ষা করা হয়নি। হাসপাতালে ওয় আমাশা আর অর্শের চিকিৎসা হয়েছিল। তাতে কাজ হয়নি। তারপর ও একদিন এক হাসপাতালের দেওয়ালে সাঁটা ক্যানসার সম্পর্কে প্রচার বিজ্ঞাপন দেখল। ও শিক্ষিত মানুষ। পড়ে বুঝল। নিজেই আঙুল দিয়ে টিউমারের উপস্থিতি টের পেল। অথচ ডাক্তাররা ছ'মাসেও টের পাননি।"

"টিউমারটা কি বড় আকারের?"

"প্রায় সাত সেণ্টিমিটার, স্ফিংকটার-এর ঠিক পেছনে। আরো আগে ধরা পড়লে, আমরা ওর মলদ্বারের পেশীগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতাম। তাহলে ও স্বাভাবিক মানুষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু এখন স্ফিংকটারেও রোগ ধরেছে বলে ওর মলনালী কেটে বাদ দিতে হবে। তার মানে মলাশয় এক পাশে সরিয়ে দিতে হবে, যার ফলে বেচারী মলত্যাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে। সেটা কোন্ ধরণের বেঁচে থাকা হবে? মানুষটা অত ভাল ..."

আগামীকাল যে অপারেশনগুলো হবে চিকিৎসকরা তার তালিকা প্রস্তুত করতে লাগলেন। যে রোগীদের অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে অর্থাৎ স্নান করানো, পরিস্কার করানো ইত্যাদি, তালিকায় সেগুলি চিহ্নিত হ'ল।

"চ্যালির অপারেশনের আগে কোন রকম প্রস্তুতি প্রয়োজন নেই," লেভ বললেন, "ওর পাকস্থলীর ক্যানসার হয়েছে। কিন্তু মানুষটা এত ফুর্তিবাজ, ওর মত কারো কথা শোনাও যায় না।" (লেভ্ যদি জানতেন, চ্যালি আগামীকাল সকালে এক বোতল মদ দিয়ে নিজের চিকিৎসা করতে চাইছে।)

কোন্ চিকিৎসক কাকে সাহায্য করবেন, আর কে রোগীর রক্তের কোষ গণনার ভার নেবেন তাও ঠিক হয়ে গেল। যা অনিবার্য তাই হ'ল—লেভ্ লিওনিডোভিচ্‌কে সাহায্য করবে এ্যাঞ্জেলিকা। মানে লেভ্ যখন অপারেশন করবেন, আর অপারেশন থিয়েটার নার্স এদিক-ওদিক চলাফেরা করতে থাকবে, টেবিলের বিপরীত দিকে দাঁড়ানো এ্যাঞ্জেলিকা কাজে মন না দিয়ে আড় চোখে লক্ষ্য করতে থাকবে, লেভ্ নার্সের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেন কিনা।

এ্যাঞ্জেলিকা একটু ছিটগ্রস্ত। ওকে কষে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই বোঝা যায়। এমনই বাতিকগ্রস্ত যে রেশমী সুতোটা ঠিক মত নির্বীজন করেছে কিনা কে জানে। অথচ গোটা অপারেশনটাই ঐ রেশমী সুতোর ওপর নির্ভরশীল······ চুলোয় যাক এই মেয়েগুলো! ওরা পুরুষদের এই মামুলি নীতিটাই জানে না: কাজ আর কাম চর্চা এক সঙ্গে চলে না।

মেয়েটার মা-বাপ ওর এ্যাঞ্জেলিকা নাম রেখে ভুল করেছে। কিন্তু তারাই বা কি করে জানবে, মেয়েটা বড় হয়ে এত বড় এক ডাইনী হবে। ওর অতি চালাক কিন্তু সুন্দর মুখের দিকে আড় চোখে চেয়ে লেভের বলতে ইচ্ছে হ'ল, "শোনো এ্যাঞ্জেলিকা—কিংবা এ্যাঞ্জেলা, তোমার যে নাম ভাল লাগে সেই নামেই ডাকব—, তোমার যে বিদ্যে-বুদ্ধি আর ক্ষমতা একেবারে নেই তা নয়, তুমিও তা জানো। ছেলে ধরার ফন্দির চেয়ে বরং শল্য চিকিৎসায় যদি মন

দিতে তবে এত দিনে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে পারতে। শোনো, অকারণ কথা কাটাকাটি করে কোন লাভ নেই। আর যাহোক আমাদের দু'জনকে একই অপারেশন টেবিল কাজ করতে হবে......"

কিন্তু এ্যাঞ্জেলিকাকে বাস্তবে এসব বলার অর্থ হবে রণক্লান্ত লেভ্ আত্ম-সমর্পণ করতে চান।

লেভের মনে হ'ল গতকালের বিচারের কথা সহকর্মীদের সবিস্তারে শোনালে মন্দ হয় না। ধূমপান করার সময় ইউজেনিয়া উস্টিনোভাকে বলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু অন্য সহকর্মীদের ওকথা শুনিয়ে কাজ নেই।

আলোচনা সভা শেষ হতেই লেভ্ উঠে দাঁড়ালেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দা দিয়ে রশ্মি-চিকিৎসা বিভাগে চললেন। লম্বা বাহু দুটো দুলতে লাগল। সাদা কোট ঢাকা দেহটা বাতাস চিরে এগোতে থাকল। ওঁর ভেরা গ্যাঙ্গার্টের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে করছিল। নিকট-বিকিরণ রশ্মি কেন্দ্রে ভেরাকে পাওয়া গেল। ভেরা ডন্ট্সোভার সঙ্গে একটা টেবিলে বসে কিছু লেখালেখি করছিল। "আপনাদের টিফিনের সময় হয়েছে," লেভ্ বললেন, "আমাকে একটা চেয়ার দিন।"

লেভ্ নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। হাল্কা, খোস-মেজাজে গল্প করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কোন কিছু লক্ষ্য করে ডন্ট্সোভাকে বলে বসলেন, "আপনি আমাকে দেখে তেমন খুশি হননি, কি বলেন?"

ডন্ট্সোভা মৃদু হাসলেন। চশমাটা হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, "ঠিক তার উল্টো। আমি সব সময় আপনাকে খুশি রাখতে চাই। হ্যাঁ, আপনি কি আমাকে অপারেশন করবেন?"

আপনাকে অপারেশন করব? কিছুতেই করব না।"

"কেন করবেন না, লেভ্?"

"কারণ আমি অপারেশন করায় আপনি যদি মারা যান তবে সবাই বলবে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে খুন করেছি, যেহেতু আপনার বিভাগ আমার বিভাগের চেয়ে অনেক বেশী সফল।"

"তামাশা করবেন না, লেভ্। আমি গুরুত্বসহই প্রশ্নটা তুলেছিলাম।"

কথাটা ঠিক। ডাঃ ডন্ট্সোভা কখনো ঠাট্টা-তামাশা করতে পারেন, এ যে কল্পনার অতীত। মনমরা ভেরার কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে। যেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছে। ভেরা বলল, "ডাঃ ডন্ট্সোভাকে কয়েক দিনের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে। বেশ কিছু কাল যাবৎ ওঁর পেটে ব্যথা হচ্ছে। কিন্তু উনি কাউকে কিছু বলেননি। ক্যানসার বিশেষজ্ঞ বটে, ডাঃ ডন্ট্সোভা... "

"আর তোমরা ইতিমধ্যে যে লক্ষণ পেয়েছ তাতে প্রমাণ করা যায় যে ক্যানসারই হয়েছে, তাই ত'?" লেভের অসম্ভব বড় বড় ভুরু দুটো টানটান হয়ে গেল। উনি কথা বললেই মুখে ঠাট্টা-বিদ্রূপের অভিব্যক্তি ফোটে। ফলে উনি সত্যি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছেন কিনা তা বোঝা যায় না।

"না, এখনো সব লক্ষণ পাওয়া যায়নি," ডস্ট্সোভা জানালেন।

"কি কি লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে, শুনি ?"

ডস্ট্সোভা লক্ষণগুলি জানালেন। "ঐটুকু যথেষ্ট নয়," লেভ্ ঘোষণা করলেন, "রোগ নির্ণয়ের কাগজ ভেরা সই করে দিক। তারপর এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। এরা অল্প কিছু দিনের মধ্যে আমার কাজের জন্য আলাদা একটা ঘর দিচ্ছে। আমি তখন ভেরাকে আমার অধীনস্থ রোগ-নির্ণয়কারী হিসেবে পেতে চাই। আপনি ভেরাকে ছেড়ে দেবেন ত ?"

"আমি ভেরাকে ছাড়ব না। আপনি আর কাউকে নিন।"

"আমি আর কাউকে চাই না। ভেরাকে চাই। আপনি ভেরাকে না না ছাড়লে আমি আপনাকে অপারেশন করব কেন ?"

সিগারেটে শেষ টান দিতে দিতে খোস-মেজাজে গল্প করলেও লেভের মতা-মতের মধ্যে কোন রকম চটুলতা ছিল না। ও'র প্রাক্তন শিক্ষাগুরু বলতেন, যৌবনে অভিজ্ঞতা থাকে না, তেমনি বয়স বাড়লে শক্তি থাকে না। বর্তমানে ভেরার ও'র মতই অভিজ্ঞতার ফসল সবে পেকেছে, শক্তি রূপী চারা এখনো মজবুত আছে। অল্প বয়সী শিক্ষার্থিনী ভেরা ও'র চোখের সামনে এত দক্ষ রোগ নির্ণয়কারীতে পরিণত হয়েছে যে তাকে ডস্ট্সোভার সমান বিশ্বাস করা চলে। ওর মত রোগ নির্ণয়কারীকে পেলে যেকোন সার্জন, তা সে যত খুঁত-খুঁতেই হোক না কেন, কাজ নিয়ে একটুও দুশ্চিন্তায় পড়বে না। সমস্যা হ'ল জীবনের এই শিখর বিন্দুটা মেয়েদের ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে স্বল্পস্থায়ী হয়।

"তুমি তোমার টিফিন নিয়ে এসেছ ত' ?" লেভ্ ভেরাকে বললেন, "তুমি ত' না খেয়ে বাড়ী ফেরৎ নিয়ে যাবে, কি বলো ? তার চেয়ে দাও, আমি খাই।"

হাসি-ঠাট্টার মধ্যে কয়েকটা চীজ্-স্যাণ্ডউইচ বেরোল। লেভ্ একটা খেতে খেতে ওদের দু'জনকে সাধাসাধি করলেন। "তুমি একটা খাও · · জানো, ভেরা, গতকাল বিচারে গেছিলাম। তুমিও গেলে পারতে। অনেক কিছু শেখার আছে। একটা স্কুল বাড়ীতে বিচার বসল। প্রায় শ'চারেক লোক ছিল। সবাই মজা দেখতে এসেছে। মামলাটা হ'ল পেটের নাড়ী জট পাকিয়ে যাওয়ার জন্য একটি শিশুর পেট অপারেশন করা হয়েছিল। অপারেশনের পরে সে বেশ ক'দিন ভালই ছিল। এমন কি বাইরে বেড়াতে যেত, খেলতও, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তারপর শিশুটি হঠাৎ মারা গেল। ফলে হতভাগ্য সার্জনের আট মাস ধরে তদন্ত সহ্য করতে হ'ল। এই আট মাসে সে আদৌ কি করে অপারেশন করতে পেরেছে তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। বিচারে উপস্থিত ছিলেন নগর স্বাস্থ্য দপ্তরের এক প্রতিনিধি, নগরের প্রধান সার্জন আর মেডিক্যাল কলেজ থেকে এক অভিসংশক। অভিসংশক ত' এক নাগাড়ে অভিযুক্ত সার্জনটির অপরাধ গণ্য হওয়ার যোগ্য অবহেলার কথা বলে চললেন। মৃত ছেলেটির বাপ-মাকে সাক্ষী হিসেবে আনা হয়েছিল। ওরা সাক্ষী হিসেবে চমৎকার। ওরা ছেলের পেটের ভেতরে কোন গজ্ বা কিছুর কথা বলল যা নাকি সিধে

কাথার কথা কিন্তু ছিল না। মোটমাট এক বাজে কথা। উপস্থিত জন সাধারণ মজা দেখতে দেখতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, "এই ডাক্তারগুলো ত' আচ্ছা শুয়ারের বাচ্চা!" অথচ দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন ডাক্তারও ছিল। এসব বিচার-টিচার এমনই এক আহাম্মকির খেলা যাতে যেকোন ডাক্তার যেকোন সময় ফেঁসে যাওয়া সম্ভব। হয়ত আজ তুমি ফাঁসলে আগামীকাল আমি। তবু আমরা ডাক্তাররা মুখ খুলি না। আমি যদি সবে মস্কো থেকে ঘুরে না আসতাম আমিও হয়ত কিছু বলতাম না। কিন্তু দু'মাস মস্কোয় কাটিয়ে আমি যে নতুন তাজা মন নিয়ে ফিরেছিলাম তাতে আমার সব মূল্যবোধ বদলিয়ে গিয়েছিল। লোহ-কঠোর বেড়া মনে হয় পচা কাঠের বেড়ার মত দুর্বল। সুতরাং আমি ঝুঁকি নিলাম। বক্তৃতা দিলাম।"

"ওখানে বক্তৃতা দিতে দেয়?" ডণ্ট্সোভা বললেন।

"হ্যাঁ, ওটা আসলে একটা বিতর্ক সভা। আমি বললাম, 'এ ধরনের সার্কাস আয়োজন করার জন্য আপনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত'—ওদের মুখের ওপরে বলে দিলাম। ওরা আমাকে থামাতে চেষ্টা করেছিল। আমি বললাম, 'চিকিৎসার ভুলের চেয়ে বিচারের ভুল যে কত সহজে ঘটে থাকে তাও কি আপনাদের জানা নেই? এই ঘটনার বৈজ্ঞানিক তদন্ত হওয়া উচিত, বিচার বিভাগীয় তদন্ত নয়। একদল ডাক্তারকে, শুধু ডাক্তার আর কেউ নয়, যাঁরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম, এই তদন্তের ভার দেওয়া উচিত ছিল। আমরা সার্জনরা প্রতি মঙ্গল আর শুক্রবার যে বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করি তা কেবল এক মাইন বিছানো রণক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনীয়। আমাদের কাজের ভিত্ত হ'ল পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্পূর্ণ বিশ্বাস। একজন মায়ের উচিত তার সন্তানকে আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া, আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে দাঁড়ানো নয়'।"

লেভ্ নতুন করে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। বোধ করছিলেন, গলার ভেতরে কি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। আধ-খাওয়া স্যাণ্ডউইচ্ পড়েই রইল। অর্ধেক শেষ হওয়া প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন: "জানো, এই অভিযুক্ত সার্জনটি এক রুশ! জার্মান বা ই-হু-দি নয়।" 'ইহুদি' কথাটা বলতে গিয়ে লেভের জিভ বেরিয়ে পড়ল। "ওসব হলে বিচারক আর দর্শকরা ত' ওকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠত। যাহোক, আমার বক্তব্য শেষ হতে ওরা হাততালি দিল। কিন্তু, আমি কি চুপ করে থাকতে পারি? কেউ অন্যায় ভাবে গলায় ফাঁস পরিয়ে দিলে তাকে ছিঁড়ে ফেলতেই হবে। হাত গুটিয়ে থাকা অর্থহীন।"

লেভের কাহিনী শুনতে শুনতে ভেরা মাঝে মাঝে মাথা হেলাচ্ছিল। ও খুব আহত বোধ করছিল। চোখ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় ব্যথিত, কিন্তু লেভের বক্তব্যে সপ্রশংস সহমত দৃষ্টি। লেভ্ এই জন্যই এসব কথা বলে খুশি হন।

ডস্ট্‌সোভা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ছোট-ছোট করে ছাঁটা, ধূসর হয়ে আসা চুলে ঢাকা বড় মাথাটা নেড়ে বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। ডাক্তারদের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের আর কোন্‌ পথ আছে, বলুনত'? আমার মনে পড়ে, এক সার্জন অপারেশনে ব্যবহৃত ছোট তোয়ালে সুদ্ধু এক রোগীর পেট সেলাই করে দিয়েছিলেন। স্রেফ চিকিৎসকের অবহেলায় একটি রোগীর পা প্লাস্টার কাস্টের মধ্যে পচে গিয়েছিল। এও কি শোনা যায় না যে সঠিক মাত্রার চেয়ে দশগুণ বেশী ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে? আমরাই কখনো কখনো ভুল গ্রুপের রক্ত রোগীর দেহে দিয়ে থাকি, তাই নয়? আমাদেরই অবহেলার ফলে রোগীদের দেহ পুড়ে যায়, এও ঠিক। বিচার করা ছাড়া আমাদের শায়েস্তা করার কি উপায় আছে, শুনি? অবাধ্য শিশুর মত আমাদেরও কাণ ধরে টানা উচিত!"

"ডাঃ ডস্ট্‌সোভা, আপনি আমাকে খুন করছেন!" লেভ্‌ এক হাত নিজের কপালের কাছে আনলেন। ওটা যেন তাঁর সুরক্ষা ব্যবস্থা। "আপনি এসব কি করে বলতে পারলেন? এ সমস্যার ব্যাপ্তি কেবল চিকিৎসা পর্যন্ত নয়। আমাদের সামাজিক সংগ্রামের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে।"

"সমাধান পেয়েছি! এ সমস্যার সমাধান পেয়েছি!" ভেরা ওদের দু'জনের হাত ধরে বাদানুবাদ থামাতে ইঙ্গিত করল। "ডাক্তারদের অধিকতর দায়িত্ব পালন করতে হবে, এবং তার সঙ্গে তাদের দায়িত্বে দেওয়া রোগীদের সংখ্যা এখনকার সংখ্যার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ করতে হবে। বহির্বিভাগে রোগীর ভিড় দেখুন। ডাক্তারদের ঘণ্টায় ন'টা করে রোগী দেখতে হয়, যা সত্যিই অসম্ভব কাজ। আমাদের নীরবে এবং শান্তিতে রোগী দেখার এবং ভাববার সুযোগ দেওয়া উচিত। আর সার্জনরা দিনে মাত্র একটা অপারেশন করবে, এখনকার মত তিনটে নয়।"

তবু ডস্ট্‌সোভা আর লেভ্‌ কথা কাটাকাটি করে চললেন। ওঁদের আর মতের মিল হয় না। অবশেষে ভেরা ওদের চুপ করাল। বলল, "বিচারে কি রায় হ'ল?"

লেভের মুখে হাসি ফুটল। "আমরা সার্জনটিকে বাঁচাতে পেরেছি। গোটা বিচারটাই ভেস্তে গেল। যাহোক, বিচার সভা মেনে নিয়েছে যে রোগীর রোগের ইতিবৃত্তে ভুল তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু ঐটুকুই শেষ নয়। রায় ঘোষিত হওয়ার পর নগর স্বাস্থ্য সেবা অধিকর্তা একটি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় অভিযোগ করলেন যে আমরা ডাক্তার, নার্স এবং রোগীদের ঠিক মত শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করি না এবং যথেষ্ট ঘন ঘন শ্রমিক সংগঠনের অধিবেশন ডাকি না। অবশেষে নগরের প্রবীণ সার্জনের বক্তৃতা। তাঁর বক্তব্য? 'কমরেডগণ, এভাবে ডাক্তারদের বিচার আয়োজন করা এক অপূর্ব উদ্যমের পরিচায়ক। সত্যিই অপূর্ব'!"

যার যা আকর্ষণীয় মনে হয়

এক সাধারণ কর্ম দিবস। সাধারণ রাউণ্ড চলছিল। ভেরা রশ্মি-চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীদের দেখতে যাচ্ছিল। ও একাই চলেছিল। কিন্তু সিঁড়ির ওপর দিকের বাঁকে এক সহকারী ওর সঙ্গী হ'ল। সহকারীটি জোয়া।

ওরা দু'জন সিব্গাটভের বেডের পাশে একটু দাঁড়াল। বেশীক্ষণ না দাঁড়ানোর কারণ ওর চিকিৎসার প্রতিটি নতুন পদক্ষেপের ব্যাপারে স্বয়ং ডন্ট্সোভা সিদ্ধান্ত নেন। ওরা ওয়ার্ডের ভেতরে চলল।

ভেরা আর জোয়া দুজনে একই রকম লম্বা। ওদের ঠোঁট, চোখ আর টুপিরও একই উচ্চতা। কিন্তু জোয়া আরেকটু হৃষ্টপুষ্ট বলে ওকে আকারে বড় দেখায়। আর দু'বছর পরে যখন ও পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে বেরোবে তখন ওকে ভেরার চেয়ে প্রভাবশালী দেখাবে।

ওরা ওলেগের বেডের বিপরীত সারির সামনে দিয়ে এগিয়ে চলল। ওলেগ্ শুধু ওদের পেছন থেকে দেখতে পেল। টুপির নিচ থেকে ভেরার গাঢ়-বাদামী আর জোয়ার সোনালী চুলের গোছা দেখা গেল।

আজ ওরা শুধু রশ্মি-চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীদের দেখবে। রোগী দেখার গতি বেশ মন্থর। ভেরা প্রত্যেক রোগীর বিছানায় বসে তাকে পরীক্ষা করছিল, তার সঙ্গে কথা বলছিল।

ভেরা আহমদজানের গায়ের চামড়া পরীক্ষা করে দেখল। ওর রোগের ইতিবৃত্ত, হালে নেওয়া রক্ত পরীক্ষার কাগজও দেখল। বলল, "শীঘ্রই তোমার রশ্মি চিকিৎসা শেষ হবে। তুমি বাড়ী ফিরে যেতে পারবে।" আহমদজান হাসল।

"তুমি কোথা থেকে এসেছ?" আহমদজান বলল, "কারাবীর থেকে।"

"বেশ, তুমি কারাবীরে ফিরে যাবে।" "আমি কি সেরে গিয়েছি?" আহমদজান খুশিতে ঝক্ঝক্ করে উঠল।

'হ্যাঁ, সেরে গিয়েছ।" "পুরোপুরি সেরে গিয়েছি?"

'হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত পুরেপুরিই বলা চলে।" "তার মানে আমায় আর এখানে আসতে হবে না?"

'তুমি ছ'মাস পরে আবার আসবে।"

"আমার রোগ সেরে গিয়ে থাকলে, আবার আসতে হবে কেন?"

"আমরা তোমাকে আরেকবার দেখতে চাই।"

ভেরা ঐ সারির সব রোগীকেই দেখল, কিন্তু একবারও ওলেগের দিকে ফিরে তাকাল না। জোয়া শুধু একবার আড় চোখে দেখল।

ভেরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাদিমকে দেখল। ওর পা, তারপর প্রথম এক দিক, পরে অপর দিকের কুঁচকি দেখল। পেট আর তলপেট ভাল করে টিপেটিপে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও করতে থাকল। একটা প্রশ্ন ভাদিমের নতুন ধরণের মনে হ'ল: বিভিন্ন ধরণের খাবার খেলে কি কি ধরণের অনুভূতি হয়?

ভাদিম চিন্তা করল। ভেরা নিচু গলায় প্রশ্ন করছিল। ভাদিমও নিচু গলায় জবাব দিচ্ছিল। ভাদিম আশা করেনি যে ভেরা ওর ডান তলপেটের একটু ওপরে টিপে দেখবে, বা বিভিন্ন খাবার খেলে কি কি অনুভূতি হয় জানতে চাইবে। ওর মনে পড়ে গেল, হাসপাতাল থেকে বিদায় নেওয়ার আগে ওর মাও ঐ রকম পেট টিপে টিপে দেখেছিল। ভাদিম প্রশ্ন করল, "আপনি কি আমার লিভার পরীক্ষা করছেন?"

"এই রোগীটি সব কথা জানতে চায়," ভেরা মাথা নাড়তে নাড়তে জোয়াকে বলল, "আজকালকার রোগীরা এত শিক্ষিত যে শীঘ্রই আমাদের সাদা কোট খুলে ওদের পরাতে হবে।"

কালচে হলুদ গায়ের রঙ আর ঘন কালো মাথার চুল ভাদিম শায়িত অবস্থায় এক কঠোর, ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ভঙ্গী নিয়ে ডাক্তারদের দেখছিল। ও শান্তভাবে বলল, "আমিও এসব বুঝি। কিছু পড়েছি।" ওর বক্তব্যে ভেরাকে চাপ দিয়ে ওর সঙ্গে মতৈক্য আদায়ের চেষ্টা নেই। এমন জেদাজেদি নেই যে ভেরা তক্ষুণি ওকে সবকিছু বিশদ ভাবে বোঝাক। কিন্তু ওর ভঙ্গীতে ভেরার বিব্রত লাগল। ও কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। শুধু বেডের ধারে বসে রইল, যেন ভাদিমকে অন্যায় ভাবে আঘাত করেছে। ভাদিম দেখতে সুপুরুষ। সম্ভবতঃ খুবই প্রতিভাবান। ওকে দেখে ভেরার নিজের আত্মীয়দের মধ্যে এক যুবকের কথা মনে পড়ল। যুবকটির অনেক দিন রোগ ভোগের পর মৃত্যু হয়েছিল। ঐ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে একটুও জানতে পারেনি যে তার মৃত্যু অবধারিত, এবং কোন চিকিৎসকই ওকে সারাতে পারবে না। ভেরা তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। ঐ যুবককে দেখে ও আর ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়নি। ডাক্তার হতে চেয়েছিল।

ভেরা ডাক্তার হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও মানুষের কতটুকু উপকার করতে পারে?

ভাদিমের জানলার চৌকাঠে এক জগ ভর্তি চাগা রাখা ছিল। অপর রোগীরা এসে মাঝে মাঝে তাই ওকে ঈর্ষা ভরে দেখত।

"আপনি কি ঐ জিনিসটা খান? ভাদিম বলল, "হ্যাঁ খাই।"

ভেরার চাগায় বিশ্বাস নেই। ও অতি সম্প্রতি চাগা সম্পর্কে শুনেছে। যাহোক, জিনিষটা ইসিক-কুল অঞ্চলের গাছের মূলের মত বিষাক্ত নয়। রোগীর যদি তাতে বিশ্বাস থাকে, উপকার হতে পারে। ভেরা প্রশ্ন করল, "তেজস্ক্রিয় সোনা সংগ্রহ করার আয়োজন কত দূর এগিয়েছে?"

"এখনো আশ্বাস দিচ্ছে। হয়ত কয়েক দিনের মধ্যে পাওয়া যাবে," ভাদিম গম্ভীর ভাবে জবাব দিচ্ছিল, "কিন্তু, যতদূর বুঝছি, সরাসরি কোন ব্যক্তিকে দেবে না। সরকারী সূত্র মাধ্যমে পাঠাবে। শুনুন..." ও ভেরার দিকে চেয়ে অনুনয়ের সুরে বলল "তেজস্ক্রিয় সোনা এখানে পৌঁছতে যদি আরো দু' সপ্তাহ লেগে যায় তাহলে কি আমার যকৃতে রোগের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গ দেখা দেবে?"

"হায় ভগবান! যকৃতে কেন দেখা দেবে? মোটেই দেখা দেবে না।" ভেরা ওর প্রতীতি আনার মত আন্তরিকতা সহ ডাহা মিথ্যে কথা বলল। মনে হল, ভাদিম তা বিশ্বাস করেছে। "জেনে রাখুন, রোগের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গ কয়েক মাসের আগে দেখা দেয় না।"

(তবু ভেরা ওর তলপেটের ওপর দিকটা টিপে দেখছে কেন? খাবার খেলে কেমন লাগে জানতে চাইছে কেন?) ভাদিম ভেরার কথা বিশ্বাস করতে চাইল। বিশ্বাস করতে পারলে অনেক সহজ লাগে···

ভেরা যখন ভাদিমের বেডে বসে ওকে দেখছিল জোয়া কোন কাজ না পেয়ে ওলেগের দিকে মাথা ঘোরাল। ওলেগ্ কাছেই ছিল। জোয়া আড় চোখে দেখল ওলেগের বই জানলার চৌকাঠে রাখা আছে। জোয়া এবার ওলেগের দিকে তাকাল। জোয়ার চোখ ওলেগ্‌কে কিছু বলল, কিন্তু কি বলল তা বোঝা গেল না। ওর ওপরে ওঠা ভুরুর নিচে সপ্রশ্ন চোখ দুটি সত্যিই সুন্দর লাগছিল। কিন্তু ওলেগের দৃষ্টিতে কোন অভিব্যক্তি বা জবাব ব্যক্ত হ'ল না। এর আগে রাউণ্ডের সময় যখনই এমন হত যে শুধু ওলেগ্ ওর চোখের ভাষা পড়তে পারবে জোয়া তখনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, মন উপচানো খুশির আহ্বায়ক সংকেত পাঠাত। অতি সম্প্রতি, অবশ্য, জোয়ার সংকেত অনেক কমে গিয়েছিল, আর জবাবী সংকেত পুরোপুরি থেমে গিয়েছিল।

ওলেগের রাগের কারণ, যে অল্প ক'দিন ওলেগ্ ওর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যেত, জোয়া তখন অত পীড়াপীড়িতেও ওর সব কথা মানেনি। তারপর যে ক'রাত জোয়া ডিউটিতে ছিল ওলেগের ঠোঁট আর হাতের সাফল্য আগের কয়েক রাতের বেশী হয়নি। যেন সবকিছু জোর করে আদায় করা গোছের। তারপর থেকে জোয়া রাত ডিউটিতে থাকলে ওলেগ্ দেখা করতে না গিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। চোখের খেলা ওলেগের কাছে অর্থহীন অতীত হয়ে পড়েছিল। শান্ত চাউনিতে ও বোঝাতে চাইল যে, ও ঐ খেলার অর্থ বোঝে না। ঐসব খেলার পক্ষে ও অনেক বেশী পরিণত হয়ে গিয়েছে।

তারপর থেকে জোয়া রাউণ্ডে এলে ওলেগ্ শুধু পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হত। এখনও ওলেগ্ পায়জামা-জ্যাকেট খুলে গেঞ্জি খোলার জন্য তৈরি হ'ল।

ভেরা ভাদিমকে পরীক্ষার পর হাত মুছল। ও ওলেগের দিকে মুখ ফেরাল। ভেরা হাসল না, ওলেগ্‌কে কিছু বলতেও বলল না। শুধু একবার ওলেগের দিকে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিল, এবার তোমার পালা। ভেরার দৃষ্টি সরিয়ে নিতে যে সামান্য ক'মুহূর্ত লাগল ওলেগ্ তার মধ্যেই বুঝতে পারল ভেরা কত দূরে সরে গিয়েছে। রক্ত প্রদানের দিন ঐ দুটি চোখে যে বিশেষ কান্তি আর আনন্দ দেখা গিয়েছিল, তার আগেও যে মমতা ভরা বন্ধুত্ব, যে সদা সজাগ সহানুভূতি দেখা গিয়েছিল, সে সব হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে! চোখ দুটি শূন্য, ভাষাহীন হয়ে গিয়েছে।

"কস্টোগলোটভ," ভেরা বরং পাভেলের দিকে চেয়ে বলল, "একই চিকিৎসা চলছে দেখছি। কিন্তু, একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখা যাচ্ছে যে……" ভেরা জোয়ার দিকে ফিরে বলল, "হর্মোন চিকিৎসায় বেশ দুর্বল সাড়া দেখা যাচ্ছে।"

জোয়া কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে বলল, "সেটা হয়ত রোগীর দেহের জৈব রসায়নের বৈশিষ্ট্যের ফল।"

জোয়ার ডাক্তারি পাশ করতে মাত্র এক বছর বাকি। ওর ঐ জবাবের কারণ, ও ভাবল ভেরা ওর অভিমত জানতে চায়। ভেরা কিন্তু ওর অভিমত অগ্রাহ্য করে প্রশ্ন করল, "রোগীকে কি ব্যবধানে হর্মোন থেরাপি ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়?" ভেরার প্রশ্নে বোঝা গেল ও আদৌ জোয়ার অভিমত শুনতে চায় না।

ভেরার মনোভাব বুঝতে জোয়ার দেরী হল না। ও মাথা একটু পেছনে হেলিয়ে ভেরার চোখে সোজা তাকাল। ওর বাদামী চোখ দুটো যেন বিস্ময়ে অক্ষি-গোলক থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সে বিস্ময় সম্পূর্ণ অকপট।

"এতে সন্দেহের কি প্রশ্ন থাকতে পারে?" জোয়া বলল "সব প্রয়োজনীয় চিকিৎসাই ত' নির্ভুল ভাবে… " ভেরা এ ব্যাপারে আর কিছু বললেই ও অপমানিত বোধ করবে। "অন্ততঃ আমি যতক্ষণ ডিউটিতে থাকি…"

জোয়া শুধু নিজে যে সময়ে ডিউটিতে থাকে ততটুকুর জন্যই দায়ী, তার বাইরে ওকে প্রশ্ন করা চলবে না। 'অন্ততঃ আমি যতক্ষণ ডিউটিতে থাকি' কথা ক'টা জোয়া এমন দ্রুত, এক নিঃশ্বাসে বলল যে ভেরার দৃঢ় ধারণা হ'ল, ও মিথ্যে কথা বলছে। ইন্‌জেকশনে যেহেতু আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না, তার অর্থ কেউ ইন্‌জেকশন দিতে গাফিলতি করছে। মারিয়া বা ওলিম্পিয়াডা গাফিলতি করে বলে মনে হয় না। আর ভেরা জানত, জোয়া রাত ডিউটিতে…

প্রতিস্পর্ধা জানাতে প্রস্তুত জোয়া এত উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকাল যে ভেরা বুঝল, জোয়ার ত্রুটি প্রমাণ করা অসম্ভব, এবং জোয়াও তা জানে। জোয়া এত স্পর্ধা ভরে তাকাল যে ভেরা জবাব খুঁজে না পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। অপ্রিয় প্রসঙ্গে ভাবতে হলে ভেরা সব সময় দৃষ্টি অবনত করে।

ভেরা অপরাধীর মত দৃষ্টি অবনত করল আর বিজয়িনী জোয়া প্রতিস্পর্ধার ভঙ্গীতে সোজাসুজি ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

এবার জিতলেও জোয়া সঙ্গে সঙ্গে বুঝল ওর ঐ ঝুঁকি নেওয়া উচিত হয়নি। ডক্‌টর্‌ সোভা হয়ত নিজেই খোঁজ নেবেন। কোন রোগী, যেমন পাভেল, যদি তাঁকে জানায় যে জোয়া ওলেগকে কোন ইন্‌জেকশনই দেয় না, ওর হাসপাতালের চাকরিটা ত' যাবেই তার সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে ওর নামে খারাপ রিপোর্ট ও যাবে।

ঝুঁকি ত' বটেই, কিন্তু সে ঝুঁকি নেওয়ার সার্থকতা কোথায়? এ একটা এমন খেলা যা প্রকৃত পক্ষে শেষ হয়ে গিয়েছে। এ খেলায় নতুন কোন চাল চালবার জায়গাই নেই। এ খেলার সীমা লঙ্ঘন করতে চাওয়া পুরোপুরি হাস্যকর। আর হতচ্ছাড়া উশ্‌-টেরেকে কাজ নিয়ে নিজের জীবন এমন এক-

পুরুষের সঙ্গে জড়ানো যে …না, সে প্রশ্নই ওঠে না। ওর মনে সে সম্ভাবনার অস্তিত্বই নেই। জোয়া ওলেগের পা থেকে মাথা অব্দি দেখল, আর ঐ দৃষ্টি দ্বারা ওলেগ্‌কে ইন্‌জেকশন না দেওয়ার চুক্তি নাকচ হয়ে গেল।

ওলেগ্‌ পরিষ্কার দেখল, ভেরা ওর দিকে তাকাতেও চাইছে না। ও বুঝতে পারল না কেন, কি করে এত আচমকা এই পরিবর্তন ঘটল। ওলেগ্‌ যত দূর জানে, এই পরিবর্তন আনার মত কোন ঘটনা ঘটেনি। ভেরা, অবশ্য, গতকাল বারান্দায় দেখা হতে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ওলেগ্‌ ধরে নিয়েছিল ওটা নেহাৎ ঘটনা সংযোগ জনিত ব্যাপার।

মেয়েদের মেজাজেরও কোন ঠিক আছে! তার স্বরূপ ত' ওলেগ্‌ ভুলেই গিয়েছিল। সবকটা মেয়েই এক রকম। কোন উত্তাপ সৃষ্টি হওয়ার আগেই দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। দীর্ঘস্থায়ী, এমন কি স্বাভাবিক সম্পর্ক কেবল পুরুষ এবং পুরুষে সম্ভবপর।

এখন জোয়াও বেজার হয়েছে। ও যে চোখ পিটপিট করছে তার অর্থ ত' ধমক ছাড়া আর কিছু নয়। ও আসলে ভয় পেয়েছে। ইন্‌জেকশন দেওয়া শুরু হলে ওদের মধ্যে আর কি বাকি থাকবে? কোন লুকানো কথা আর লুকানো থাকবে কি?

ভেরা তবে কি চায়? ও কি চায় গুণে গুণে প্রতিটি ইন্‌জেকশন দেওয়া হোক? ইন্‌জেকশানগুলো ওর কাছে অত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ও সহানুভূতিশীল বটে। কিন্তু ওর সহানুভূতি পাওয়ার জন্য ইন্‌জেকশন নেওয়া কি খুব বেশী মূল্য চোকানো নয়? চুলোয় যাক ভেরা!

ভেরা ইতিমধ্যে পাভেলের সঙ্গে কথা বলছিল। ওর কথার সুর নরম এবং উষ্ণ, ওলেগের সঙ্গে যে সুরে কথা বলেছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। "আমরা আপনাকে ইন্‌জেকশনে এমন অভ্যস্ত করে তুলেছি," ভেরা ঠাট্টা করে বলল, "যে হয়ত চাইবেন না যে ইন্‌জেকশন থামুক।"

(আচ্ছা, আচ্ছা, ঐ শুয়ারের বাচ্চার পা-ই চাটো। আমার বয়ে গেল!)

ডাক্তাররা ওর কাছে আসার জন্য অপেক্ষা করতে করতে পাভেল ভেরা আর জোয়ার দ্বন্দ্ব দেখেছিল, কিছু শুনেছিলও। ওলেগের পড়শী হিসেবে পাভেল বুঝেছিল যে জোয়া তার প্রেমিকের খাতিরে মিথ্যে কথা বলছে। হাড্ডিচুষের সঙ্গে জোয়ার চুক্তির কথা পাভেল জানত। এটা যদি হাড্ডিচুষ না হয়ে আর কারো ব্যাপার হত পাভেল হয়ত গোপনে ডাক্তারদের দু-এক কথা জানাতে পারত। রাউণ্ডের সময়, সকলের সামনে জানাত না। ওসব কথার জন্য ডাক্তারদের কামরা অনেক ভাল। কিন্তু জোয়ার নামে ওসব কথা লাগানোর সাহস পাভেলের নেই। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, যে এক মাস হ'ল ও ক্যানসার ওয়ার্ডে আছে তার মধ্যে পাভেল বুঝেছে যে অত্যন্ত নগণ্য সহকারী চিকিৎসকও অনেকগুলো অসুবিধে ঘটিয়ে ওর ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে। হাসপাতালে ওদের পারস্পরিক আনুগত্যের ব্যবস্থা আছে। ওর

নিজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন এক ব্যাপারে ওদের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে লাভ নেই।

হাভ্ডিচুষ যদি আহাম্মকি করে ইন্‌জেকশন না নেয় ত' তার রোগ বাড়বে। পচে মরবে। ঠিক হবে।

পাভেলের নিজের কথা? ও নিশ্চিত জেনেছে যে ও মরছে না। ওর টিউমার দ্রুত কমছে। ও রোজই ডাক্তারদের রাউণ্ডের পথ চেয়ে থাকে, কারণ ডাক্তাররা ওর ধারণা সমর্থন করবেন। আজ ভেরা জানিয়েছে, চিকিৎসায় সুফল ফলছে, মাথাধরা আর সাধারণ দুর্বলতাও অল্প কিছু দিনে দূর হবে। ভেরা পাভেলকে আরেকবার রক্ত প্রদানের ব্যবস্থাও করবে।

যেসব রোগীরা গোড়া থেকে ওর টিউমার দেখেছে পাভেল এখন তাদের মতামতের মর্যাদা দেয়। হাভ্ডিচুষকে বাদ দিলে তাদের মধ্যে শুধু আহমদজানই এখনো ওয়ার্ডে রয়ে গিয়েছে। কয়েক দিন আগে, অবশ্য, ফ্রিডরিশ ফেদেরো সার্জিক্যাল ওয়ার্ড থেকে ফিরে এসেছে। ওর ঘাড়ের অসুখ এখন বেশ ভালোর দিকে—কয়েক সপ্তাহ আগে ইয়েফ্রেমের মত নয়। প্রায়ই ওর ব্যাণ্ডেজ এক পরত করে কমিয়ে দিচ্ছে। ফ্রিডরিশ চ্যালির বেডে এসেছে। পাভেলের পড়শী হয়েছে।

পাভেলের যে দু'জন নির্বাসন দণ্ড পাওয়া মানুষের মাঝখানে শুয়ে থাকতে হয়, এটা কি কম অবমাননাকর ভাগ্যের পরিহাস? ওর নিজের যদি হাসপাতালে ঢোকার আগেকার শারীরিক অবস্থা থাকত, পাভেল তাহলে নীতিগত দিক থেকে এর একটা বিহিত পাওয়ার জন্য সোজা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করত। বলত, সরকারের পদস্থ কর্মীদের কি সন্দেহদুষ্ট, সামাজিক দিক থেকে ক্ষতিকর জীবদের সঙ্গে ঠেসে রাখা উচিত? কিন্তু টিউমারটা ওকে পাঁচ সপ্তাহ ধরে বঁড়শী গাঁথা মাছের মত এমন টেনে-হিঁচড়ে বেড়িয়েছে যে ও অনেক সরল এবং দয়ালু হয়ে গিয়েছে। দরকার হলে ও হাভ্ডিচুষের দিকে পেছন ফিরে শুতে পারে। হাভ্ডিচুষ আর তেমন চেঁচামেচি করে না, প্রায় নড়াচড়া না করে চুপচাপ শুয়ে থাকে। খুব বেশী খুঁতখুঁতে মানুষ ছাড়া সবাই ফিড্‌রিশ সম্পর্কে বলবে, সহ্য করার মত পড়শী। সবচেয়ে বড় কথা, পাভেলের টিউমার কমে গিয়ে আগের আয়তনের এক তৃতীয়াংশ হয়েছে দেখে ও খুবই খুশি হয়েছে। পাভেলের অনুরোধে ফিড্‌রিশ বারবার ওর টিউমার দেখে, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। ফিড্রিশ ধীর-স্থির মানুষ। পাভেলের কথা শুনতে সদা আগ্রহী। কখনই উদ্ধত ব্যবহার করে না, পাভেলের বিরুদ্ধাচরণও করে না। তার কারণও আছে। এ ধরনের জায়গায় নিজের কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত গল্প করা পাভেলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে নিজের ফ্ল্যাট, যে ফ্ল্যাট ও অত ভালবাসে এবং যেখানে কিছুদিন পরই ফিরে যাবে, সম্পর্কে মন খুলে গল্প না করার কোন কারণ নেই। ফ্ল্যাটটার সঙ্গে কোন গোপনীয়তা জড়িয়ে নেই। আর মানুষ যে কত ভাল ভাবে থাকতে

পারে (এক দিন সবাই ঐ রকম ভাল ভাবে থাকতে পারবে), ফ্রিডরিশ সেসব কথা মন দিয়ে শুনত। চল্লিশোত্তীর্ণ পুরুষের পদমর্যাদা আর যোগ্যতার এক সুন্দর নিরিখ তার ফ্ল্যাট। পাভেল ফ্রিডরিশকে সবিস্তারে বলেছিল কি ভাবে ধাপে ধাপে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঘর সাজানো হয়েছে, ঝুল বারান্দাটা কেমন ধরনের আর তাকে কেমন সাজানো হয়েছে ইত্যাদি।

পাভেল প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। প্রতিটি সোফা আর আলমারি কবে এবং কোথায় কেনা, কত দাম, প্রতিটির সুবিধা-অসুবিধা ওর পরিষ্কার মনে আছে। বাথরুমের বর্ণনা করেছিল আরো সবিস্তারে। বাথরুমের মেঝে আর দেওয়ালের চীনামাটির টালি, বাথটব এবং বাথটবের মাথার দিকে মাথা হেলান দেওয়ার গোলাকৃতি জায়গা, সাবান এবং তোয়ালে রাখার জায়গা, গরম জলের কল এবং ফোয়ারা নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই বলেছিল। এই খুঁটিনাটিগুলো আদৌ তুচ্ছ জিনিষ নয়, বরং এগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবন এবং সত্তার অঙ্গ আর "সত্তাই চেতনার নির্ণায়ক" [মার্ক্স-এর এই উক্তিটি কমিউনিস্ট দেশগুলোয় এক প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে]। সঠিক চেতনার জন্য চাই সুন্দর জীবন যাত্রা। অর্থাৎ গোর্কির ভাষায় 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন।'

বিবর্ণ দেহ এবং ঝাঁটার মত চুল ফ্রিডরিশ অবাক বিস্ময়ে, মুখ হাঁ করে পাভেলের কাহিনী শুনত, কখনো দ্বিমত প্রকাশ করত না। মাঝে মাঝে মাথাও হেলাত, অন্ততঃ যতদূর ওর ব্যাণ্ডেজ করা ঘাড় হেলাতে দিত।

জার্মান এবং নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত হলেও ফ্রিডরিশ শান্ত, ভাল মানুষ। ওর পাশের বেডে থাকতে অসুবিধে নেই। ওর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া চলে। চমৎকার লোক। ও কমিউনিস্টও বটে, অন্ততঃ আইনের চোখে। পাভেল নিজের অভ্যস্ত সাফ কথা বলার ভঙ্গীতে সবই বুঝিয়ে বলেছিল। "ফ্রিডরিশ," পাভেল বলেছিল, "তুমি নিশ্চয় বোঝো যে তোমাকে নির্বাসন দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। বোঝো না?"

"হ্যাঁ, তা বুঝি," ফ্রিডরিশ নিজের শক্ত হয়ে থাকা ঘাড় কোন মতে হেলিয়ে বলেছিল।

"ঐ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার আর কোন পথ ছিল না।"

"বটেই ত'"

"সব সরকারী পদক্ষেপের, এমন কি নির্বাসন দণ্ড দানেরও, পেছনে কারণ থাকে। তোমার অন্ততঃ এই জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে নির্বাসিত হলেও তোমাকে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য রয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে।"

"অবশ্যই, নিশ্চয়….."

"নির্বাসনের আগে তুমি পার্টির কোন পদাধিকারী ছিলে না, ছিলে?"

"না, ছিলাম না।"

"তোমার জীবিকা ছিল এক সাধারণ শ্রমিক, তাই ত'?"

"হ্যাঁ, যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ মিস্ত্রির ছিলাম।"

"আমিও এক শ্রমিক ছিলাম। দ্যাখো, আমি কত ওপরে উঠেছি।"

ওদের সন্তানাদির প্রসঙ্গও উঠল। জানা গেল ফিড্রিরশের মেয়ে হেনরিয়েটা আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী।

"তাহলে বোঝো!" পাভেল রীতিমত অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল, "তুমি নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত হলেও তোমার মেয়ে স্নাতক হতে চলেছে! জারের আমলে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করা যেত? এখন সত্যিকার কোন বিধি-নিষেধই নেই।"

"বিধি-নিষেধগুলো শুধু এই বছর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে," ফিড্রিরশ প্রথম পাভেলের সঙ্গে দ্বিমত হল, "তার আগে আমাদের কমেন্দাতুরার থেকে অনুমতি চাইতে হ'ত। তাতেও কলেজগুলো মেয়েটার আবেদন নাকচ করে দিয়ে বলত, ও প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করতে পারেনি। ওরা সত্যি কথা বলত কিনা তা বুঝব কি করে?"

"কিন্তু তুমি যে বললে তোমার মেয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী?"

"তা ঠিক। ও আসলে খুব ভাল বাসকেট বল খেলোয়াড়। কলেজ তাই ওকে বাধ্য হয়ে নিয়েছে।"

'যে জন্যই নিয়ে থাক, তোমার অকারণ অভিযোগ করা অনুচিত। এ বছর থেকে কোন রকম বিধি-নিষেধই নেই বলা চলে।"

ফিড্রিরশ কৃষি সংক্রান্ত কারিগরি কর্মী। প্রাক্তন শিল্প কর্মী এবং অধুনা পদস্থ সরকারী কর্মচারী পাভেল ত' ওর ওপর পণ্ডিতি করতে চাইবেই।

"কমিউনিস্ট পার্টির জানুয়ারি মাসের বৈঠকের পর তোমাদের জন্য অনেক ভাল ব্যবস্থা করা হবে," পাভেল সদয় ভাবে জানাল।

"হ্যাঁ। তা ঠিক।"

"প্রতিটি ট্র্যাক্টর স্টেশন অঞ্চলে একদল নির্দেশক বহাল হলে ওরা মূল সংস্থার সঙ্গে সংযোগ রক্ষণকারী হিসেবে কাজ করতে পারবে। [ঐ ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলো যৌথ খামারগুলোকে যন্ত্রাদি ধার দিত। ঐ স্টেশনগুলোর দেখ ভাল করার নির্ণায়ক প্রভাব পড়ত কৃষি ব্যবস্থাপনার ওপর] সব কিছুই ওর ওপর নির্ভরশীল।"

"হ্যাঁ, তাই ত'।"

ফিড্রিরশ 'হ্যাঁ, তাইত' " বলাই যথেষ্ট নয়। ওর সব বোঝা উচিত। পাভেল তাই ওর ভাল মানুষ পড়শীকে সবিস্তারে বোঝাতে লাগল, নির্দেশক দল বহাল হওয়ার পর ঐট্র্যাক্টের স্টেশনগুলো কি করে এক একটা দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হবে। যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় সমিতি ভুট্টা চাষ সম্পর্কে যে আবেদন প্রচার করেছে তার আলোচনা প্রসঙ্গে বোঝাল, আশা করা যায় যে এ বছর যুব সম্প্রদায় ভুট্টা চাষ সম্পর্কিত সমস্যার মোকাবিলায় এগিয়ে আসবে, এবং তার ফলে কৃষি চিত্রপট পুরোপুরি বদলিয়ে যাবে। [ঐ সময় খ্রুশ্চেভ্

সবে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতা হয়েছিলেন। খ্রুশ্চেভের ধারণা ছিল উত্তর রাশিয়ায় ভুট্টা চাষের ব্যাপক প্রচলন করা গেলে খাদ্য-শষ্য এবং গো-খাদ্যের অভাব মেটানো সম্ভবপর হবে। খ্রুশ্চেভ্ যুব কমিউনিস্টদের আহ্বান করে বলেছিলেন তারা যেন ঐ অঞ্চলের ভুট্টা চাষ বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। খ্রুশ্চেভের পরিকল্পনা, অবশ্য, জলবায়ুর অসহযোগিতার ফলে ব্যর্থ হয়েছিল। গতকালের কাগজে পড়া কৃষি পরিকল্পনায় মৌলিক পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনাও হ'ল। ভবিষ্যতে ঐ বিষয়ে আরো আলোচনা হবে, এমন কথাও হ'ল।

দেখা গেল ফ্রিডরিশ মোটামুটি এক ইতিবাদী মানুষ। পাভেল এমনিতে যেসব খবর পড়ত না তাই মাঝে মাঝে ফ্রিডরিশকে খবরকাগজ থেকে পড়ে শোনাত। জার্মান শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আগে কেন অস্ট্রীয় শান্তি চুক্তি হওয়া সম্ভব নয়, বুদাপেস্ট-এ রাকোসি'র বক্তৃতা, কুখ্যাত প্যারী চুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের নতুন পর্যায়, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যারা নাৎসিদের সহায়তা করেছিল পশ্চিম জার্মানিতে তাদের বিচারে শিথিলতা এবং অপ্রতুলতা ইত্যাদি বিষয়ে খবরকাগজের মন্তব্যও আলোচিত হত। বাড়ী থেকে পাঠানো খাবার বেশী হয়ে গেলে পাভেল মাঝে মাঝে তার ভাগ ফ্রিডরিশকে দিত। কখনো কখনো হাসপাতালের খাবারের ভাগও দিত।

কিন্তু ওরা যত নিচু গলাতেই কথা বলুক না কেন একটা অশান্তি লেগেই থাকত কারণ শুলুবিন সব সময় ওদের কথা শুনতে পেত। নির্বাক প্যাঁচা-চোখো ফ্রিডরিশের পরের বেডে স্থির হয়ে বসে থাকে। যবে থেকে ওয়ার্ডে ওর আগমন ঘটেছে ওর উপস্থিতি ভোলা অসম্ভব হয়ে রয়েছে। বড় বড়, ফোলা ফোলা চোখে যেমন করে চেয়ে থাকে, মনে হয় ওসব কথা শোনে। যদি বা চোখ পিটপিট করে ত' মনে হয়, ও আপত্তি জানাচ্ছে। ওর উপস্থিতি পাভেলের মনের ওপর এক অন্তহীন চাপের কাজ করে। পাভেল ওর মনের কথা, নিদেন ওর কিসের অসুখ তা জানার চেষ্টা করেছে। শুলুবিন জবাবে দু'একটা বিষাদময় কথার বেশী বলেনি। এমন কি পাভেলের টিউমার সম্পর্কে কোন কথা জানতেও ওর ইচ্ছে নেই।

আর শুলুবিন যখন বসে তখনো আর সবার মত আরাম করে বসে না। টানটান হয়ে বসে, যেন বসাও খুব কষ্টসাধ্য পরিশ্রম। ও যেন সদা সজাগ। ওর টানটান হয়ে বসাও যেন ওর সদা সজাগ ভাব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। বসে থাকতে থাকতে ক্লান্তি এলে মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়ায়। ওর চলতেও কষ্ট বোধ হয়। কিছুক্ষণ বেসামাল হয়ে চলার পর, এক নাগাড়ে আধঘণ্টার মত সময় নিশ্চল এবং ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুলুবিনের এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও পাভেলের একই রকম অদ্ভুত আর কষ্টকর লাগে। শুলুবিন নিজের বেডের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, কারণ দরজা আড়াল হয়ে যাবে। একই কারণে চলাচলের পথে দাঁড়াতে পারে না। ও তাই ওলেগ

আর ভাদিমের জানলার মাঝখানের জায়গাটা বেছে নিয়েছে। ওটা ওর প্রিয় জায়গা। ও যুগ যুগান্ত ধরে ঐভাবে শত্রুপক্ষের সান্ত্রীর মত দাঁড়িয়ে থেকে পাভেল যা কিছু খায়, করে বা বলে তার সবই লক্ষ্য করে, কিন্তু ওর পিঠ দেওয়ালে ঠেকে না।

শুলুনিন আজ রাউণ্ডের পর ঐখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর সেখান থেকে ভাদিম আর ওলেগের দৃষ্টি বিনিময় লক্ষ্য করেছে।

ওলেগ্ আর ভাদিমের বেড দুটো এমনভাবে রাখা যে ওদের দৃষ্টি বিনিময় ঘটে যায়, যদিও ওরা খুব একটা কথাবার্তা বলে না। প্রথমতঃ দুজনেই এত মনমরা যে বিশ্রম্ভালাপের মত শক্তি নেই। দ্বিতীয়তঃ ভাদিম কয়েক সপ্তাহ আগে সকলকে এই বলে থামিয়ে দিয়েছেঃ "কমরেডগণ, হাজার বছরের শান্ত কথা-বার্তা কিংবা পঁচাত্তর বছরের চিল্লাচিল্লিতে যে শক্তি ব্যায়িত হয়, সে শক্তি একটা গ্লাসে ধরে রেখে দিতে পারলে এক গ্লাস জল গরম হয়ে যেতে পারে। অতএব, আপনারা বুঝতেই পারছেন, গল্প-গুজব তেমন লাভদায়ী কাজ নয়, তাই নয়?"

তাছাড়া একজনের মন্তব্যে দেখা যায় অপর একজন আহত হয়েছে, সে মন্তব্য যত অনিচ্ছাকৃতই হোক না কেন। ভাদিম ওলেগ্‌কে বলেছিল, "তোমার যুদ্ধে লড়াই করা উচিত ছিল। তুমি যে কেন লড়োনি, আমি বুঝতে পারি না।" ওলেগ্ ঠিক তখনই ভাদিমকে নিজের লড়াইয়ের ইতিহাস শোনাতে চায়নি। ওলেগ্ ভাদিমকে বলেছিল, "ওরা কার জন্য সোনা জমিয়ে রাখছে, শুনি? তোমার বাবা ত' দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তবে ওরা তোমাকে সোনা দেবে না কেন?"

ওলেগ্ ঠিকই বলেছে। ভাদিমেরও ঐকথা মনে এসেছিল এবং ও মনে মনে নিজেকে ঐ প্রশ্ন করেছে। কিন্তু একেবারে অপরিচিত কারো থেকে ঐ কথা শুনতে ভাল লাগে না। মাত্র এক মাস আগে ওর মা যখন ওর চিকিৎসার জন্য সোনা জোগাড় করতে কিছু প্রভাব কাজে লাগানোর চেষ্টা করছিলেন, বাপের স্মৃতিকে ঐভাবে কাজে লাগানোর জন্য ভাদিম অস্বস্তি বোধ করেছে। কিন্তু রোগের পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে গিয়ে ভাদিম উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে গিয়েছে, আর মায়ের শুভ সংবাদের টেলিগ্রামের পথ চেয়ে থাকে। প্রায়ই ভাবে, "মা যদি জিনিষটা জোগাড় করতে পারে……"। ভাদিমের এ কথাও মনে হয় যে কেবল বাপের কীর্তির সুবাদে ওর প্রাণ রক্ষা পাবে, এটা ওর নিজের প্রতি সমাজের অবিচার বৈকি। শুধু নিজের প্রতিভার দৌলতে প্রাণ বাঁচানো গেলে ও খুশি হত। দুঃখের কথা, যাঁরা ঐ সোনা বণ্টন করেন তাঁরা ওর প্রতিভা সম্পর্কে অনবহিত। যে কানায় কানায় পূর্ণ প্রতিভার ভাণ্ডার শুধু বইতে হবে কিন্তু জগতের কল্যাণে উজাড় করে দেওয়া যাবে না, তা এক বেদনাময় দায়িত্বভার ব্যতীত কিছুই নয়। ভাদিমের পক্ষে প্রতিভা স্ফুরিত এবং রূপায়িত হওয়ার আগে মৃত্যু হওয়া সাধারণ মানুষের মৃত্যুর চেয়ে অনেক

বেশী বিয়োগান্ত ঘটনা, ওয়ার্ডের আর কোন রোগীর মৃত্যুর চেয়ে বিয়োগান্ত ত' বটেই।

ভাদিমের মনে নিঃসঙ্গতার বেদনা ধক্‌ধক্‌ করে উঠল। নিঃসঙ্গতা এই কারণে নয় যে ওর মা বা গাল্‌কা ওর কাছে নেই। নিঃসঙ্গতার কারণ, অপরের বেঁচে থাকার চেয়ে ওর বেঁচে থাকা যে কত জরুরী তা না অপর রোগীরা বোঝে, না চিকিৎসকরা বোঝে, না সেই পদস্থ সরকারী কর্মীরা বোঝে যাদের মর্জির ওপর ওর বাঁচা-মরা নির্ভর করে।

আশা-নিরাশার নিরবচ্ছিন্ন দপদপানি এত বাড়ল যে ভাদিম বুঝতে পারল ও যা পড়ছে তা বুঝতে পারছে না। একটা পুরো পৃষ্ঠা পড়ে বুঝতে পারল, ও যা পড়ছে তা বুঝতে পারছে না। ছাগল যেমন পাহাড়ের মাথায় চড়েও পাহাড়ের উচ্চতা সম্পর্কে অনবহিত থাকে, সেই রকম। ও বই হাতে নিয়ে চুপচাপ বসেছিল! দেখলে মনে হ'ত পড়ছে, কিন্তু পড়ছিল না।

ওর পা-টা একটা ফাঁদে পড়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে ওর গোটা জীবন।

ভাদিম বই হাতে বসেই ছিল। দুই জানলার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল শুলুবিন, ব্যথা আর নীরবতায় নিমজ্জিত। ওলেগ্‌ শুয়েছিল, মাথা বেডের বাইরে ঝুলিয়ে। নীরব।

রূপকথার তিন সারস। চিরকালের জন্য নীরব।

তিনজনের মধ্যে শুলুবিনই নাছোড়বান্দা নীরব। অথচ আশ্চর্য কথা, ঐ শুলুবিনই হঠাৎ বলে বসল, "আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি অহেতুক দুশ্চিন্তা করছেন না? আপনার কি সত্যিই ঐ তেজস্ক্রিয় সোনা প্রয়োজন? ঐ বস্তুটিই কেন প্রয়োজন? অন্য কিছুতে কাজ চলবে না।"

ভাদিম বই থেকে চোখ তুলল। ওর গাঢ়, প্রায় কালো রঙের চোখ দুটো বিশ্বাস করতে পারছিল না যে নির্বাক বৃদ্ধটি অত লম্বা প্রশ্ন উচ্চারণ করতে পারে। ও হয়ত প্রশ্নের ধরনেও অবাক হয়ে গিয়েছিল।

নির্বাক বৃদ্ধই যে ঐ উদ্ভট প্রশ্ন করেনি একথা মনে করার কোন অজুহাত নেই। বৃদ্ধের ফোলা-ফোলা, লালচে চোখ দুটো ওর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে পিটপিট করছিল।

ভাদিমের উত্তর দিতেই হবে। ও উত্তর দিতে জানে। তবু কোন কারণে প্রয়োজনীয় জবাব দেওয়ার স্বাভাবিক প্রেরণা পেল না। ও বৃদ্ধের অনুরূপ শান্ত, অথবহ ভঙ্গীতে বলল, "ব্যাপারটা……আমি যা খুঁজছি তা অসাধারণ আকর্ষণপূর্ণ।"

অনবরত দপ্‌দপ্‌ করতে থাকা পায়ের ব্যথা যত অসহ্যই হোক না কেন, জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোদুল্যমান মাসগুলো যেভাবেই কাটুক না কেন, চাল-চলনে এমন ভাব দেখানো যেন বিপদের কোন আভাসই নেই, এমন ভাব করা যেন ওরা ক্যানসার হাসপাতালে নয় কোন স্বাস্থ্যনিবাসে আছে, এবং আত্ম-সংযম বজায় রাখায় ভাদিম তৃপ্তি পেত।

শুলুবিন বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে মেঝের তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেহ স্থির। কিন্তু থেকে থেকে অদ্ভুতভাবে মাথা নাড়ছিল, যেন কারো নাগপাশ থেকে মাথা ছাড়িয়ে নিতে চায়। অথচ পারছে না। "'আকর্ষণপূর্ণ' কথাটা বিশেষ অর্থবহ নয়," শুলুবিন বলল, "ব্যবসা-বাণিজ্যও বেশ আকর্ষণপূর্ণ। টাকা কামানো, টাকা গোণা, সম্পত্তি করা, আর নিজেকে আরাম-আয়েসে ঘিরে রাখাও বেশ আকর্ষণপূর্ণ। বিজ্ঞান চর্চায় ঐ অভিব্যক্তি প্রযুক্ত হলে স্বার্থসন্ধানী, সম্পূর্ণ অনৈতিক সাধারণ পেশাগুলোর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন পার্থক্যই থাকে না।"

ভারি উদ্ভট কথা ও'। ভাদিম কাঁধ দুটো ঝাঁকাল। "কিন্তু, আমি যা খুঁজছি তা যদি সত্যিই আকর্ষণপূর্ণ হয় তবে কি করা যাবে?" ভাদিম বলল, "যদি তা জগতের সবকিছুর চেয়ে আকর্ষণপূর্ণ হয়, তবে?"

"ওটা কি হাসপাতালের কোন কিছু, না সাধারণ জীবনের কিছু?"

"সাধারণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।"

শুলুবিন এক হাতের আঙুলগুলো সিধে করল। মটমট করে শব্দ হ'ল। "ঐ যদি আপনার প্রারম্ভিক ক্ষেত্র হয়," ও বলল, "আপনি তবে এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন না যা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাল।"

এ আরেক উদ্ভট যুক্তি। ভাদিম বলল, "নৈতিক মূল্য সৃজন বিজ্ঞানের দায় নয়। বিজ্ঞান ভৌতিক মূল্য সৃজন করে। তাতেই বিজ্ঞানের দায় শেষ হয়। সে যাকগে, কোন্ মূল্যবোধগুলিকে আপনি নৈতিক বলতে চান?"

শুলুবিন চোখ দুটো বন্ধ করল। সামান্য কিছুক্ষণ বন্ধ করেই রাখল। চোখ খুলে আবার বুজল। অবশেষে চোখ খুলে ধীরে ধীরে বলল, "শুধু সেই মূল্যবোধগুলি যেগুলির লক্ষ্য মানবাত্মা আলোকোজ্জ্বল করা।"

"বিজ্ঞানও আলোকোজ্জ্বল করে, করে না?" ভাদিম হাসল।

"মানবাত্মাকে আলোকোজ্জ্বল করে না," শুলুবিন আঙুল নেড়ে বলল, "আপনি 'আকর্ষণপূর্ণ' কথাটা ব্যবহার করেছেন। আপনি কি কখনো কোন যৌথ খামারের মুর্গীর ঘরে পাঁচ মিনিটও থেকে দেখেছেন?"

"না।"

"বেশ, তবে কল্পনা করুন——নিচু চালওলা মুর্গীর খাঁচার লম্বা সারি। জায়গাটা অন্ধকার, কারণ জানলার বদলে আছে দেওয়ালে এক চিলতে করে কাটা। জাল দিয়ে ঘেরা, পাছে মুর্গী উড়ে পালায়। এক একটি মেয়ে আড়াই হাজার মুর্গীর দেখভাল করে। মাটির মেঝে। সে মেঝেয় অনবরত মুর্গীরা আঁচড়ায়। ফলে বাতাসে এত ধুলো যে গ্যাস-মুখোস পরলে ভাল হয়। ঐ পরিবেশে মেয়েগুলির সারা দিন মুর্গীর খাদ্যের জন্য কয়লার উনুনে গেঁড়ি আর চুনো মাছ জ্বাল দিতে হয়। কি ভয়াবহ দুর্গন্ধ বেরোয় ভাবতে পারেন? মেয়েগুলোর সারা দিনে অবসর বলে কিছু নেই। গ্রীষ্মে কাজ আরম্ভ হয় ভোর তিনটেয়, শেষ হয় সন্ধ্যের কাছাকাছি। মেয়েগুলোকে

তিরিশ বছর বয়সেই পঞ্চাশ বছরের বুড়ীর মত দেখায়। এবার বলুন, ঐ মেয়েগুলোর কি ঐ কাজ আকর্ষণীয় মনে হয় ?"

ভাদিম অপ্রস্তুত। ও ভুরু কুঁচকিয়ে বলল, "আমি ঐ প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে যাব কেন ?"

"এটা কিন্তু এক ব্যবসাদারের মত জবাব হ'ল," শুলুবিন আঙুল উঁচিয়ে বলল।

"মেয়েগুলির দুর্ভোগের কারণ বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় বিকাশের অভাব," ভাদিম বলল, কারণ ও এক জোরদার যুক্তি খুঁজে পেয়েছে, "বিজ্ঞান ঠিকমত বিকশিত হলে মুরগীর ঘরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর হবে।"

"আর যতকাল বিজ্ঞান বিকশিত না হচ্ছে আপনি কিন্তু তার মধ্যে রোজই সকালে তিনটে করে ডিম খাওয়া বন্ধ রাখবেন না, রাখবেন কি ?" শুলুবিনের এক চোখ বুজে গেল বলে অপর চোখের চাউনি আরো বেশি অশুভ লাগছিল "অর্থাৎ যতকাল বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটছে না তার মধ্যে আপনি মুরগীর খামারে কাজ করতে চান না, এই ত' ?"

"ওর ঐ কাজ আকর্ষণীয় মনে হয় না," ওলেগ হেঁড়ে গলায় বলে উঠল। ওর মাথা তখনো বেডের পাশ দিয়ে ঝুলছিল।

পাভেল ইতিপূর্বে কৃষি-কাজ সম্পর্কে শুলুবিনের বেয়াড়া মতামত লক্ষ্য করেছে। ও খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে কিছু বলছিল, শুলুবিন তাতে বাধা দিয়েছিল, এমন কি পাভেলের ভুল সংশোধনও করেছিল। পাভেল এবার শুলুবিনকে খোঁচানোর সুযোগ হারাতে চাইল না। "আচ্ছা, আপনি কি তিমিরিয়াজেভ্ মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক ?" [তিমিরিয়াজেভ্ মহাবিদ্যালয় সোভিয়েত দেশে সর্বাধিক সুখ্যাত কৃষি মহাবিদ্যালয়]

শুলুবিন চমকিয়ে উঠল। ও পাভেলের দিকে ফিরে বলল, "হ্যাঁ, আমি তিমিরিয়াজেভের স্নাতক।"

শুলুবিন আর কিছু বলল না। একটু গর্বিত এবং রুষ্ট ভাব। ডানা কাটা পাখী যেমন করে ওড়ার চেষ্টা করে, ও তেমনি টলমল করতে করতে নিজের বেডে ফিরে চলল। ওর চাল-চলন একেবারে খাপছাড়া।

"তাহলে আপনি গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করেন কেন ?" বিজয়ী পাভেল ওকে খুঁচিয়ে চলল।

কিন্তু শুলুবিন একবার মুখ বুজলে আর খোলে না। কাঠের গুঁড়ির মত নির্বাক হয়ে গেল।

যে মানুষ জীবনে ওপরে ওঠার পরিবর্তে নিচে নেমে যায় পাভেল তাকে একটুও দেখতে পারে না।

শুধু দুর্ভাগ্য

লেভ্ লিওনিডোভিচ্‌কে প্রথম দেখে কাজের মানুষ মনে হয়েছিল। লেভের রাউণ্ডের সময় ওলেগের তেমন কিছু করার ছিল না। ও লেভ্‌কে ভাল করে লক্ষ্য করেছিল। লেভের অনেক কিছুই আছে যা ভাল লাগে। যে টুপিটা সব সময় পরে থাকেন তা নিশ্চয় কোন আয়নার সামনে পরা নয়। অত্যন্ত লম্বা লম্বা হাত দুটো প্রায়ই পেছনে বোতামওলা কোটের সামনের পকেটে গুঁজে রাখেন। ঠোঁট দুটো কোণের দিকে একটু বাঁকা, যে জন্য মনে হয় এই বুঝি শিস্ দেবেন। শক্তিশালী, ভয় পাওয়ানো গোছের চেহারা হলেও রোগীদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশার সুরে কথা বলেন। ওলেগ্ তাই ভেবেছিল লেভের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বললে, দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করবে, যার উত্তর মহিলা ডাক্তারদের দেওয়ার ইচ্ছে বা ক্ষমতা নেই।

কিন্তু লেভের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় না। রাউণ্ডের সময় উনি অপারেশন হয়েছে বা হবে এমন ধরনের রোগীদের ছাড়া কারো দিকে তাকান না। রশ্মি-চিকিৎসার রোগীদের বেডের সামনে দিয়ে এমন ভাবে চলে যান যেন বেডগুলো শূন্য পড়ে আছে। বারান্দা বা সিঁড়িতে কেউ 'সুপ্রভাত' জানালে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন বটে, কিন্তু মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া লেগে থাকে। ভদ্রলোকের কখনই অবসর থাকে না।

একদিন লেভ্ এক রোগী সম্পর্কে কথা বলছিলেন। রোগীটি তার কৃত অপরাধ প্রথমে পুরোপুরি অস্বীকার করলেও পরে কবুল করেছিল। লেভ্ হেসে, বললেন, "ও অবশেষে 'গান গাইল,' কি বলো?" ওলেগ্ ঐ কথা দুটোয় খুব অবাক হয়েছিল। কথা দুটোর ঐ প্রয়োগ ত' সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়।

ওলেগ্ ইদানিং হাসপাতালে আর তেমন ঘুরে বেড়াত না। তাই প্রবীণ ডাক্তারদের সঙ্গে কমই দেখা হ'ত। শুধু একদিন ও দেখল লেভ্ অপারেশন থিয়েটারের লাগোয়া ছোট্ট ঘরটার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তার মানে ঘরে আর কেউ নেই। ওলেগ্ সাদা রঙ করা কাঁচে টোকা দিয়ে, ভেতরে ঢুকল। লোকে সাধারণতঃ অল্প কিছুক্ষণের জন্য বসতে হলে যে ভাবে বসে লেভ্ তেমনি করে আড় ভাবে একটা টুলে বসেছিলেন। কিছু লিখছিলেন।

"কি ব্যাপার?" লেভ্ মাথা তুলে বললেন। কিন্তু বিশেষ অবাক হয়েছেন মনে হ'ল না। স্পষ্টতঃ যা লিখবেন সে সম্পর্কে তখনো ভাবছিলেন।

সবারই সর্বদা এত তাড়া! এক একটি মানুষের বাঁচা-মরার সিদ্ধান্ত নিতে এদের এক মিনিটও লাগে না।

"মাফ করুন ডাঃ লিওনিডোভিচ্," ওলেগ্ যথাসম্ভব নম্রভাবে বলল, "আমি জানি আপনি খুবই ব্যস্ত, কিন্তু আপনি ছাড়া আর কেউ নেই তাই·· ·আমার জন্য দুটো মিনিট সময় ব্যয় করতে পারবেন?"

লেভ্ মাথা হেলালেন বটে, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল যে উনি তখনো নিজের সমস্যার কথাই ভাবছিলেন।

"এখন আমার হর্মোন চিকিৎসা চলছে……পেশীর মাধ্যমে সিনেস্ট্রল ইন্‌জেকশন দেওয়া হচ্ছে, তার মাত্রা হ'ল · ···" ওলেগ্ ডাক্তারদের সঙ্গে যথাযথ ডাক্তারি ভাষায় কথা বলে গর্ব বোধ করত। এটাই ছিল ওর দাবীর ভিত্তি যে ডাক্তাররা ওর সঙ্গে একেবারে খোলাখুলি ভাবে কথা বলবেন। "আমি জানতে চাই, হর্মোন চিকিৎসার প্রভাব কি পুঞ্জীভূত আকারে দেখা দেয়?"

ওলেগ্ যে একশো কুড়ি সেকেণ্ড কাজে লাগানোর অনুমতি পেয়েছিল তার কুড়ি সেকেণ্ড ওর নিজের বক্তব্য উপস্থিত করতেই ব্যয় হ'ল। বাকি সেকেণ্ড-গুলোর কর্তৃত্ব আর ওর ওপর রইল না। ও নিজের হাতদুটো পেছনে জড়ো করে নীরবে দাঁড়াল। রোগা, লম্বা ওলেগ্‌কে ঈষৎ কুঁজো দেখাচ্ছিল।

লেভের ভুরু কুঁচকিয়ে গেল। মুখভাব বদলিয়ে গেল। "না, আমার তা মনে হয় না। তা হওয়া উচিত নয়," লেভের বক্তব্য বিশেষ নির্ণায়ক ধরণের হ'ল না।

"কি কারণে বলতে পারব না, কিন্তু আমার মনে হয় হর্মোন চিকিৎসার প্রভাব পুঞ্জীভূত আকারে দেখা দেয়।" ওলেগের বক্তব্য এমন শোনাল যেন ঐ প্রভাবটি পুঞ্জীভূত আকারে দেখা দিলেই ও খুশি হয়, কিংবা ও লেভের মতামতে আস্থা রাখতে পারছে না।

"না, পুঞ্জীভূত হওয়া উচিত নয়, সত্যিই উচিত নয়," লেভের বক্তব্য এবারও নির্ণায়ক শোনাল না। তার কারণ, হয়ত ঐ বিষয়টি ওঁর বিশেষ দক্ষতার পরিধি বহির্ভূত কিংবা উনি এখনো নিজের মনকে ঐ নতুন বিষয়ে যুক্ত করতে পারেননি।

"ঐ কথাটা জানা আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন," ওলেগ্ বলল। বিষয়টিতে ও যে গুরুত্ব আরোপ করতে চায় তা ওর মুখভাবে প্রতিফলিত। "এই চিকিৎসার পর কি আমি ক্ষমতা হারাব……স্ত্রীলোক সম্পর্কিত ক্ষমতা? না, অল্প কিছুক্ষণের পর ঐ অবস্থা কেটে যাবে? ইন্‌জেকশন দেওয়া হর্মোনগুলো কি আমার দেহে চিরস্থায়ী হবে? কোন পাল্টা ইন্‌জেকশনের সাহায্যে কি হর্মোন চিকিৎসার প্রভাব বাতিল করা সম্ভব?"

"না, আমি সে পরামর্শ দেব না। আপনি যা বলছেন, তা সম্ভবপর নয়," লেভ্ বললেন। লেভ্ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুলওলা ওলেগ্‌কে দেখছিলেন। বেশী করে দেখছিলেন ওর চিবুকে কাটা দাগ। অদ্ভুত ধরনের কাটা দাগ, যেন সবে সৃষ্ট হয়েছে। এ রকম কাটা দাগওলা একজনকে সম্প্রতি সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে এনেছিল। ওলেগ্ই যদি এই রকম একটা নতুন ক্ষত নিয়ে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে হাজির হ'ত, সেক্ষেত্রে উনি কি করতেন? "কিন্তু আপনার পাল্টা ইন্‌জেকশন নেওয়া কেন প্রয়োজন, আমি বুঝতে পারছি না," লেভ্ বললেন।

"আপনি বুঝতে পারছেন না?" ওলেগের সন্দেহ হ'ল, চিকিৎসা সংক্রান্ত

নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী লেভ্ কি চাইছেন যে রোগী তার ভাগ্য মেনে নিক ? ওলেগ্ বলল, "আপনি সত্যিই বুঝতে পারছেন না ?"

ওরা দু'জন এতক্ষণে দু'মিনিট সময় আর চিকিৎসক-রোগী সম্পর্কের সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছিল। এমন সময় লেভ্ হঠাৎ নিজের স্বাভাবিক ভারিক্কি ভাব, যা ওলেগের ভাল লেগেছিল, ত্যাগ করে, পুরনো বন্ধুর মত বললেন, "আমার কথা শুনুন, আপনি কি সত্যিই মনে করেন মেয়েরা মানব জীবনের সর্বাঙ্গ সুন্দর ফুল ? আপনি কি জানেন না যে কিছু পরেই মেয়েদের ওপর বেজার হয়ে যেতে হয়……ওরা যা পারে তা হ'ল, প্রকৃত প্রাণ-মন দিয়ে কোন কাজ করা পণ্ড করে দিতে।"

লেভেব বক্তব্য আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। কণ্ঠস্বরে ক্লান্তির আভাস। ওঁর নিজের জীবনের সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের কথা মনে পড়ছিল যখন উনি এক চূড়ান্ত প্রয়াসের শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, সম্ভবতঃ এই কারণে যে তাঁর শক্তি ঠিক এইভাবে বিপথগামী হয়েছিল। কিন্তু ওলেগ্ ওঁর মনোভাব আদৌ বুঝতে পারল না। ও ত' যথেষ্টর বেশী মেয়ে পাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। ও শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা হেলাল। ওলেগ্ বলল, "আমি যা বলেছি তার চেয়ে বেশী প্রাণ-মন নিয়োজিত করার মত কিছু আমার জীবনে নেই।"

আর যাহোক এ কথোপকথন ক্যানসার ওয়ার্ডের কাজের নিঘণ্টের অন্তর্ভূক্ত নয়। বিশেষতঃ হাসপাতালের অপর এক বিভাগের ডাক্তারের সঙ্গে জীবনের অর্থ সম্পর্কে আলোচনা ত' নির্ঘণ্ট বহির্ভূত বটেই। রোগাটে এক মেয়ে সার্জন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে, অনুমতি না চেয়েই ভেতরে ঢুকে এল। মেয়েটির পরনে হাইহিল শু। ও চললে, সারা দেহ দোলে। ও লেভের পাশে এসে দাঁড়াল। পরীক্ষাগারের এক রিপোর্ট মেলে ধরতে ও এমন ভাবে ঝুঁকল যেন লেভের গায়ে পড়ে আর কি। ও বলল, "দেখুন, ওভ্দিয়েঙ্কো'র রক্তের শ্বেত কণিকার কোষ গণনার ফল দাঁড়িয়েছে দশ হাজার।" মেয়েটির কয়েকটি লাল অলকগুচ্ছ লেভের মুখের সামনে দুলে উঠল। যেন লালচে ধোঁয়া।

"তা কি হয়েছে ?" লেভ্ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "বোঝা যাচ্ছে যে লিউকোসাইটোসিস-এর পরিস্থিতি সুবিধাজনক নয়। অতএব যে ফোলা দেখা গিয়েছে তা রশ্মি-চিকিৎসার সাহায্যে দমাতে হবে।"

মেয়েটির কথা থামেনা। ওর কাঁধ প্রায়ই লেভের বাহুতে ঠেকে যাচ্ছিল! লেভ্ যে কাগজটা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তা পড়েই রইল। কলম ওঁর হাতেই ধরা। ওলেগের এখন চলে যাওয়ার কথা। পরিকল্পিত নিভৃত আলোচনা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বাধা পেয়ে থেমে গিয়েছে।

মেয়েটি মুখ ফেরাল। ও এ্যাঞ্জেলিকা। এ্যাঞ্জেলিকা ওলেগ্‌কে ওখানে দেখে অবাক হ'ল। লেভ্‌ও ওলেগের দিকে তাকালেন, তাঁর চোখে কৌতুকের

আভাস। ওঁর মুখভাব দেখে ওলেগ্ উৎসাহিত হ'ল। বলল, "আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কি 'চাগা' নামে বার্চ গাছের ছত্রাক সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, শুনেছি," লেভ্ বললেন। "চাগা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?"

'বলা মুশকিল। কয়েকটি বিশেষ ধরনের টিউমার, যেমন পেটের টিউমারে কাজ হয় জানি। মস্কোয় ত' সবাই চাগার প্রশংসায় প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। শুনেছি মস্কোর আশপাশে প্রায় দু'শো কিলোমিটার এলাকার বন সাফ হয়ে গিয়েছে।"

এ্যাঞ্জেলিকা টেবিল থেকে ওর কাগজটা তুলে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হ'ল। অপরকে হেয় জ্ঞান করা, অ-নম্র ভাব। ও হাঁটলে সারা দেহ দোলে, যা দেখে চোখ ফেরানো শক্ত।

এ্যাঞ্জেলিকা গেল। কিন্তু যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ওলেগের প্রশ্নের আংশিক জবাব মিলেছে বটে, কিন্তু জীবনে নারীর অবদান সম্বন্ধে আলোচনায় আবার ফিরে আসার স্থান নেই।

কিন্তু লেভের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, ক্ষণিক কৌতুকময় চাউনি ওলেগের তৃতীয় প্রশ্নের রাস্তা করে দিয়েছিল। এ প্রশ্নটা ও ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে ফেলেছিল। "আমার ধৃষ্টতা মাফ করবেন, ডাঃ লিওনিডোভিচ্" ওলেগ্ গলা নামিয়ে, এক চোখ ছোট করে বলল, "আপনি কি কখনো এমন জায়গায় ছিলেন যেখানে লাগাতার 'নাচ আর গান' চলে?"

লেভ্ সজীব হয়ে উঠলেন। "হ্যাঁ, ছিলাম।"

"তাই নাকি?" ওলেগ্ অবাক। তাহলে ত' ওরা দু'জন একই শ্রেণীর মানুষ। "আপনি কি জন্য সাজা পেয়েছিলেন?"

"আমি সাজা পাইনি। সাধারণ নাগরিক হিসেবেই আমাকে ওখানে কাজ করতে বলা হয়েছিল।"

"ওঃ, সাধারণ নাগরিক হিসেবে!" ওলেগ্ হতাশ হ'ল। ওরা তাহলে একই শ্রেণীর মানুষ নয়।

"আপনি কি করে আন্দাজ করলেন?" লেভ্ কৌতুহলী হলেন।

"আপনার ব্যবহৃত একটা কথা থেকে। আপনি একজনের সম্পর্কে মন্তব্য করছিলেন, 'গান' গেয়েছে, যার অর্থ সে অপরাধ স্বীকার করেছে।"

লেভ্ হাসলেন। "আমি কিছুতেই অভ্যস্ত বুলি ভুলতে পারছি না!"

সমান হোক বা না হোক, দু'জনের বেশ কিছু মিল দেখা গেল। "আপনার কি অনেক দিন ওখানে থাকতে হয়েছিল?" ওলেগ সহজভাবে প্রশ্ন করল। ও এতক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে ওকে অত রুগ্ন লাগছিল না।

"প্রায় তিন বছর ছিলাম। ফৌজের চাকরি শেষ হওয়ার পর ওরা আমাকে

ওখানে পাঠিয়েছিল। ওখানকার অভ্যাসগুলো ছাড়তে পারিনি।"

লেভের শেষ মন্তব্যটা প্রয়োজন ছিল না। তিনি শিবিরে যে কাজ করতেন তা অন্য জায়গার কাজের মতই সম্মানার্হ। তবু কেন যে লোকগুলো অত কৈফিয়ৎ দিতে চায়, কে জানে। মানুষের মনে একটা নিশানা এখনো রয়েছে। সে নিশানাটা মানুষের অজ্ঞাতে কাজ করে চলে। বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিটের মত ছোটখাটো গোলযোগে থমকিয়ে দাঁড়ায় না।

"আপনি ওখানে ঠিক কি কাজ করতেন?" লেভ্ বললেন, "অসুস্থ বন্দীদের দেখাশোনা করতাম।"

তাই ত', লেভ্ও দুবিনস্কায়া'র মত জীবন-মৃত্যুর অধীশ্বর ছিলেন। তফাৎ হ'ল দুবিনস্কায়া তাঁর কাজের জন্য সাফাই গাওয়া প্রয়োজন মনে করতেন না, আর লেভ্ সে চাকরিই ছেড়ে দিয়েছেন।

"আপনি তাহলে যুদ্ধের আগেই মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করেছিলেন?" ওলেগ্ আলাপচারী থামাতে চায় না। এই প্রশ্নটি প্রয়োজন না থাকলেও ও যে প্রশ্ন তুলল, তার কারণ ও কারাগারে থাকতে ঐ অভ্যাস আয়ত্ত করেছিল। যারা কুঠরির খাবার দেওয়ার ছোট্ট দরজা ঠং ঠং করে যখন খাবার বিলি করতে আসত সেই সুযোগে একেবারে অপরিচিত বন্দীর সঙ্গেও আলাপ জমিয়ে নিতে হ'ত। পরস্পরের জীবন পর্যালোচনা শুরু হ'ত এই প্রশ্ন দিয়ে, "তোমার বয়স কত ভাই?"

"না, আমি পাশ করিনি। ডাক্তারি পড়ার চতুর্থ বছরে স্বেচ্ছাসেবী হয়ে লড়াইয়ে গিয়েছিলাম।" লেভ্ উঠে দাঁড়ালেন। লেখা অসম্পূর্ণ পড়ে রইল। উনি এগিয়ে ওলেগের ক্ষত আঙুল দিয়ে অনুভব করে বললেন, "এ জখম কি শিবিরেই হয়েছিল?"

"হ্যাঁ"। "এই অপারেশনটা খুব সুন্দর হয়েছে। ডাক্তারও কি এক বন্দী ছিলেন?" লেভ্ বললেন।

"হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন।" লেভ্ বললেন, "ডাক্তারের নাম অপনার মনে নেই? কোরিয়াকভ্ নয় ত'?"

"আমি জানি না। আমরা তখন আরেক শিবিরে চালান হচ্ছিলাম। যে কোরিয়াকভের কথা আপনি বললেন, তাকে ওখানে পাঠিয়েছিল কেন?" ওলেগ্ বলল।

"ওকে বন্দী করা হয়েছিল এই জন্য যে, ওর বাপ জারের ফৌজে এক কর্ণেল ছিল।"

এমন সময় জাপানী-চোখ নার্সটি এসে লেভ্‌কে ড্রেসিং-এর কামরায় ডেকে নিয়ে গেল। ওলেগ্ আবার ওর স্বভাবসিদ্ধ কুঁজো ভঙ্গীতে বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলল।

ওলেগ্ দুটি জীবনের রূপরেখা জেনেছে। বাকিটুকু ও কল্পনা করে নিতে পারবে। নির্বাসনে পাঠানোর কত হরেক রকমের ফিকির ·····তার চেয়েও

বড় কথা, এই হাসপাতালের বারান্দা কিংবা বাগানে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে, কিংবা স্রেফ বেডে শুয়ে থাকলেও, এমন কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, যাকে দেখে ভাবাও যায় না যে সে বলতে পারে, "এই যে ভাই, আপনার কোটের ল্যাপেলের ভেতর দিকটা দেখান ত'।" আর ঐ কোটের ল্যাপেলের ভেতর দিকেই লেখা থাকে ওদের গোপন গোষ্ঠী পরিচয়। ওলেগ্ সেই গোষ্ঠীর এক সদস্য, এক অংশ, এবং ঐ লোকটিও তা জানবে। এ ধরণের মানুষ ক'জন আছে? তা জিজ্ঞেস করেই বা কি হবে? ওরা সবাই বোবা হয়ে গিয়েছে। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না। সব গোপন হয়ে আছে।

কি উদ্ভট কথা, এমন দিনও কখনো আসবে যখন মেয়েরা নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে? পুরুষের ত' মেয়ের আশ কখনই মেটে না। ওকথা কল্পনাও করা যায় না।

যাহোক, লেভের সঙ্গে কথা বলার পর ওলেগের আনন্দিত হওয়ার মত কিছুই ঘটেনি। লেভের অস্বীকৃতিতে তেমন জোর ছিল না, যে কারণে ওলেগের প্রবোধিত হওয়া সম্ভব নয়। ধরে নিতে হবে, ও সব খুইয়েছে। সবকিছু……

ওলেগের মনে হ'ল ওর অবস্থা ফাঁসির হুকুম মকুব হয়ে যাবজীবন কারাদণ্ড হওয়া বন্দীর মত। ও বেঁচে থাকবে। কিন্তু কেন, তা জানে না।

ওলেগ্ কোন্ দিকে চলেছে তা ভুলে গিয়েছিল। নিচতলার বারান্দায় থেমে একটু ভেবে নিল। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল।

ও যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে তিনটে ঘরের পরে একটা দরজা খুলে গেল। ছোট-খাটো আকারের, সাদা কোট পরা কেউ বেরিয়ে এল। কোমর অত্যন্ত সরু। সঙ্গে সঙ্গে চেনা মনে হ'ল। ভেরা!

ভেরা ওর দিকেই আসছিল। ঠিক সোজাসুজি নয়। দু'টো বাঁক ঘুরে আসছিল। ওলেগ্ এগোল না। ওর ভাবতে হবে।

ওর শেষ রাউণ্ডের পর থেকে তিনদিন হ'ল ভেরার ব্যবহার শুকনো, কেজো হয়ে আছে। চাউনিতে বন্ধুত্বের ঝিলিক নেই।

ওলেগ্ প্রথমে ভেবেছিল, চুলোয় যাক ভেরা! ওলেগ ও ঐ রকম ব্যবহার করবে। ভেরার মান ভাঙাবে না। কিন্তু ভেরাকে দুঃখ দিতে বিশ্রী লাগে। ওলেগের নিজের জন্যও খারাপ লাগে। শেষে দুজনে কি অচেনা হয়ে যাবে?

কিন্তু কার দোষ? ভেরাই ত' ইন্‌জেকশনগুলোর বিষয়ে সত্যি কথা বলেনি। কোথায় ওলেগেরই রাগ করা উচিত, তা নয় রাগ করে রয়েছে ভেরা।

ওলেগ্‌কে না দেখে, ওলেগের দিকে না তাকিয়ে ভেরা কাছে কাছি এগিয়ে এল। ওলেগ্ নিজের অজ্ঞাতে যাচঞা করার ভঙ্গীতে বলল, "ভেরা কর্নিলিয়েভ্না… …আপনি কি আমাকে রক্ত প্রদান করবেন……?" ওলেগ্ যেন এক অনুগ্রহপ্রার্থী। কিন্তু তবু ওর খারাপ লাগছিল না।

"আমি ত' জানতাম আপনি রক্ত নিতে নারাজ," ভেরা আগের মত কঠোর

ভঙ্গীতে জবাব দিলেও ওর সুন্দর, গাঢ়-বাদামী চোখ দুটো ঈষৎ সংশয়ে দোদুল্যমান হ'ল।

ঐ কথা বলার জন্য ভেরাকে দোষ দেওয়া চলে না। অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের মত ওরা কত দিন হাসপাতালে থাকতে পারবে?

"না, আমার ভালই লেগেছিল। আমি আরো রক্ত নিতে চাই," ওলেগ্ হাসল। হাসলে ওর চোয়ালের কাটা দাগটা অনেক ছোট দেখায়।

ওলেগ্ এখন আপোষ করতে ইচ্ছুক। চিড় খাওয়া সম্পর্ক ধীরে শুধরিয়ে নেওয়া যাবে। ভেরার চোখে কি যেন নড়ছে। হয়ত অনুশোচনা।

"হয়ত আগামীকাল কিছু নতুন রক্ত আসবে," ভেরা বলল। ও যেন এক হাতে এক অদৃশ্য থামে ভর দিয়ে কথা বলছিল, যে থামটা ভারের চাপে ভেঙে পড়ছিল।

"কিন্তু রক্ত প্রদানের ব্যবস্থাপনায় আপনার থাকতে হবে। আপনি না থাকলে আমি রক্ত নেব না," ওলেগের কথায় আন্তরিকতার সুর।

ভেরা মাথা নাড়ল। ওলেগের দিকে না তাকানোর, আর প্রসঙ্গটা এড়ানোর চেষ্টা। "সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল," ও বলল।

ভেরা চলে গেল। যত ত্রুটিই থাক, তবু ভেরা অপূর্ব। পরক্ষণেই ওলেগের মনে হ'ল চিরকালের জন্য নির্বাসিত, মারাত্মক রোগগ্রস্ত মানুষ হিসেবে ওর ভেরার কাছে কি কাম্য হতে পারে? ভেরার সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার কি লক্ষ্য? ভাবতে ভাবতে, ওলেগ্ কোথায় চলেছিল তা ভুলে গেল।

ওঃ, হ্যাঁ, ও ডিওম্‌কার সঙ্গে দেখা করতে চলেছিল।

দু'টি বেডের ছোট্ট ঘরে ডিওম্‌কা একাই শুয়েছিল। ওর পড়শী ছাড়া পেয়ে হাসপাতাল থেকে বিদায় নিয়েছে। তার জায়গায় অপারেশন থিয়েটার থেকে আগামীকাল একটি রোগী আসবার কথা। ততক্ষণ ঘরটায় ডিওম্‌কা একাই আছে।

এর মধ্যে একটা সপ্তাহ চলে গিয়েছে। তার সঙ্গে গিয়েছে ডিওম্‌কার পা কেটে বাদ দেওয়ার প্রাথমিক দুর্ভোগ। অপারেশন অতীত স্মৃতি হতে থাকলেও পা এমন কষ্ট দিচ্ছে যেন কেটে বাদ দেওয়া হয়নি।

ডিওম্‌কা ওলেগ্‌কে দেখে খুশি হ'ল। ওলেগ্‌কে বড ভাইয়ের মত অভিবাদন করল। ডিওম্‌কার আগের ওয়ার্ডের বন্ধুরা ত' আত্মীয়ের মত বটেই। কয়েকজন রোগিনী ওকে খাবার-দাবার পাঠিয়েছে। খাবারগুলো টেবিলের ওপর তোয়ালে ঢাকা দিয়ে রাখা আছে। নবাগত রোগীরা কেউ এসে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেনি।

ডিওম্‌কা চিৎ হয়ে, অপারেশন হওয়া পা মেলে শুয়েছিল। অবশ্য পা না বলে উরু'র কিছু বেশী অংশ বলাই সঙ্গত। পাগড়ীর মত অতিকায় ব্যাণ্ডেজে ঢাকা।

"এসো, ওলেগ্, কেমন আছ?" ডিওম্‌কা ওলেগের হাত ধরে বলল, "এখানে বসো। ওয়ার্ডে নতুন কি খবর আছে, বলো।"

ওপরতলার ওয়ার্ড, যা ও সম্প্রতি ছেড়ে এসেছে, তাই ডিওম্‌কার জগত। নিচতলার নার্স আর পরিচারিকারা ভিন্ন ধরনের। তেমনি তাদের কাজের নিয়ম। কে কোন্ কাজ করবে তা নিয়ে খিটিমিটি লেগে থাকে।

"ওয়ার্ডের কার খবর শুনতে চাও, বলো?" ওলেগ্ ডিওম্‌কার হলুদ হওয়া মুখের দিকে চেয়ে বলল। কপোলের রেখা মিলিয়ে গিয়েছে। ভুরু, নাক আর চিবুক অনেক তীক্ষ্ম দেখাচ্ছে। "ওয়ার্ডে কোন পরিবর্তন ঘটেনি," ওলেগ্ বলল।

" 'গোপন ব্যক্তিগত তথ্য বিভাগ' এখনো আছে?" "আছে, ডিওম্‌কা।"

"ভাদিমের কি খবর?" "ভাদিম বিশেষ ভাল নেই। সোনা জোগাড় করা যায়নি। ভয় হচ্ছে, ভাদিমের হয়ত দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গ দেখা দেবে।"

ডিওম্‌কা'র ভুরু দুশ্চিন্তায় কুঁচকিয়ে গেল। ও বলল, "আহা, বেচারী।" "ডিওম্‌কা, তুমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও কারণ তোমার পা সময়মত কেটে বাদ দিয়েছে।"

"কিন্তু এখনো আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গ দেখা দিতে পারে।" "না, ডিওম্‌কা, আমার তা মনে হয় না।"

কিন্তু অত জোর দিয়ে কে বা বলতে পারে। যদি একটা মাত্র ক্ষতিকারক কোষও দেহের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে তাকে ডাক্তাররা সনাক্ত করবেন কি করে? কি করে জানবেন ঠিক কোন্‌খানে সে বাসা বেঁধেছে।

"তোমার কি এখন রশ্মি চিকিৎসা চলছে?" ওলেগ্ বলল। "ওরা আমাকে একটা ছোট্ট ঠেলাগাড়ীতে শুইয়ে দেয়। আর কি করে জানি না।"

"তোমার রাস্তা এখন পরিষ্কার, ডিওম্‌কা। সেরে উঠে একটা ক্রাচ্ ব্যবহার করতে শিখো।"

"একটায় হবে না দু'টো লাগবে।"

বেচারী, এত অল্প বয়সেই এত সব ভেবে রেখে দিয়েছে। অপারেশনের আগেও ও বয়স্কদের মত ভ্রূকুটি করত। এর মধ্যে যেন আরো বয়স বেড়ে গিয়েছে।

"তোমার জন্য ক্রাচ্ কোথায় তৈরি হবে, ডিওম্‌কা? এই হাসপাতালেই তৈরি হবে?" "হ্যাঁ, অর্থোপেডিক বিভাগে।"

"ক্রাচের জন্য কি দাম দিতে হবে?" "দাম মাফ হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। আমার দাম দেওয়ার মত পয়সা কোথায়?"

ওরা দু'জনই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দীর্ঘশ্বাস ফেলাই ওদের পক্ষে স্বাভাবিক। ওদের জীবনে কতটুকু আর আনন্দ আছে?

"আগামী বছর স্কুলের পড়া শেষ করবে কি করে, ডিওম্‌কা ?" "ওটা করতেই হবে, নইলে আমি বাঁচব না।"

"তুমি কি করে রোজগার করবে, ডিওম্‌কা ? তখন ত' কারখানায় কাজ করতে পারবে না·····" "এরা আমাকে প্রতিবন্ধী প্রমাণপত্র দেবে। দ্বিতীয় শ্রেণী, না তৃতীয় শ্রেণীর প্রমাণপত্র পাব জানি না।"

"তৃতীয় শ্রেণীটা কোন্ ধরনের ?" ওলেগ্ প্রতিবন্ধীর শ্রেণীবিভাগ জানত না। "ঐ শ্রেণীর প্রতিবন্ধী ভাতা রুটি কেনার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ওতে চিনি কেনার পয়সা জোটে না।"

ডিওম্‌কা অপারেশনের পর সত্যিই সাবালক হয়ে গিয়েছে। সব ভেবে রেখেছে। টিউমার ওকে ডুবিয়ে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করলেও, ও বারবার ভেসে উঠে লক্ষ্যের নিকটতর হয়ে চলেছে। "তুমি কি বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়তে চাও ?"

"আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব," ডিওম্‌কা জানাল।

"বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পড়বে, সাহিত্য ?" "ঠিক, সাহিত্য।"

"আমার কথা শোনো, ডিওম্‌কা। আমার সুচিন্তিত মত, সাহিত্য পড়া মানে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া। তার চেয়ে রেডিও সেট তৈরী করতে শেখো না। ওটা বেশ শান্ত জীবন। সব সময় কিছু রোজগার পেতে থাকবে।'

"চুলোয় যাক রেডিও!" ডিওম্‌কা বলে উঠল, "আমি সত্যকে জানতে চাই।"

"রেডিও মেরামত করার সঙ্গে সঙ্গেও সত্যকে জানা যায়। তুমি একেবারে বোকা।"

দু'জনের মতের মিল হ'ল না। এর পর ডিওম্‌কা ওলেগের সমস্যাদির প্রসঙ্গ তুলল। সাধারণতঃ উঠতি বয়সের ছেলেরা কেবল নিজের কথা ভাবতে ভালবাসে। ডিওম্‌কার বৈশিষ্ট্য, ও অপরের কথাও ভাবতে চায়। ওলেগ্ ওকে নিজের পরিস্থিতির কথা জানাল। ডিওম্‌কা যেন এক সমবয়সী। ডিওম্‌কা মন্তব্য করল, "সত্যিই ত' বিশ্রী পরিস্থিতি·····"

"আমার পরিস্থিতিতে পড়লে তুমি কি করতে বলো ত' ?" কি জানি, ভেবে পাচ্ছি না।"

শেষে জানা গেল রশ্মি-চিকিৎসা আর ক্রাচ লাগানোর জন্য ডিওম্‌কার আরো ছ'সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হবে। ও মে মাসে ছাড়া পাবে। "ছাড়া পেয়ে প্রথম কোথায় যাবে ?"

"আমি সোজা চিড়িয়াখানায় যাব।" ডিওম্‌কা উৎফুল্ল হয়ে বলল। ও এর আগে অনেকবার ঐ ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। হাসপাতালের গাড়ী বারান্দার নিচে গল্প করতে করতে ডিওম্‌কা চিড়িয়াখানার সঠিক অবস্থান জানিয়েছে। নদীর ওপারে ঘন গাছের আড়ালে চিড়িয়াখানা লুকিয়ে আছে। ও জীবজন্তু সম্পর্কে অনেক বই পড়েছে। রেডিওয় গল্প শুনেছে। কিন্তু বাঘ বা হাতি

দূরে থাক, কখনো শেয়াল কি ভাল্লুকও দেখেনি। ওর এমন সব জায়গায় জীবন কেটেছে যেখানে সার্কাস, চিড়িয়াখানা বা জঙ্গল ছিল না। জীব-জন্তু দেখা ওর ছেলেবেলার স্বপ্ন, যা বড় হয়েও ফিকে হয়ে যায়নি। ওর আশা ছিল জীব-জন্তু দেখলে বোধ হয় অদ্ভুত কিছু ঘটবে। পায়ের ব্যথার জন্য ও যেদিন প্রথম হাসপাতালে আসে সেদিনই চিড়িয়াখানায় গিয়েছিল। কিন্তু ঐ দিনটি চিড়িয়াখানার সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল। "শোনো ওলেগ্, তুমি ত' কিছু দিন পরেই ছাড়া পাবে, পাবে না?"

কুঁজো হয়ে বসা ওলেগ্ বলল, "তাই আশা করছি। আমার রক্তের যা অবস্থা তাতে আর ধকল সইবে না। বমি ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছি।"

"তুমিও চিড়িয়াখানায় যাবে ত', যাবে না?"

ওলেগ্ও ওর মত চিড়িয়াখানা দেখতে ইচ্ছুক না হলে ডিওম্কার মন খারাপ হবে। ওলেগ্ বলল, "আমি যেতে পারি।"

"না, পারি নয়, তোমার যেতেই হবে। আর কি করবে জানো, তারপর আমাকে পোস্টকার্ড পাঠাবে। পাঠাবে না? পোস্টকার্ড পাঠাতে তোমার কোন অসুবিধেই হবে না, কিন্তু আমি কত যে খুশি হব! কি কি দেখলে, কোন্ জন্তুটা দেখে সবচেয়ে মজা লাগল, সব লিখবে। আমি তাহলে ছাড়া পাওয়ার এক মাস আগেই জেনে যাব চিড়িয়াখানায় কি কি দেখার মত আছে। লিখবে ত', প্লিজ্? শুনেছি কুমীর, সিংহ আর……"

ওলেগ্ কথা দিল। ও এবার উঠল। নিজের বেডে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেবে।

ডিওম্কা একা ঘরে পড়ে রইল। ও কিছুক্ষণ বইটা তুলে নিল না। জানালা আর ঘরের চালের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল। জানালা দিয়ে বাইরের তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। জানলার শিকগুলো এমন করে লাগানো যাতে দেওয়াল ঘেরা হাসপাতালেরই বৈশিষ্ট্যহীন একটা অংশ চোখে পড়ে। কাছাকাছি কোন দেওয়ালে রোদ পড়ছিল না। তা বলে মেঘলা দিন নয়। সূর্য একটু মেঘে ঢেকে গিয়ে ঘোলাটে, তেরছা রোদ বেরিয়েছে। নিষ্প্রভ দিন। খুব গরম নয়। বসন্তের নিঃশব্দ পদচারণার পূর্বাভাস।

ডিওম্কা চুপ করে শুয়ে সুখকর ভাবনায় ডুবে গেল: ক্রাচ নিয়ে চলতে হলেও ও চটপট আর চৌখস কায়দা-দুরস্তের মত চলতে শিখবে; সে দিবসের কয়েক দিন আগে কোন এক প্রকৃত গ্রীষ্মের দিনে ও সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াবে; এবার পর্যাপ্ত সময় পেয়ে স্কুলের সব বিষয়ের বই ত' পড়বেই, অতীতে যে অত্যাবশ্যক বইগুলো পড়ে উঠতে পারেনি সেগুলোও পড়ে ফেলবে। আর আগের মত সন্ধ্যেয় নাচের আসর যাই কি না যাই ভাবতে ভাবতে শেষে ভাবল, নাচতে গিয়ে অপর ছেলেদের সঙ্গে অত সময় নষ্ট করতে হবে না। ওসব আর নয়। ও স্রেফ ঘরের বাতি জ্বেলে দেবে আর পড়াশোনা করবে।

দরজায় টোকা পড়ল। ডিওম্কা বলল, "ভেতরে আসুন।" কাউকে

'ভেতরে আসুন' বলতে পারায় তৃপ্তি আছে। ও কোন দিন ভাবেওনি যে এমন পরিস্থিতি হবে যখন লোকে ওর ঘরে ঢোকার জন্য অনুমতি চাইবে।

দরজা খুলে গেল। আসিয়া ভেতরে এল। আসিয়া এল না বলে ঝড়ের মত ঢুকল বলাই সঙ্গত। কেউ যেন ওকে তাড়া করেছে। আসিয়া দরজা বন্ধ করে দিল, এবং এক হাতে দরজার হাতল আর অপর হাতে নিজের ড্রেসিং গাউনের সামনেটা ধরে দাঁড়াল।

এ সেই আসিয়া নয় যে তিন দিনের জন্য হাসপাতালে নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে এসেছে, এবং যে কয়েক দিন পরে খেলোয়াড় বন্ধুদের সঙ্গে শীত কালীন ক্রীড়াভ্যাসের জন্য স্টেডিয়ামে ফিরে যাবে। ওর সব অঙ্গ ঝুলে পড়েছে। বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। এমন কি ওর হলুদ চুলগুলো, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত তাড়াতাড়ি বদলাতে পারে না, দুঃখজনক ভাবে ঝুলছে।

আসিয়ার পরনে হাসপাতালের বেঢপ ড্রেসিং গাউন, যার কেথাও কোন বোতামের বালাই নেই। আসিয়ার আগে ঐ গাউনটা আর ক'জনের কাঁধ অলঙ্কৃত করেছে, কিংবা কোন্ ভাটিতে ওটা ক'বার সেদ্ধ করা হয়েছে তা কে জানে। কিন্তু এ পোষাকও ওকে আগেকার পোষাকের চেয়ে কম মানায়নি।

আসিয়া ডিওম্কার দিকে তাকাল। আসিয়ার চোখের পাতাগুলো থরথর করে কেঁপে উঠল। ও কি ঠিক জায়গায় এসেছে, না ওর আর কোথাও যেতে হবে?

আসিয়া এখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। ও আর পড়াশোনায় ডিওম্কার থেকে পুরো এক বছর এগিয়ে থাকতে পারবে না। বাড়তি অভিজ্ঞতা, জীবন সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান এবং ও যে তিনটে দীর্ঘ সফর করেছে এসব কোনটাই ওর কাজে আসেনি। ডিওম্কার মনে হল আসিয়া যেন ওরই সত্তার এক অংশ। আসিয়াকে দেখে আনন্দিত ডিওম্কা বলল, "আসিয়া, বসো। কি খবর বলো?"

ওরা এর আগে অনেক গল্প করেছে। ডিওম্কার পায়ের কথা বাদ যায়নি। আসিয়া তখন ডিওম্কার পা কেটে বাদ দেওয়ার ঘোর বিরোধিতা করেছে। ডিওম্কার অপারেশনের পর আসিয়া ওর জন্য আপেল আর খাবার-দাবার এনেছে। এক সন্ধ্যায় যে আলাপ তা ক্রমে স্বাভাবিকভাবেই ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছে। আসিয়া তখন নিজের ঠিক কি অসুখ করেছে তা না বললেও, পরে জানিয়েছিল ওর ডান স্তনে ব্যথা লাগে; কি যেন একটা শক্ত ডালের মত হয়েছে, যার জন্য ওর রশ্মি-চিকিৎসা চলছে আর জিভের নিচে একটা পিল রেখে দিতে হয়।

"বসো, আসিয়া। এসো, বসো।"

আসিয়া দরজার হাতল ছেড়ে ডিওম্কার বেডের মাথার কাছে রাখা একটা টুলের দিকে কয়েক পা এগোল। ওর হাতটা দরজা ছেড়ে দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে এল। যেন প্রয়োজন হলে দেওয়াল ধরে টাল সামলাতে চায়।

আসিয়া বসল। বসল বটে, কিন্তু ডিওম্‌কার চোখের দিকে তাকাল না। ওর দৃষ্টি ডিওম্‌কাকে পেরিয়ে তার কম্বলের ওপর পড়ল। ও ডিওমকার দিকে তাকাতে পারছিল না। ডিওম্‌কাও নিজের দেহ বাঁকিয়ে ওকে সোজাসুজি দেখতে পাচ্ছিল না।

"আবার কি হ'ল, আসিয়া?" ডিওম্‌কার অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে হ'ল। ও তাই করে থাকে। ও নিজের মাথাটা বালিশের ওপর দিয়ে পেছনে হেলিয়ে আসিয়াকে দেখার চেষ্টা করল।

আসিয়ার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপল। চোখের পাতাও।

"আ-সি-য়া!" আসিয়ার দুঃখে অভিভূত ডিওম্‌কা আর বলতে পারল না। আসিয়া হঠাৎ ডিওম্‌কার বালিশের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ল। ডিওম্‌কার মাথার পাশেই ওর মাথা। ওর এক গোছা চুলে ডিওম্‌কার কানে সুড়সুড়ি লাগল।

"প্লিজ্, আসিয়া, প্লিজ, কেঁদো না!" ডিওম্‌কা কম্বলের ওপর দিয়ে হাত বাড়াল। কিন্তু ও আসিয়ার হাত খুঁজে পেল না।

আসিয়ার কান্না থামেনি। ও বালিশের ওপর ফুঁপিয়ে কাঁদছিল "আসিয়া, কি হয়েছে তোমার? আমাকে বলো, কি হয়েছে?"

ডিওম্‌কা ইতিমধ্যে আসিয়ার কান্নার কারণ অনুমান করে ফেলেছিল।

"ওরা কে-টে-এ ফেলবে......" আসিয়া কাঁদতে লাগল। কান্না থামে না তারপর উঁ-উঁ করে ফোঁপাতে থাকে।

ডিওম্‌কা কখনো এমন দীর্ঘ সময় ধরে দুঃখে ফোঁপানো, তার সঙ্গে 'উঁ উঁ' করে বিলাপ দেখেনি। "ওরা হয়ত শেষ পর্যন্ত কাটবে না," ডিওম্‌কা প্রবোধ দেওয়ার জন্য বলল, "হয়ত কাটতে হবে না।" কিন্তু ও বুঝতে পারছিল যে ওর প্রবোধ বাক্য আসিয়ার দুঃখ লাঘবের পক্ষে যথেষ্ট জোরদার নয়।

আসিয়া কাঁদছিল। ডিওম্‌কা অনুভব করছিল, বালিশের একটা জায়গা ভিজে গিয়েছে। ডিওম্‌কা ওর হাত খুঁজে পেল। আসিয়ার হাতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "আসিয়া, আসিয়া, হয়ত কাটার প্রয়োজনই হবে না।"

"ওরা কাটবে, কাটবে! শুক্রবার কাটবে......" আসিয়ার বিলাপে ডিওম্‌কা স্তব্ধ হয়ে গেল।

ডিওম্‌কা ওর অশ্রু-সজল মুখ দেখতে পাচ্ছিল না আসিয়ার কয়েক গোছা চুল ডিওম্‌কার চোখের ওপর পড়ল। নরম অলকগুচ্ছ।

ডিওম্‌কা কথা খুঁজতে চাইল। কিন্তু পেল না। শুধু আসিয়ার হাত ধরা ওর মুঠি একটু শক্ত হয়ে গেল। ডিওম্‌কা নিজের জন্য এত দুঃখ অনুভব করেনি। আসিয়া ডুকরে কেঁদে উঠল, "আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব ..."

ডিওম্‌কার জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, তা সে যত অস্পষ্টই হোক না কেন, তাতে এ প্রশ্নের জবাব ছিল। ও তবু তা উচ্চারণ করতে পারল না। ও.তা উচ্চারণ করতে না পারলেও, আসিয়ার বিলাপের ভাষা এত স্পষ্ট যে ডিওম্‌কার বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হ'ল না যে ডিওম্‌কা, অপর কোন ব্যক্তি বা পদার্থ ওকে প্রবোধ দিতে অসমর্থ। আসিয়ার অভিজ্ঞতা তাকে শুধু একটা কথাই জানিয়েছে : ওর বেঁচে থাকার মত কিছুই নেই।

"এ জগতে কে আ-মা-কে চাইবে··· ?" প্রবোধ না-মানা আসিয়া টেনে টেনে, অসংলগ্নভাবে বলল, "কে আ-মা-য নেবে ··?" আসিয়া আবার বালিশে মুখ লুকাল। এবার ডিওম্‌কার গালও ভিজে গেল।

"শোনো, আসিয়া, শোনো," ওর হাত ধরা অবস্থাতেই ডিওম্‌কা বোঝানোর চেষ্টা করল, "তুমি কি জানো লোকে কি দেখে বিয়ে করে? ······ মনের মিল দ্যাখে,······চরিত্রের মিল দ্যাখে ·····"

"কোন্ আহাম্মক চরিত্রের জন্য মেয়েদের ভালবাসে?" আসিয়া রেগে রুখে উঠল। ও হাত ছাড়িয়ে নিল। ডিওম্‌কা এবার ওর মুখ দেখতে পেল। হতাশার গ্লানি মাখা, কান্নায় ফোলা, অশ্রু-সজল মুখে রাগের উদ্গম। "যে মেয়ের একটা বুক নেই কে তাকে নেবে, শুনি? অমন মেয়ে কে চায়, যার আঠারো বছর বয়সেই এই অবস্থা হয়েছে?" আসিয়া রাগে চিৎকার করে বলল। সব দোষ ত' ডিওম্‌কারই।

ডিওম্‌কা আর কি করে প্রবোধ দেবে ভেবে পেল না। "আমি আর কোন দিন সমুদ্রে যেতে পারব? পারব সমুদ্রে সাঁতার কাটতে?" আসিয়া আবার চিৎকার করে উঠল। ওর হাত দুটো কোলের কাছে মুঠো করা। ওর দেহ হঠাৎ কেমন মোচড় দিয়ে উঠল, আর দু'হাতে মাথা ধরা অবস্থায় ও বেসামাল হয়ে মেঝেয় পড়ল।

সাঁতারের পোষাক পরে আসিয়া আর কখনো যে সমুদ্রতীরে যেতে পারবে না, সেই সমুদ্রতীরের দুঃসহ কল্পনা মনে ভিড় করে এল। নানা ফ্যাশানের সাঁতারের পোষাক——কাঁধের স্ট্র্যাপওলা এবং স্ট্র্যাপ বিহীন, উর্দ্ধাঙ্গ আর নিম্নাঙ্গ এক সঙ্গে জোড়া কিংবা আলাদা, সব রকমের আধুনিক এবং ভবিষ্যৎ ছাঁদের, গোলাপীর সঙ্গে নীল ডোরা কাটা, টকটকে লালে সমুদ্র-নীল ডোরা সাঁতারের পোষাক, যেগুলি আসিয়া আয়নার সামনে পরখ করলেও এখনো পরা হয়ে ওঠেনি, এবং যেগুলি ও আর কখনো কিনবেও না, পরবেও না।

ও আর কখনো সাঁতারের পোষাকে সমুদ্রতীরে বেরোতে পারবে না। এই কথাই হঠাৎ আসিয়ার জীবনের সবচেয়ে বেদনাময় সত্য বলে মনে হ'ল। জীবন পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা কারণে।

কয়েকটা বালিশে হেলান দিয়ে শোয়া ডিওম্‌কা আগোছালভাবে কোন মতে বলে ফেলল, "অবশ্য, আমি······তুমি ঠিকই বলেছ, হয়ত কেউ তোমাকে

নেবে না····· না নিক······আমি কেমন তা আমি বুঝি······আমি সব সময় তোমাকে সানন্দে বিয়ে করতে রাজী আছি, তুমি ত' জানো······"

"ডিওম্‌কা, শোনো।" হঠাৎ একটা নতুন কথা মনে পড়ে যেতে আসিয়া উঠে দাঁড়াল। ডিওম্‌কার দিকে সোজা তাকাল। ওর বড় বড় চোখ দুটোর অশ্রু অন্তর্হিত। "তুমিই হবে শেষ ব্যক্তি। সেই শেষ ব্যক্তি যে আমার এই বুকটাকে অক্ষত দেখতে পাবে, আর চুমু খাবে। তুমি ছাড়া আর কেউ এ বুকে চুমু দিতে পারবে না। ডিওম্‌কা, আর কেউ চুমু না দিক, তুমি····· তুমি চুমু দেবে না?"

আসিয়া ড্রেসিং গাউন টেনে খুলতে লাগল। কলার খুলতে গিয়ে ও যেন ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল। পোষাক খুলে ফেলতে ওর রোগদুষ্ট ডান স্তন বেরিয়ে পড়ল।

যেন সূর্যালোকের মত উজ্জ্বল তার শোভা। সে শোভায় ঘরে যেন আগুন ধরে যায়। স্তন-বৃন্তটা বেশ উজ্জ্বল। ডিওম্‌কা যা কল্পনা করেছিল তার চেয়ে বড়। ওর সামনে উপস্থিত। অত ঝলমলে গোলাপী আভা ডিওম্‌কা বেশীক্ষণ দেখতে পারল না।

আসিয়া এগিয়ে এল। স্তন-বৃন্ত ডিওম্‌কার মুখের কাছাকাছি হ'ল। "চুমু দাও!" আসিয়া বলল।

ওকে নিবেদিত আসিয়ার দেহের উষ্ণতার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ডিওম্‌কা ওর স্তনবৃন্তে মুখ দিল। স্তন্যপায়ী শিশুর মত। অবাক বিস্ময়ে নিমজ্জিত। ওর চেয়ে সুচারু, মোহন বঙ্কিম রেখা না তুলিতে আঁকা সম্ভব, না ভাস্কর্যে রূপায়ণ সম্ভব। সৌন্দর্যে নিমজ্জিত ডিওম্‌কার অধরের অধরোষ্ঠ মসৃণ, সুচারু বঙ্কিম রেখার স্বাদ গ্রহণে ধন্য হ'ল।

"তুমি ত' মনে রাখবে, রাখবে না··· ? কেমন ছিল, মনে রাখবে না?" ডিওম্‌কার কদম ছাট মাথায় আসিয়ার তপ্ত অশ্রু পড়ল।

আসিয়া সরিয়ে নিল না। ডিওম্‌কা ওর স্বর্ণাভ বুকটা অজস্র চুমুতে ভরে দিল। আসিয়ার অনাগত সন্তান কোনদিনই এ সৌভাগ্য পাবে না। এর মধ্যে ঘরে কেউ আসার চেষ্টা করেনি। ডিওম্‌কা শুধু বারবার চুমু দিয়েছে আর বারবার অপরূপ সুন্দর জিনিষটার দিকে চেয়ে চেয়ে অবাক হয়েছে।

আজকের অপরূপ সুন্দর আগামীকাল আবর্জনা স্তূপে বর্জিত হবে।

কড়া কথা, নরম কথা

সরকারী সফর থেকে ফিরে ইয়ুরি প্রথম যে কাজ করল তা হ'ল বাপের সঙ্গে দেখা করা, ঘণ্টা দু'য়েক বাপের সঙ্গে কাটানো। ইয়ুরি হাসপাতালে আসার আগে পাভেল ওকে ফোন করে নিজের জন্য গরম জুতো, টুপি আর ওভারকোট নিয়ে আসতে বলেছিল। হতভাগা ক্যানসার ওয়ার্ড, মাথা-মোটা আবাসিক রোগী আর তাদের বোকা-বোকা কথাবার্তায় পাভেলের ক্লান্তি এসে গিয়েছিল। হাসপাতালের বৈঠকখানাও কম বিরক্তিকর নয়। পাভেল অত্যন্ত দুর্বল। তবু মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল।

পাভেল ওর টিউমারটাকে আলতোভাবে স্কার্ফ জড়িয়ে ঢেকে নিল। টিউমারটা আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেলেও, মাথা ঘোরালে টের পাওয়া যায়। হাসপাতালের পথে কোন পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেখা হলেও তারা এসব ভব্য পোষাকে সজ্জিত পাভেলকে চিনতে পারবে না। ইয়ুরি ওর এক হাত ধরল। পাভেল ওর ওপর বেশ কিছুটা ভর দিল। হাসপাতালের পিচ বাঁধানো, শুকনো, পরিচ্ছন্ন পথে চলতে ভালই লাগল। বিশেষতঃ এই কারণে যে এই পদচারণা ওর নিজের সুন্দর ফ্ল্যাটে অনতিবিলম্বে প্রত্যাবর্তন, আর তারপর যে কাজ আর কর্ম চাঞ্চল্য ও অত ভালবাসে সেই কর্ম জীবনে প্রত্যাবর্তন সূচিত করে। শুধু চিকিৎসার ফলে নয়, একঘেয়ে কর্মহীনতায় পাভেল ভেঙে পড়েছে। ও আর এক বিশাল, গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ নেই। ও একান্ত ক্ষমতাহীন এবং তাৎপর্যহীন হয়ে গিয়েছে। ও যথাশীঘ্র সম্ভব সেখানে ফিরে যেতে চায় যেখানকার মানুষ ওকে ভালবাসে, ওকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবতে পারে না।

গত সপ্তাহে বৃষ্টি ভেজা, ঠাণ্ডা ভাব ছিল। এ সপ্তাহে সে ভাব কেটে গিয়ে উষ্ণতা দেখা দিয়েছে। বাড়ীগুলোর ছায়ায় এখনো শীত লাগে, তার কাছাকাছি মাটি এখনো ভেজা-ভেজা। কিন্তু রোদের তাপ এত বেশী যে কোট গায়ে রাখা দুষ্কর। পাভেল এক এক করে কোটের বোতামগুলো খুলতে লাগল।

ইয়ুরির সঙ্গে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাল করে কথা বলার বিশেষ সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। আজ শনিবার। দিনটা ইয়ুরির সফরের অন্তর্গত। ইয়ুরির কাজে ফেরার তাড়া নেই। ও পাভেলের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারবে। পাভেলেরও তাড়া নেই। ইয়ুরির কাজের যে ধরণ তা বিপজ্জনক মোড় নেওয়া সম্ভব। পাভেলের পিতৃ হৃদয় তা বোঝে, এবং স্বীকার

করে যে ওটা ছেলেকে শেখানোর গাফিলতির ফল। স্পষ্টতঃ ইয়ুরি পরিচ্ছন্ন বিবেক নিয়ে সফর থেকে ফেরেনি। ও বাপের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছিল না। ছেলেবেলায় ও অন্য রকম, রোখালো ধরণের ছিল। ছাত্রাবস্থায় ও বাপের সঙ্গে এই লাজুক, এড়িয়ে যাওয়া ব্যবহার শুরু করে। পাভেল তাতে অত্যন্ত বিরক্ত হত। কখনো কখনো ধমকাত, "মাথা উঁচু করে কথা বলো!"

কিন্তু আজ পাভেল বকাবকি করবে না। চতুর, নরম ভাবে কথা বলবে। সোভিয়েত সরকারের আইন বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে ইয়ুরি যে দূর অঞ্চলের শহরগুলোয় পর্যবেক্ষণ সফরে গিয়েছিল সেখানে ও কেমন নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেছে, কেমন নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, পাভেল তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলতে বলল।

ইয়ুরি বলতে শুরু করল। কিন্তু ওর তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। ও বাপের দিকে না তাকিয়েই একের পর এক ঘটনা বলতে লাগল। পাভেল প্রায়ই বলছিল, "আর কি হ'ল? আরো বলো।"

ওরা একটা বেঞ্চিতে বসল। বেঞ্চিটা রোদ পড়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। ইয়ুরির পরনে একটা চামড়ার জ্যাকেট আর পশমের টুপি। যথেষ্ট পুরুষালি, কেজো ভাব। তবু ওর কি যে এক নরম ভাব, দুর্বলতা, যে জন্য ও উচ্ছন্নে যেতে বসেছে।

"একটা লরি ড্রাইভারের ঘটনাও ঘটেছে····" ইয়ুরি তার অভ্যাসমত মাটিতে তাকিয়ে বলল। "কেন, লরি ড্রাইভারের কি হয়েছে?"

"এক ড্রাইভার শীতকালে কোন এক সমবায় সমিতির খাদ্য-শস্য বোঝাই লরি নিয়ে চলেছিল। ওর সত্তর কিলোমিটার দূরে জিনিসগুলো পৌঁছনোর কথা। কিন্তু তুষার ঝড়ে মাঝপথে থামতে বাধ্য হ'ল। পথ-ঘাট এমন তুষারে ঢেকে গিয়েছিল যে লরির চাকা অনবরত পিছলে যায়। চারদিকে বরফ জমা শীত। কোথাও জন-মনিষ্যির সাড়া নেই। তুষার ঝড়েরও বিরাম নেই। ড্রাইভারটি শেষে লরিতে থাকতে না পেরে, মালবোঝাই লরি ছেড়ে রাতের আশ্রয়ের খোঁজে চলল। পরদিন সকালে ঝড় থামতে, লরিকে তুষার স্তূপ থেকে মুক্ত করতে ও একটা ট্র্যাক্টর নিয়ে এল। ড্রাইভার তারপর হিসেব মিলিয়ে দেখে যে এক পেটি পাঁপড় উধাও হয়েছে।"

"লরির খালাসি কি করছিল?" পাভেল বলল। "জানা গিয়েছে, লরি ড্রাইভার কোন খালাসি ছাড়াই গাড়ী বের করেছিল। ও নিজেই খালাসির কাজও করছিল।"

"অত্যন্ত লজ্জাকর গাফিলতি!" ইয়ুরিও সায় দিল, "সত্যিই ত'।"

"অতএব ড্রাইভারটি সুযোগ বুঝে মোটামুটি লাভ করে নিল?"

"বাবা," ইয়ুরি অবশেষে চোখ তুলল, "বেচারীর ঐ এক পেটি পাঁপড়ের

জন্য অত্যন্ত বেশী দাম দিতে হয়েছে।" ইয়ুরির এক অবুঝ, অপছন্দের ভাব ফুটল। "এক পেটি পাঁপড়ের জন্য ওর পাঁচ বছর কারাবাস ঘটেছে। লরিতে বেশ ক'পেটি ভদকাও ছিল। সেগুলো কিন্তু, কেউ নেয়নি।"

"ইয়ুরি, তোমার অত নরম, অত সরল, প্রায় নির্বোধ হওয়া উচিত নয়। ঐ ড্রাইভার ছাড়া আর কে তুষার ঝড়ের মধ্যে ঐ পাঁপড়ের পেটি সরাতে যাবে, বলো?"

"কেউ ঘোড়া চড়ে এসে থাকতে পারে, কে জানে? তাহলে ত' তার কোন চিহ্নও তুষারে পাওয়ার কথা নয়।"

"বেশ, যদি একথা মেনে নেওয়া যায় যে ড্রাইভার নিজে ঐ পাঁপড়ের পেটি সরায়নি, সে তার কর্তব্যস্থল ছেড়ে গিয়েছিল, যায়নি? সরকারী সম্পত্তি ছেড়ে স্রেফ চলে যাওয়া, কোন্ ধরণের আচরণ?"

ড্রাইভারের অপরাধ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সাজাও সঠিকই হয়েছে, বরং একটু লঘুই হয়েছে। পাভেল এই জন্য রেগে যাচ্ছিল যে ইয়ুরি ব্যাপারটাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাইছে না। যেন এই যুক্তিটা ওর গলায় ঠেসে ঢোকাতে হবে। অধিকাংশ বিষয়ে ইয়ুরি দুর্বল এবং অগোছাল, আর আহাম্মকের মত যুক্তি খাড়া করার বেলায় খচ্চরের মত বেয়াড়া, একগুঁয়ে।

"কথাটা বোঝার চেষ্টা করো, বাবা,——ওখানে তখন তুষার ঝড় বইছে, আর তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে শূন্যাঙ্কের দশ ডিগ্রি নিচে। ও কি করে ঐ শীতে লরিতে রাত কাটাত? ও ত' তাহলে মরে যেত, তাই নয়?"

"'মরে যেত' মানে? ফৌজী সান্ত্রীরা কি করে ডিউটি করে?"

"ফৌজী সান্ত্রীরা এক সঙ্গে দু'ঘণ্টার বেশী ডিউটি করে না।"

"ডিউটি করে না? রণাঙ্গণে কি করতে হয়? আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন সান্ত্রীকে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে ডিউটি করতেই হয়। দরকার হলে ডিউটি করতে করতে মরে যায়, কিন্তু জায়গা ছাড়া? কখ্খনো না!" পাভেল একটা আঙুলের সাহায্যে দেখাল কিভাবে সান্ত্রীরা ডিউটি করতে করতে বরং মৃত্যু বরণ করে, তবু পালায় না। "তুমি যা বলছ তা ভেবে-চিন্তে বলো, ইয়ুরি। এ ড্রাইভারটা যদি সাজা না পায় তবে অন্য ড্রাইভাররাও তাদের গাড়ী ছেড়ে ঐ রকম করে চলে যাওয়া আরম্ভ করবে, জিনিষপত্র এমন চুরি করবে যে সরকার বলতে আর কিছুই থাকবে না——এসব কি বোঝো?"

না, ইয়ুরি কিছুই বুঝবে না। ওর নির্বোধের মত নির্বাক ভাব ে তাই স্পষ্ট হয়।

"আচ্ছা বেশ, আমি জানি তোমার কিছু কিছু ছেলেমানুষি এখনো রয়ে গিয়েছে, কারণ তুমি বয়সে প্রবীন হওনি। হয়ত তোমার মতামত অপর কাউকে মৌখিক ভাব জানিয়েছও। আশা করি তোমার এতটুকু আক্কেল আছে যে

ঐ মতামতটা তোমার নিয়ম মাফিক রিপোর্টেও লিখে দাওনি, লিখেছ নাকি ?"

ইয়ুরির শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। "আমি⋯⋯ লিখিত আপত্তি জানিয়েছি। ঐ দণ্ডাদেশ মুলতুবি রাখার সুপারিশ করেছি।"

"মুলতুবি রাখার সুপারিশ করেছ ! তাহলে ত' দণ্ডের পুনর্বিবেচনাও করা হবে ? হায়, হায় !" পাভেল দু'হাতের চেটোয় মুখ ঢাকল। ও ঠিক এই ভয়ই করেছিল। ইয়ুরি নিজের কাজ সম্পূর্ণ পণ্ড করেছে, নিজেকে ধ্বংস করেছে, তার সঙ্গে বাপের সুনামও রসাতলে দিচ্ছে। পাভেলের রাগে অসুস্থ লাগল। এক বাপের অসহায় রাগ, যে জানে সে কোন উপায়েই তার অপদার্থ সন্তানকে নিজের বুদ্ধি এবং কম পটুতায় সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবে না।

পাভেল উঠল। ইয়ুরিও উঠল। ওরা আবার পায়চারি শুরু করল। ইয়ুরি পাভেলের হাত ধরল। পাভেল কিছুটা ইয়ুরির ওপর ভর দিয়ে চলল। একটা কথা পাভেলের মনে খচ্‌খচ্‌ করতে থাকল, ইয়ুরি যে কত মারাত্মক ভুল করেছে তা যদি ও ও ইয়ুরির মগজে দু'হাতে ঠেসে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং ইয়ুরি সে ভুলের পরিমাপ করতে পারবে না।

ও আইনের গুরুত্ব এবং তা বলবৎ কবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা শুরু কবল। বলল, সোভিয়েত দেশের আইন অতি মজবুত বুনিয়াদের ওপর দণ্ডায়মান এবং সে আইন সম্পর্কে লঘুভাবে সংশয় প্রকাশ করা অনুচিত। বিশেষতঃ একজনের পক্ষে, যে অভিসংশকের দপ্তরে আইন পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত। সত্য যেমন সর্বদাই নির্দিষ্ট তেমনি যা আইন তা আইনই রয়ে যায়। আইন বলবৎ করার প্রসঙ্গে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময় এবং পরিস্থিতি স্মরণ রাখতে হয়, এবং আদালতের রায় এগুলির ওপব নিভরশীল। পাভেল রাষ্ট্র যন্ত্রের সব শাখা আর সব পযায়ের মধ্যে বিদ্যমান আঙ্গিক সম্পকের ওপর জোর দিল। সুতরাং রুশ সাধারণতন্ত্রের অভিসংশকের নির্দেশ পালন করতে গিয়েও রাষ্ট্রের কোন দূর অঞ্চলে এতটুকু উদ্ধত ভাব দেখানো উচিত নয়। বরং আঞ্চলিক পরিস্থিতির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে স্থানীয় উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মীদের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করা উচিত, কারণ তাঁরা স্থানীয় পরিস্থিতি এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অধিকতর ওয়াকিবহাল। তাঁরা যদি লরি ড্রাইভারটির পাঁচ বছর কয়েদ সুপারিশ করে থাকেন, ঐ বিশেষ অঞ্চলে ঐ সাজাই উপযুক্ত ধরে নিতে হবে।

সোজা আর আঁকাবাকা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা হাসপাতালের বাড়ীগুলোর ছায়া পেরিয়ে নদীর ধারে এসে পেঁছিল। ইয়ুরি এর মধ্যে শুধু শুনেছে। এবার বলল, "তোমার ক্লান্ত লাগছে না, বাবা ? একটু বসবে ?"

একেবারে মাথা-মোটা ছেলেটা ! তাতে কোন ভুল নেই। এতবড় সরকারী সফরে কিছু শেখেনি। কেবল জেনেছে, লরি ড্রাইভারের বসাব জায়গায় শূন্যের দশ ডিগ্রি নিচে তাপ মান।

পাভেলের ক্লান্ত লাগছিল। ওভারকোটে বিশ্রী গরমও লাগছিল। ওরা

মন ঝোপের কাছাকাছি একটা বেঞ্চিতে বসল। ঝোপে পাতা ফোটেনি। ডালপালার মধ্যে দিয়ে ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। সবে এক আধটা ডালের কাণের আকারে পাতার কুঁড়ি এসেছে। রোদের বেশ তাপ।

পাভেল চশমা পরে বেরোয়নি। ওর মুখভাব বেশ সহজ দেখাচ্ছিল। চোখ দুটো বিশ্রাম পাওয়ার ফলে দৃষ্টি শান্ত। রোদের দিকে চেয়ে পাভেল চোখ কোঁচকাল।

অদূরে দু'পাশে খাড়াই পারের মাঝখানে পাহাড়ী নদী গর্জন করে চলেছে। প্যাভেলের বেশ চাঙ্গা লাগছিল। পাভেল ভাবছিল স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাওয়া কত মধুর; সবকিছু যখন সবুজ হয়ে আসছে তখন একথা নিশ্চিত জানা যে ও বেঁচে থাকবে, পরের বসন্তেও বেঁচে থাকবে, কত সুন্দর।

কিন্ত না, ইয়ুরির কথা ভাবা বেশী দরকার। পাভেল রাগ সংযত করে রাখবে, নইলে ইয়ুরি স্রেফ ঘাবড়িয়ে যাবে। সংশোধিত হবে না। পাভেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ইয়ুরিকে আরো কয়েকটা মামলার কথা বলতে বলল।

ইয়ুরিকে প্রথমে অপটু মনে হলে কি হবে, বাপ কি শুনে প্রশংসা করবে তা ও ঠিকই জানে। পরের যে মামলার কথা ইয়ুরি বলল, পাভেল তাতে ওর ভূমিকা অনুমোদন না করে পারল না! ও তবু বাপের চোখ এড়িয়েই কথা বলছিল। ও আসলে মিথ্যে কথা বলতে শেখেনি। পাভেল বুঝল ইয়ুরি নিশ্চয় আরো কয়েকটা মামলায় গোলমাল করেছে। "আমাকে সব বলো," পাভেল বলল, "আমি সব শুনতে চাই। জানোই ত', আমি তোমাকে যা দেব তা হ'ল যুক্তিসঙ্গত, সুবুদ্ধি প্রসূত পরামর্শ। তোমার ভালোর জন্যই এসব বলছি। তুমি কেবলই ভুল করবে, এ আমার ভাল লাগে না।"

ইয়ুরি তার কাহিনী শুরু করল। পরিদর্শন সফরে ওর অনেক আদালতের কাগজ-পত্র ঘাঁটতে হয়েছিল। কোন কোনটা পাঁচ বছরের পুরনো। ও তখন লক্ষ্য করেছে যে অনেক দলিল থেকে দু-তিন রুবলের স্ট্যাম্প তুলে নেওয়া হয়েছে। স্ট্যাম্পগুলো খুলে নেওয়ার চিহ্ন সুস্পষ্ট। কে খুলে নিল? ইয়ুরি একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করল। দেখা গেল হাল আমলের দলিল গুলোয় ত্রুটিযুক্ত এবং একটু আধটু ছেঁড়া স্ট্যাম্প লাগানো আছে। জানা গেল, আদালতের কাগজপত্রের দায়িত্ব কাতিয়া আর নিনা নামে দুটি মেয়ের ওপর থাকে। ওদের একজন নতুনের জায়গায় পুরনো স্ট্যাম্প লাগিয়ে জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করছে, সন্দেহ হ'ল।

"ভাবো ত' একবার!" পাভেল এক হাত তুলে বলল, "সরকারকে ঠকানোর কত ফিকির। অভিজ্ঞতা না হলে কি তুমি এসব জানতে পারতে?"

ইয়ুরি নিঃশব্দে তদন্ত করল, কাউকে একটা কথাও জানতে দেয়নি। ও স্থির করেছিল দুটির মধ্যে কোন্ মেয়েটি তহবিল তছরূপ করে তা বের করে ছাড়বে। ও দু'জনের সঙ্গে প্রেমাভিনয় করতে লাগল। অভিসারেও গেল।

প্রথমে কাতিয়ার সঙ্গে, তার পরে নিনার সঙ্গে। ও দু'জনকেই সিনেমায় নিয়ে গেল। তাদের বাড়ীও গেল। দু'জনের মধ্যে যার বাড়ীতে দামী আসবাব-পত্র আর কার্পেট আছে সেই চোর হবে।

"সাবাশ!" পাভেল হাততালি দিল। হাসিমুখে বলল, "দারুণ চালাকি করেছ! লোকে বলে থাকে, 'কাজের সঙ্গে সঙ্গে মজা লোটা,' এও সেই ধরনের ব্যাপার।"

কিন্তু ইয়ুরি লক্ষ্য করল দুটি মেয়ের মধ্যে একটিরও তেমন আসবাবপত্র নেই। একজন বাপের কাছে থাকে। অপর জন ছোট ভাইয়ের সঙ্গে। কার্পেট দূরে থাকে, অনেকগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষই ওদের নেই। ওরা ঐ ভাবে কি করে বেঁচে থাকে? ইয়ুরি সব দিক বিবেচনা করে মেয়ে দুটি যে বিচারকের অধীনে কাজ করত তাকে ওদের কাহিনী বলল। ও বলল আইনানুগ ব্যবস্থা না নিয়ে, বরং আপনি ওদের ডেকে ধমকিয়ে দিন। বিচারকও তা মেনে নিলেন। কারণ ব্যাপারটা লোক জানাজানি হলে তাঁরও ক্ষতি। ওরা দু'জনে মেয়ে দু'টিকে ডেকে কয়েক ঘণ্টা ধরে ধমকা-ধমকি করল। প্রথমে কাতিয়া, তারপর নিনা অপরাধ কবুল করল। স্বীকার করল, ওরা ঐ উপায়ে একশো রুবল করে রোজগার করে।

"আহা, ঐ মামলাটার রীতিমত সরকারী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল," পাভেলের এত মন খারাপ হ'ল যেন ও নিজে ঐ সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ হারিয়েছে। কিন্তু অপর দিক থেকে দেখলে বলতে হয়, বিচারককে বিব্রত না করে ইয়ুরি সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। "ওরা যে অর্থ আত্মসাৎ করেছে, অন্ততঃ তা ফেরৎ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া উচিত ছিল," পাভেল বলল।

কাতিয়া আর নিনার বৃত্তান্ত যেভাবে শেষ হয়েছিল ইয়ুরির পক্ষে তা পাভেলকে বলা অসুবিধা। মামলাটার পরিণতি প্রকৃতই অর্থহীন। ইয়ুরি যখন বিচারকটিকে মামলার বেসরকারী নিষ্পত্তি করতে অনুরোধ করে তখন ওর মনে হয়েছিল ও বিশাল হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়েছে। ওর বেশ গর্বও হয়েছিল। ও ধরে নিয়েছিল অপরাধ কবুল করা এবং তজ্জনিত শাস্তির ভয়ে ভীত মেয়ে দুটি যখন দেখবে ওদের সাজা না দিয়ে মার্জনা করা হ'ল, তখন খুব অবাক হবে, আনন্দিত হবে। ইয়ুরি জানত যে ওদের ক্ষমা করা হবে। ও তাই বিচারকের সঙ্গে সমান তালে ওদের কড়া কথার বাণে বিদ্ধ করেছিল। ওর নিজের তেইশ বছর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দেখাল কত মানুষ এমনও আছে যারা চুরি করার অঢেল সুযোগ থাকতেও চুরি করেনি। মেয়ে দুটি মার্জনা পেয়ে চলে গেল। ওরা সেজন্য খুশি হওয়া বা কাউকে ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাক, তারপর থেকে ইয়ুরিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে থাকল। ইয়ুরি বিস্মিত হ'ল। ও ওদের আচরণ বুঝতে পারল না। ওরা হয়ত বোঝেইনি যে হাতের মুঠোয় পেয়েও ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আদালতে কাজ করে ঐটুকু না বোঝার ত' কথা নয়। ইয়ুরি আর নিজেকে

সংযত রাখতে না পেরে এক দিন নিনাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, নিনা বিচারের রায়ে খুশি হয়েছে কিনা। "আমি কেন খুশি হতে যাব?" নিনা বলল, "আমার এখন অন্য চাকরি খুঁজতে হবে। শুধু মাইনের টাকায় আমি বেঁচে থাকতে পারব না।" কাতিয়া নিনার চেয়ে সুশ্রী। ইয়ুরি কাতিয়াকে আবার এক দিন সিনেমায় নিয়ে যেতে চাইল। কাতিয়া জবাব দিল, "কোন পুরুষের সঙ্গে বেরোতে হলে আমি তার প্রতি সৎ থাকতে চাই। তোমার আচরণের পর সে সম্ভাবনা নেই! আমি যাব না।"

ওর বাপ যা মনে করে জীবন তার চেয়ে অনেক বেশী জটিল। বাপের মন এবং চিন্তাধারা এক মুখো। ইয়ুরি তার সফর থেকে ঐ মেয়ে দুটির যে ধাঁধা দিয়ে ফিরেছে ও তখনো তাতে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ও কি বা করতে পারত? মার্জনা দানে বাদ সাধত? ওদের অপরাধ না দেখার ভান করত? তাহলে ত' ওর কাজ করার কোন মানেই হয় না।

পাভেল আর প্রশ্ন করল না। ইয়ুরিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পাভেলের চোখে মেয়ে দুটির মামলার রায় স্রেফ ইয়ুরির অগোছাল কাজের দরুণ সর্বনাশের আরেকটি দৃষ্টান্ত। যার মেরুদণ্ড শৈশবে গঠিত হয় না, তার কোন কালেই গঠিত হবে না। ছেলের ওপর কত রাগ করা যায়। পাভেল ওর ওপর যেমন বিরক্ত তেমনি ওর জন্য চিন্তান্বিত হ'ল।

ওরা একটু বেশীক্ষণই বাইরে কাটিয়েছিল। পাভেলের পায়ে ঠাণ্ডা লাগছিল। দারুণ শুতে ইচ্ছে করছিল। ইয়ুরি ওকে বিদায় চুম্বন দিল। পাভেল ওয়ার্ডে ফিরে চলল।

ওয়ার্ড তখন আলোচনা-মুখর। সবাই সে আলোচনায় অংশ নিয়েছে। কিন্তু মূল বক্তার কণ্ঠস্বর নেই। বক্তাটি ভাবিযুক্ত চেহারা দর্শনের অধ্যাপক। ও এর আগে ওয়ার্ডে এসে সবার সঙ্গে দেখা করে। তারপরে ওর কণ্ঠনালী অপারেশন হয়েছে। দিন কয়েক আগে ওকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ড থেকে তেজোর রশ্মি-চিকিৎসা ওয়ার্ডে বদলি করেছে। 'কমিউনিস্ট অগ্রগামী যুব দলের' সদস্যদের স্কার্ফের মত ওর গলার সামনের দিকে একটা ধাতব পাত লাগানো। অধ্যাপক শিক্ষিত, ভদ্রলোক। যাতে ওর মনে আঘাত না লাগে, সে বিষয়ে সজাগ পাভেল কখনো ঐ ধাতব পাত দেখে বিস্ময় বা ভীতি প্রকাশ করত না। কথা বলতে হলেই অধ্যাপক একটা আঙুল দিয়ে ঐ পাতটা চেপে ধরত। তাতে ওর কথা কিছুটা শোনার মত হত। অধ্যাপক কথা বলতে অভ্যস্ত এবং ভালবাসে। কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে তা কাজে লাগাতে পেরে আহ্লাদিত।

অধ্যাপক ওয়ার্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা গল্প বলছিল। ওর কণ্ঠস্বর ফ্যাসফেসে, ফিসফিসের চেয়ে কিছু জোরদার। "লোকটা যে কত কি জোগাড় করেছে," অধ্যাপক বলছিল, "তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। একটা ঘর ত' ফিকে-সোনালী রঙের এক সেট কাঠের আসবাবে ঠাসা। তার

প্রতিটি চেয়ারের হাতলেও লাইলাক্ রঙের ভেলভেট গদী মোড়া। ও আবার নিজেকে খুব খানদানি সংগ্রাহক মনে করে। ঐ রকম গদী মোড়া চার চারটে হাতলওলা চেয়ার আর একটা ছোট সোফা আছে। কোত্থেকে জিনিষগুলো চুরি করেছে কে জানে? লুভর্ থেকে করতে পারে।" অধ্যাপক হাসল। গল্পটা বলতে ওর খুব মজা লাগছিল। "একই ঘরে আছে এক সেট গদি বিহীন, কালো রঙের আসবাব, যার চেয়ারগুলোর হেলান দেওয়ার জায়গা উঁচু উঁচু। ভিয়েনা থেকে আনা একটা পিয়ানোও আছে। একটা হাতির দাঁতের কাজ করা টেবিল আছে; দেখে মনে হয় গেথে'র আমলের ভাইমার কৃষ্টির প্রতীক। অথচ সেই টেবিলকে এমন এক সোনালি-নীল টেবিল-ক্লথে ঢেকে রেখেছে যা মেঝেয় ঝোলে। আরেক টেবিলের ওপর এক ব্রোঞ্জের মূর্তি। অতি অপূর্ব রেখাঙ্কিত নগ্ন যুবতী। হাতে মশাল-রূপী আলো। কি আলো জ্বলে না। মূর্তিটা ঘরের পক্ষে অত্যন্ত বড়। প্রায় চাল ছোঁয়। হয়ত কোন পার্কে ছিল। এ ছাড়া আছে রকমারি ঘড়ির সংগ্রহ। হাতঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি, মেঝেয় দাঁড় করানো ঘড়ি, কফি টেবিলের আকারে ঘড়ি, মেঝেয় বসানো ঘড়ি যা উচ্চতায় ঘরের চাল ছোঁয়। কোন ঘড়িই চলে না। কোন সংগ্রহশালা থেকে নিয়ে আসা একটা অতিকায় বাটি আছে যার মধ্যে একটা মাত্র কমলা লেবু রাখা। আমি কেবল দুটো ঘর দেখেছি। তার মধ্যেই দেখেছি পাঁচটা আয়না, কোনটায় নক্সা-কাটা ওক্ কাঠের ফ্রেম লাগানো, কোনটা শ্বেত পাথরের পা-দানিতে বসানো। ছবির ইয়ত্তা নেই। সমুদ্রতীরের ছবি, পাহাড়ের ছবি, ইতালীয় শহরের পথের ছবি ...।" অধ্যাপক হেসে উঠল।

"লোকটা কোত্থেকে ওসব জোটাল?" নিজের পাছায় দু'হাত রেখে দাঁড়ানো সিবগাটউল্লা বিস্ময় প্রকাশ করল।

"কিছু যুদ্ধে লুট করা, আর কিছু পুরানো জিনিষের দোকান থেকে কেনা। পুরানো জিনিষপত্রের দোকানে একটি মেয়ে কাজ করত। মেয়েটির সঙ্গে ওর পরিচয় হয়। ও ওর নিজের সংগ্রহের বিক্রয় মূল্য নির্দ্ধারণ করার জন্য মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। শেষ পর্যন্ত ওদের বিয়ে হয়ে গেল। দু'জনের শক্তি এভাবে মিলিত হওয়ার পর থেকে ওরা যা কিছু মূল্যবান দেখত তার সবই নিজেদের জন্য রেখে দিত।"

"লোকটা ও ছাড়া আর কি কাজ করে?" আহমদজান না জেনে ছাড়বে না।

"কিস্সু করে না। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে অবসর নিয়েছিল। ওর গায়ে এখনো ষাঁড়ের মত শক্তি। বড় বড় গাছ কেটে ফেলার মত ক্ষমতা আছে। ওর সৎ-মেয়ে আর নাতনী ওর সঙ্গে থাকে। তাদের সঙ্গে কথা বলার কি ছিরিঃ 'আমি হুকুম করছি!' 'আমি এখানকার মালিক,' 'এ বাড়ী আমার বাড়ী!' ওভারকোটের ল্যাপেলে হাত গুঁজে এমন চলাফেরা করে যেন এক ফিল্ড মার্শাল। পাসপোর্ট অনুযায়ী ওর নাম ইয়েমেলিয়ান। কিন্তু কেন জানি

না, সবাই ওকে সাশিক্ বলে ডাকে। যাহোক, এত পেয়েও ও খুশি নয়। ও বিশেষতঃ এই জন্য অখুশি যে ও ফৌজের যে ডিভিশনে ছিল তার জেনারেল-এর কিসলোভদস্ক্-এ (উত্তর ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলে এক কেতাদুরস্ত স্বাস্থ্য উদ্ধার কেন্দ্র) দশ কামরাওলা বাড়ী, দুটো গাড়ী আর নিজস্ব বয়লার দেখভাল করার লোক আছে বাড়ী উত্তপ্ত রাখার জন্য)। অথচ আমাদের সাশিক্ অত দূর পৌঁছতে পারেনি।"

সবাই হেসে উঠল। পাভেলের গল্পটা ঢেখাপ্পা আর পুরোপুরি অনাকর্ষক লাগল। শুলুবিনও হাসল না। ও সবার দিকে এমন ভাবে তাকাল, যেন তাদের হাসিতে ওর ঘুম বিঘ্নিত হয়েছে।

"ভালই গল্প শোনালেন আপনি। বেশ মজা লাগছে," ওলেগ্ শোয়া অবস্থায় বলল, "কিন্তু লোকটা অত সব জোটালো কি করে?"

"আমাদের স্থানীয় খবরকাগজে এই ধরনের একটা ঘটনা ছেপেছিল। কবে বলো ত'? অল্প কিছু দিন আগেই বেরিয়েছিল," একজন রোগীর মনে পড়ে গেল। "কাগজ লিখেছিল, কোন একটি লোক নাকি সরকারের টাকায় নিজে একটা বাগান বাড়ী বানিয়েছিল। ধীরে ধীরে সব খবরই বেরিয়ে পড়ল। তার পর কি হ'ল জানেন? লোকটি স্বীকার করল সে একটা 'ভুল' করেছে, আর বাগান বাড়ীটা এক শিশু নিবাস কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিল। ফলে তাকে শুধু সরকার ভাবে সাবধান করে দেওয়া হ'ল। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হ'ল না।"

"হ্যাঁ, তাই হয়েছিল," সিবগাটভেরও ঘটনাটা মনে পড়ে গেল, "কিন্তু কেবল সাবধান করা হ'ল কেন? বিচার করা কেন হ'ল না?"

অধ্যাপক কাগজে ঐ বৃত্তান্ত পড়েনি। ফলে লোকটির কেন বিচার হ'ল না, অধ্যাপক তা ব্যাখ্যা করতে অপারগ। পাভেল সেই দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এল। "কমরেডগণ" পাভেল বলল, "লোকটি যদি নিজের ভুল বুঝে থাকে, যদি অনুতপ্ত হয়ে থাকে এবং বাগান বাড়ীটা এক শিশু নিবাস কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে থাকে, তবে আর তার বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেওয়ার কি দরকার? আমাদের মানবতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত কারণ ওটাই আমাদের মৌলিক..."

"আপনার এ প্রশ্নটা উদ্ভট মনে হতে পারে," ওলেগ্ শোয়া অবস্থায়ই বলল, "আপনি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর কি ব্যাখ্যা দেবেন—সাশিক্ আর তার বাগান বাড়ীর?"

অধ্যাপক এক হাতে নিজের গলা চেপে ধরে, অপর হাত বিস্তার করে বলল, "দুর্ভাগ্যক্রমে ওগুলি বুর্জোয়া মনোবৃত্তির অবশিষ্টাংশ।"

"বুর্জোয়া কেন?" ওলেগ আপত্তি জানাল।

"কেন, তোমার মতে আর কি হতে পারে?" ভাদিম বই থেকে মুখ তুলে

বলল। ওর পড়ার মেজাজ থাকলেও সারা ওয়ার্ড যেখানে ঝগড়ায় মেতেছে ও সেখানে পড়ে কি করে।

ও বালিশে ভর দিয়ে মাথা তুলল। "আমার মতে? আমার মতে এটা নিছক লোভী মনোবৃত্তি। বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভবের আগেও লোভী মানুষ ছিল। পরেও থাকবে।"

পাভেল অত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ও নিজের বেড থেকে ওলেগ্‌কে দেখল, আর পাণ্ডিত্য জাহির করল, "এ ধরণের মানুষের উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে মানুষটি বুর্জোয়া সামাজিক উৎস থেকে উদ্ভূত।"

ওলেগ্‌ এমন মাথা ঝাঁকাল যেন থুথু ফেলছে। "এই 'সামাজিক উৎস' কথাটা সম্পূর্ণ অর্থহীন।"

"'অর্থহীন' মানে? আপনি কি বলতে চান?" পাভেলের কোমরে ছুরি বেঁধা ব্যথা খচ্‌ করে উঠল। ও কোমরে হাত দিল। ও হাড্ডিচুষের থেকে এত নগ্ন আক্রমণ প্রত্যাশা করেনি।

"হ্যাঁ, 'অর্থহীন' বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?" ভাদিম বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকিয়ে বলল।

"আমি যা বলেছি তাই বোঝাতে চাই," ওলেগ্‌ সোজা হয়ে বসে, সজোরে বলল, "তোমাদের মগজে যে একগাদা অর্থহীন ধারণা পোরা আছে এটা তাদেরই একটা।

"'মগজে পোরা আছে' মানে? আপনি যা বলছেন তা কি দায়িত্বসহ বলছেন?" পাভেলের তীব্র প্রতিবাদ শোনা গেল। ওর শারীরিক ক্ষমতা যেন হঠাৎ ফিরে এসেছে।

"কার মগজে পোরা আছে?" এক পায়ের ওপর বই রেখে, সিধে হয়ে বসে ভাদিম বলল।

"তোমাদের।"

"আমরা রোবট নই," ভাদিম মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আমরা অপরের ধ্যান-ধারণার তাবেদারি করি না।"

"'আমরা' বলতে কাকে বোঝাচ্ছ?" চোখের সামনে নেমে আসা এক গোছা চুল নিয়ে ওলেগ্‌ চোখ পাকাল।

"'আমরা' অর্থাৎ আমাদের এই প্রজন্ম।"

"বেশ, তবে তোমরা সামাজিক উৎসের বুলি কপচাও কেন? ওটা ত' মার্ক্সবাদ নয়। ওটা স্রেফ জাতিভেদ তত্ত্ব।"

আপনি কি বললেন?" আহত পাভেল গর্জে উঠল।

"আপনি যা শুনলেন ঠিক তাই বলেছি," ওলেগ্‌ জবাব দিল।

"আপনারা সবাই শুনলেন! সবাই শুনেছেন!" পাভেল টলমল করতে করতে দু'হাত আস্ফালন করে ওয়ার্ডের সকলকে আহ্বান জানাল, "আমি

আপনাদের সাক্ষী করব। হ্যাঁ, সাক্ষী রাখব। এ স্রেফ আমাদের মতাদর্শের প্রতি অন্তর্ঘাত!"

ওলেগ্ চট করে বেড থেকে নামল। দু'হাত দিয়ে পাভেলের প্রতি এক কুৎসিত ইঙ্গিত করে সবচেয়ে নোংরা খিস্তিতে ফেটে পড়ল: "যান, আপনার মতাদর্শের প্রতি অন্তর্ঘাতকে নিয়ে আপনি ——! খাসা অভ্যেস জুটিয়েছ, মায়ের ···কেউ ভিন্ন মত প্রকাশ করলেই তা হবে মতাদর্শের প্রতি অন্তর্ঘাত!"

নোংরা লোকটার কুৎসিত ভাষা আর অঙ্গভঙ্গী, তার সঙ্গে ওর উদ্ধত ভাবে আহত এবং অপমানিত পাভেলের কথা হারিয়ে গেল। ওর চশমা নিচে নেমে এসেছিল। ও চশমাটা ঠিক মত পরার চেষ্টা করল। ওলেগ্ এত চিৎকার করে কথা বলছিল যে বারান্দা থেকেও ওর গলা শোনা যাচ্ছিল। (জোয়া একবার দরজায় উঁকি দিয়ে দেখে গেল) "ভূত ছাড়ানো ওঝার মত আপনারা কেবলই সামাজিক উৎসের বুলি কপচান কেন, শুনি? এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কি বলত জানেন? বলত, 'হাতের কড়া দেখাও। তোমার হাত দুটো এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর মোলায়েম কেন?' তার জায়গায় এসেছে আপনাদের মার্ক্সবাদ!"

"আমি শ্রমিক ছিলাম। আমি নিজের হাত দিয়ে কাজ করেছি," পাভেল প্রতিবাদ জানাল। কিন্তু ও চশমা ঠিক মত পরতে পারছিল না বলে প্রতিপক্ষকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না।

"আমি আপনার দাবী মানছি।" ওলেগ্ অভদ্রভাবে চেঁচিয়ে বলল, "আমি এও মেনে নেব যে আপনি শনিবারের কাজে [মজুরিবিহীন স্বেচ্ছা কায়িক শ্রম কমিউনিস্ট শিক্ষার অঙ্গ ছিল, যার থেকে অফিস-আদালত ইত্যাদির কর্মচারীরাও রেহাই পেত না] মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি বয়েছেন। কিন্তু আপনি পুরোটা যাননি, মাঝপথে থেমে গিয়েছিলেন। অথচ আমি ব্যবসায়ীর ছেলে, অর্থাৎ আপনাদের সজ্ঞায় তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ হয়েও সারা জীবন কায়িক পরিশ্রমে ঘামের সঙ্গে দেহের রক্তও বইয়ে দিয়েছি। এই যে, আমার কড়া পড়া হাত দেখুন। আমাকে কি বলবেন—বুর্জোয়া? আমার রক্তের লোহিত কণিকা কি আপনার থেকে আলাদা ধরণের? সেই জন্য আমি আপনাদের মতবাদকে শ্রেণী বৈষম্য না বলে জাতি বৈষম্যমূলক বলব। আপনি জাতি বৈষম্যবাদী।"

"কি! আমি কি?"

"আপনি জাতি বৈষম্যবাদী!" ওলেগ্ সোজা হয়ে দাঁড়াল।

অন্যায়ভাবে অপমানিত পাভেল তীক্ষ্ম চিৎকার করে কিছু বলল। ভাদিম বেড থেকে না উঠেই খুব দ্রুত কিছু বলে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করছিল। কিন্তু ওর কথা কেউ শুনতে পেল না। অধ্যাপক তার পরিপাটি চুল ছাঁটা, শোভিন আকারের মাথা নেড়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করছিল। কিন্তু ওর অসুস্থ গলার আওয়াজ কার কানে পৌঁছবে?

অধ্যাপক ওলেগের কাছে সরে এল। ওলেগ্ নতুন করে দম নেবে এমন সময় ওর কানে কানে বলল, "ঐ কথাটা শুনলেন কি—'সর্বহারা বংশজ'?"

"কারো দশ-দশটি সর্বহারা পিতামহ, প্রপিতামহ এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ থাকলেও কিছু আসে যায় না। কেউ নিজে শ্রমিক না হলে সে সর্বহারা হতে পারে না।" ওলেগ্ এবার পাভেলের উদ্দেশ্যে বলল, "উনি সর্বহারা নন, উনি কুকুর বাচ্চা। যে একটি মাত্র জিনিষ উনি ভালবাসেন তা হ'ল, বিশেষ অবসর ভাতা। আমি ওঁকে একথা বলতে শুনেছি।" ওলেগ্ দেখল পাভেল মুখ খোলার চেষ্টা করছে। এবার ওকে মোক্ষম ঘা দিল। "আপনি দেশকে ভালবাসবেন কেন, আপনি ভালবাসেন অবসর ভাতা। যত তাড়াতাড়ি তা পাওয়া যায় ততই আপনার ভাল। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে অবসর ভাতা পেলে মন্দ কি? আর আমি······ভরোনিয়েজ্-এ যুদ্ধে জখম হয়ে কি পেয়েছি জানেন? এক জোড়া তালি মারা বুট পেয়েছি। তবু আমি দেশকে ভালবাসি। এই দু'মাস ধরে অসুস্থ হয়ে আছি, কিন্তু অসুস্থতার দরুণ কোন সাহায্য পাইনি। তা না পাই, তবু আমার দেশকে ভালবাসি।"

ওলেগের আস্ফালন করা লম্বা হাত দুটো পাভেলকে আঘাত করে আর কি। উত্তপ্ত বাক্‌যুদ্ধে নেমে ওলেগ্ হঠাৎ চটে গিয়েছিল। অতীতে কারাগারেও অনেকবার ঐ রকম করেছে। ওর মনে তখন অতীতে শোনা বিশেষ বাক্যাংশ আর যুক্তি-তর্কের বন্যা বইছিল। ঐসব বাক্যাংশের উদ্ভাবনকারীরা হয়ত অনেক কাল আগেই পরলোকগত হয়েছে।

তর্কের ঝড়ে ওলেগের মন স্থানান্তরিত হয়েছিল। সব দিক থেকে ঘেরা, বেড আর মানুষে ঠাসা ক্যানসার ওয়ার্ড তখন কারা কুঠরীতে রূপান্তরিত। তাই ওর পক্ষে অশ্লীল গালি-গালাজ করাও সহজ। আর লড়াই করা প্রয়োজন হলে, ও লড়াই করতেও প্রস্তুত।

ওলেগের তখন এমন মানসিক অবস্থা যে পাভেলের মুখে ঘুষি কষিয়ে দিতে ও একটুও ভাববে না। পাভেল বিপদের সম্ভাবনা বুঝে তফাতে সরে নীরবে ওলেগের বাক্যবাণ সহ্য করল। কিন্তু ওর চোখ দুটো রাগে জ্বলছিল।

"আমি অবসার ভাতা চাই না," ওলেগ চিৎকার করল, "আর, আমার এক কপর্দকও মজুদ নেই। সেটাই আমার গর্ব। আমি কিছু পাওয়ার ফিকিরে নেই। মোটা মাইনের চাকরিও চাই না। আমি ওসব ঘেন্না করি।

"শ্-শ্-শ্!" অধ্যাপক ওকে থামানোর চেষ্টা করল, "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেতন কাঠামোয় বৈষম্য মেনে নেওয়া হয়েছে"

"চুলোয় যাক আপনার বৈষম্য।" ওলেগ্ ফুঁসে উঠল, "আপনাদের মতে সাম্যবাদী লক্ষ্যে পেঁছিতে হলে এখন যারা বাড়তি সুযোগ-সুবিধে ভোগ করছে তাদের সুযোগ-সুবিধেগুলো বাড়াতে হবে, তাই ত'? অর্থাৎ সাম্য পাওয়ার আগে বৈষম্য বাড়াতে হবে? এই কি আপনাদের তথাকথিত দ্বন্দ্ববাদ?" ওলেগের চিৎকারে ওর পেটে ব্যথা লাগছিল। পেটের ব্যথায় ওর স্বর কাঁপছিল।

ভাদিম কয়েক বার ওলেগের কথার মাঝে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ওলেগের লুকানো শক্তির প্লাবনে সেসব ভেসে গিয়েছে। ওলেগের অবিশ্রাম যুক্তির স্রোতে ভাদিমের বক্তব্য দাঁড়াতে পারেনি। "ওলেগ্," ভাদিম ওকে বাধা দিয়ে বলল, "যে সমাজ এখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি তার সমালোচনা করা অত্যন্ত সহজ। মনে রাখতে হবে, এ সমাজের বয়স হয়েছে সবে মাত্র চল্লিশ বছর। আরে না, এখনো চল্লিশই হয়নি।"

"আমি এ সমাজের চেয়ে বয়স্ক নই," ওলেগ্ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "এবং চিরকালই এ সমাজের চেয়ে অল্প বয়সী রয়ে যাব। সুতরাং আমার কি করণীয়, সারা জীবন নীরব হয়ে থাকা ?"

অধ্যাপক একবার হাত তুলে ওলেগ্‌কে থামতে ইসারা করল। নিজের গলার অসুবিধের দোহাই দিয়ে, জাতীয় উৎপাদনে প্রতিটি ব্যক্তির ভিন্ন ধরনের অবদান আর হাসপাতালের ঝাড়ুদার এবং স্বাস্থ্য সেবার ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মীদের মধ্যে বৈষম্যের আবশ্যকীয়তা সম্পর্কে দু'চারটে কথা ওলেগ্‌কে ফিসফিস করে বলল।

ওলেগ্ অধ্যাপকের বক্তব্যের প্রতিবাদে হুঙ্কার করে কিছু যুক্তি স্থাপন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখল সকলের দ্বারা বিস্মৃত শুলুবিন দোরগোড়ায় তার অবস্থান থেকে সামনে এগিয়ে আসছে। নোংরা, আলুথালু শুলুবিন এমন অগোছাল ভাবে ড্রেসিং গাউন পরেছে যেন মাঝ রাতে কেউ ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার ফলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। শুলুবিন বিটকেল ভাবে টলমল করতে করতে অধ্যাপকের কাছাকাছি এল, আর এক আঙুল তুলে সবাইকে নীরব হতে ইসারা করল। ও প্রশ্ন করল, "আপনি কি এপ্রিল-এর প্রস্তাবগুলি জানেন ?"

[এপ্রিল ১৯১৭-এ সুইজারল্যাণ্ড থেকে রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর লেনিন প্রস্তাবিত বৈপ্লবিক কর্মসূচী]

"কেন, আমারা সবাই জানি, জানি না ?" অধ্যাপক হাসল।

"আপনি প্রস্তাবগুলি ক্রমানুযায়ী বলতে পারেন ?" শুলুবিন ঘড়ঘড়ে স্বরে জিজ্ঞাসাবাদ করে চলল।

"মহাশয়, ঐ প্রস্তাবগুলি ক্রমানুযায়ী বলে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। এপ্রিল প্রস্তাবগুলিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবে উত্তরণের প্রক্রিয়া বলা হয়েছে। সেই অর্থে......"

"প্রস্তাবগুলির একটি আমার মনে পড়ছে," তামাক-রঙের ভাঁটা ভাঁটা, ক্লান্ত চোখের ওপর ঝাঁকড়া ভুরু দুটো নাচিয়ে শুলুবিন বলল, "প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'কোন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর বেতন কোন ভাল শ্রমিকের গড় বেতনের চেয়ে বেশী হবে না।' ঐ প্রস্তাব নিয়ে বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল।"

"তাই নাকি ?" অধ্যাপক অবাক, "আমার ত' মনে পড়ছে না।"

"বাড়ী গিয়ে পড়ে দেখুন। অতএব, আঞ্চলিক স্বাস্থ্য সেবা অধিকর্তা আমাদের নেলিয়ার চেয়ে বেশী মাইনে পেতে পারেন না।" শুলুবিন অধ্যাপকের মুখের ওপর আঙুল নেড়ে আপত্তি প্রকাশ করে, ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে নিজের জায়গায় ফিরে চলল।

"কেমন শুনলেন?" ওলেগ্ অপ্রত্যাশিত সমর্থন পেয়ে উৎফুল্ল। ওর ঐ ধরনের যুক্তি প্রয়োজন ছিল। শুলুবিন ওকে উদ্ধার করেছে। "ঐ কথাটা নিজের পাইপে গুঁজে আনন্দে ধূমপান করুন।"

অধ্যাপক তার গলার ধাতব পাতটা সোজা করে বসিয়ে নিল। ও উচিত জবাব খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশেষে বলল, "আপনি কি নেলিয়াকে ভাল শ্রমিক বলবেন?"

"নেলিয়াকে যদি ভাল শ্রমিক না বলা যায়, চশমা পরা পরিচারিকাটির সম্পর্কে কি বলবেন? ওরা দু'জনে কিন্তু, একই মাইনে পায়।"

পাভেল স্রেফ বসেছিল। ও ওদের কথাবার্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ওলেগ্‌কে অসহ্য লাগছিল। ও বিরক্তি আর অপমানে কাঁপছিল। অথচ লম্বা লম্বা হাত আর বজ্রমুষ্টি ওলেগের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় নেই। আর কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা জঘন্য পেঁচাটাকে ত' দেখা মাত্র বিরক্তি আসে। কি কথার ছিরি— আঞ্চলিক স্বাস্থ্য সেবা অধিকর্তাকে ঝাড়ুদারের সমান মাইনে দিতে হবে! পেঁচাটা আর কোন কথা খুঁজে পায় না? ওকথার জবাব দিয়ে কি হবে।

ওলেগ্ দেখল বিতর্কটা হঠাৎ থেমে গিয়েছে। কেউ আর তর্ক করতে আগ্রহী নয়। যাহোক ওর যতটুকু গলাবাজি করার ওলেগ্ তা ইতিমধ্যে করে ফেলেছিল। শরীরও ভাল লাগছিল না। আর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল।

গোটা তর্কযুদ্ধ ভাদিম বেডে বসেই দেখেছে। ও ওলেগ্‌কে কাছে ডেকে বসাল। শান্ত ভাবে বোঝাতে চাইল। "তোমার মূল্যবোধ ভ্রান্ত, ওলেগ্। তুমি বর্তমানকে আদর্শ ভবিষ্যতের সঙ্গে তুলনা করো, এটাই তোমার গলদ। তোমার বরং রুশ ইতিহাসের গলিত ঘা স্বরূপ ১৯১৭-পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করা উচিত।"

"আমি তখন জন্মাইনি। সে যুগ আমার অচেনা," ওলেগ্ হাই তুলল।

"সে আমল প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন নেই। চেষ্টা করলেই যথেষ্ট জানা যায়। সাল্তিকভ্-শেড্রিন-এর [১৮২৬-১৮৮৯'র মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত রুশ ব্যঙ্গ রচনাকার] লেখা পড়লেই জানবে। ওর চেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য তোমার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া দোকানের সাজানো জানলার মত পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রগুলোর কথাও ভাবা যেতে পারে। ঐসব গণতন্ত্রে কোন মানুষ কখনই তার অধিকার বা সুবিচার ত' পায়ই না, স্বাভাবিক জীবন যাপনও করতে পারে না।"

ওলেগ্ আরেকবার ক্লান্তিতে হাই তুলল। যে ক্রোধের উদ্গীরণে ও তর্ক-যুদ্ধে মেতেছিল তা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল। অত কথা বলার ফলে পেটে বা টিউমারে ব্যথা লাগছিল। ও আর জোরে কথা বলতে পারছিল না। "তুমি কি কখনো ফৌজে ছিলে, ভাদিম?"

"না, ছিলাম না। কেন?" "কেন ফৌজে যোগ দাওনি?"

"আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক অফিসারদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তালিম নিচ্ছিলাম," ভাদিম বলল।

"ও, আচ্ছা ...আমি ফৌজে ছিলাম। সিপাহী ছিলাম। পদ ছিল, সার্জেণ্ট। আমাদের ফৌজের নাম ছিল 'শ্রমিক-কৃষাণ ফৌজ'। আমাদের সেকশন কমাণ্ডার মাসে কুড়ি রুবল মাইনে পেত, কিন্তু প্লেটুন কমাণ্ডার পেত ছ'শো। রণাঙ্গণে আমাদের অফিসাররা বিশেষ র‍্যাশন পেত। ওদের র‍্যাশনে ডিবা-জাত খাদ্য, মাখন আর হরেক রকম সুখাদ্য দিত। ওরা তা আমাদের মত সাধারণ ফৌজীদের থেকে লুকিয়ে খেত। কেন জানো? লজ্জায় আমাদের সামনে খেতে পারত না। শুধু ঐটুকু নয়। আমাদের নিজেদের আশ্রয় তৈরি করার আগে ওদের জন্য আশ্রয় তৈরি করে দিতে হত। যেহেতু আমরা সিপাহী... ..."

ভাদিম ভ্রূকুটি করল। ও ওসব জানে না। ওলেগ্ যে অভিযোগ করল তার জন্য নিশ্চয় কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। ও বলল, "তুমি আমাকে এসব বলছ কেন?"

"কারণ আমি জানতে চাই বুর্জোয়া মনোবৃত্তি ঠিক কোন্‌খানে দেখা দিয়েছে, কার মধ্যে বুর্জোয়া মনোবৃত্তি দেখা গিয়েছে?"

এই মন্তব্যটা ছাড়াও ওলেগ্ আজ যথেষ্টর বেশী কথা বলে ফেলেছে। ও এই ভেবে স্বস্তি পেল যে ওর আর খোয়ানোর মত প্রায় কিছুই নেই। ও শব্দ করে হাই তুলল আর নিজের বেডে ফিরে চলল।

ওলেগ্ আরেকবার হাই তুলল। আরো একবার।

ওর অত হাই উঠছিল কেন, ক্লান্তি না রোগের জন্য? না, অত তর্ক-বিতর্ক, একাধিক কারিগরি শব্দ প্রয়োগ করা, তিক্ত, রুদ্ধ চাউনি শেষে শুধু কাদা মাঠে ঘুরে বেড়ানো মনে হয়ে অত হাই উঠল? ওদের রোগ যন্ত্রণা, চোখের সামনে দোদুল্যমান মৃত্যুর খড়্গের তুলনায় এসব শ্রান্তি নেহাতই অকিঞ্চিৎকর।

ওলেগ্ আসলে এমন কিছু চাইছিল যা এসব কিছুর থেকে ভিন্ন ধরনের, খাঁটি এবং পরিবর্তনের অতীত। কিন্তু, তা কোথায় মিলবে, সে ওলেগের অজানা।

আজ সকালেই ওলেগ্ কাদমিনদের চিঠি পেয়েছে। অন্য সব কথা ছাড়া নিকোলাই কাদমিন চিঠিতে এই বাক্যটির উৎস নির্দেশ করেছেন: 'নরম কথায় হাড় ভাঙে'। বাক্যটির উৎস পঞ্চদশ শতকের রুশ লোক-কথা সংগ্রহ। সংগ্রহটি পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া যায়। প্রাচীন লোক-কথা সংগ্রহের নিকোলাই এক

জহুরী)। ঐ সংগ্রহে কিতোভ্রাস-এর কাহিনী আছে। কিতোভ্রাস দুর্গম মরু অঞ্চলে থাকতেন এবং তিনি সরলরেখায় ছাড়া চলতে পারতেন না। এক দিন রাজা সলোমন কিতোভ্রাসকে ডেকে পাঠালেন। কিতোভ্রাস উপস্থিত হলে তাঁকে চাতুরি করে বন্দী করা হ'ল, এবং তাঁকে পাথর ভাঙতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। যেহেতু কিতোভ্রাস আঁকা-বাঁকা পথে চলতে পারতেন না, তাই তিনি জেরুসালেম-এ উপস্থিত হলে তাঁর পথরোধকারী ঘর-বাড়ী ভেঙে ফেলা হ'ল। পথে এক বিধবার কুঁড়ে ঘর ছিল। বিধবা কিতোভ্রাসের কাছে কাতর মিনতি করল, যেন দীন জনের কুঁড়েটিকে রেহাই দেওয়া হয়। কান্নায় বিচলিত কিতোভ্রাস, বিধবার কথা রাখলেন। তিনি অবিরাম ডান-বাঁয়ে বাঁকতে থাকলেন। অবশেষে তাঁর পাঁজরের একটা হাড় ভেঙে গেল।

বিধবার কুঁড়ে ঘর অক্ষত রইল। কিতোভ্রাস সঙ্গীদের বললেন, "নরম কথায় হাড় ভাঙে, আর কড়া কথায় রাগ বাড়ে।"

ওলেগ্ কিতোভ্রাস প্রসঙ্গে ভাবতে লাগল। ওর মনে হ'ল, পঞ্চদশ শতকের ঐ লেখক আর কিতোভ্রাসের তুলনায় আমরা এক একটি ক্ষিপ্ত নেকড়ে বাঘ। ক'টা মোলায়েম কথার জন্য কে আর আজ নিজের পাঁজর ভাঙতে চাইবে?

কাদমিনদের চিঠি, অবশ্য কিতোভ্রাসের কাহিনী দিয়ে শুরু হয়নি। ওলেগ্ নিজের টেবিলেই চিঠিটা খুঁজে পেল। কাদমিনরা লিখেছেন:

"প্রিয় ওলেগ্

আমাদের মন ভেঙে গিয়েছে। কারণ বিটল্ আর নেই।

রাস্তার কুকুরদের মেরে ফেলার জন্য গ্রাম পরিষদ দু'টি শিকারীকে ভাড়া করেছিল। শিকারীরা পথের কুকুরগুলোকে গুলি করে বেড়াচ্ছিল। আমরা টোবিক্কে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। কিন্তু বিটল্ বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে শিকারীদের দেখে ডাকাডাকি লাগাল। ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কোন কিছু ওর দিকে তাক করলে ও ভয় পেত। মনে আছে, তুমি ওর দিকে ক্যামেরা তাক করলে ও কি রকম ভয় পেত? ওরা বিটলের চোখে গুলি করল। ও এক সেচ নালার পাশে পড়ল। মাথাটা নালার ধার দিয়ে ঝুলতে থাকল। আমরা যখন দেখতে গেলাম ও তখনো ছটফট করছিল। ওর অত বড় দেহটা কি ভাবে ছটফট করছিল, সে চোখে দেখা যায় না।

জানো ত', বাড়ীটা একেবারে ফাঁকা লাগে। বিটল্‌কে লুকিয়ে রাখতে পারিনি বলে আমাদের অপরাধী মনে হয়।

চারা গাছগুলোর 'গ্রীষ্মাবাস'-এর পাশে এক কোণে ওকে কবর দিয়েছি।"

ওলেগ্ শুয়ে পড়ল। বিটলের কথা মনে ঘুরপাক খেতে থাকল। ওর মানশ্চক্ষে যে বিটল্ ফুটে উঠল সে এক চোখে গুলিবিদ্ধ, নালার ধার দিয়ে মাথা লটকিয়ে পড়া বিটল্ নয়। এ বিটল্ কাদমিনদের জানলায় দু'হাত তুলে, বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা বিটল্। ওর ভাল্লুকের মত বড় বড় কান দু'টো ওলেগের কুটীরের ছোট্ট জানলার পর্দার মত ঝুলন্ত।

ওলেগ্ কাদমিনদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, বিটল্‌কে ঐ রকম করে দাঁড়ানো দেখতে পেত। ওলেগ্ দরজা খুললে ওই প্রথম অভ্যর্থনা করত।

ওরা বিটল্‌কেও মেরে ফেলে দিল! কেন?

বৃদ্ধ চিকিৎসক

পঁচাত্তর বছরের জীবন আর পঞ্চাশ বছর যাবৎ চিকিৎসক পেশায় থেকে ডাঃ ওর্শচেংকভ্ কোন প্রস্তর নির্মিত ইমারত গড়ে তুলতে পারেনি। পেরেছিলেন, দ্বিতীয় দশক নাগাদ একটা ছোট্ট একতলা কাঠের বাড়ী, আর তার সঙ্গে এক ফালি বাগান গড়ে তুলতে। এক প্রশস্ত, মাঝখানে ফুলের কেয়ারি দেওয়া, শান্ত রাস্তার ওপর বাড়ীটা রাস্তা থেকে কম করে পনেরো গজ পেছিয়ে দাঁড়িয়ে। রাস্তার দু'পাশে চওড়া ফুটপাথ। ফুটপাথের জায়গায় জায়গায় বিগত শতাব্দী থেকে বেড়ে ওঠা গাছ। প্রাচীন গাছগুলোর গুঁড়িগুলো বেশ চওড়া। রাস্তার ওপর নিরবচ্ছিন্ন সবুজ ছাতি ধরে থাকে। প্রতি গাছের গোড়া পরিষ্কার করে লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা।

যতই প্রখর রোদ হোক না কেন ঐ রাস্তায় হাঁটতে কষ্ট হয় না। রাস্তার মাঝখান দিয়ে সেচের শীতল জলের নালা বয়ে গিয়েছে। শহরের সবচেয়ে সুন্দর অংশের ঐ রামধনু আকারের রাস্তাটা শহরের অন্যতম শোভাও বটে। কিন্তু নগর পালিকা অনুযোগ করে যে, ঐ অঞ্চলের একতলা বাড়ীগুলো যথেষ্ট কাছাকাছি অবস্থিত নয় বলে নাগরিক সেবাদি ব্যয় বহুল হয়ে পড়ে। ওরা একতলা বাড়ী ভেঙে বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ী গড়তে চায়।

ডাঃ ওর্শচেংকভের বাড়ীর কাছে বাস থামে না। ডণ্ট্সোভার কিছুটা হাঁটতে হ'ল। উষ্ণ, শুকনো গোধূলি। গাছেরা রাত্রি যাপনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিছু গাছের ডালে পাতার অংকুর দেখা দিয়েছে। কোন কোন গাছে বেশ ঘন, কোনটায়, তত ঘন নয়। কিন্তু মোমবাতি আকারের পপ্লার একটুও সবুজের ছোঁয়া লাগেনি। ডণ্ট্সোভা বেশীক্ষণ গাছের দিকে তাকাতে পারলেন না। চোখ নেমে এল। এ বসন্ত তাঁর আনন্দের বসন্ত হবে না। তাঁর আনন্দ নিলম্বিত হয়ে গিয়েছে। গাছে নতুন পাতা আসবে, পাতা হলুদ হবে, অবশেষে ঝরে যাবে। কিন্তু ততদিনে ডণ্ট্সোভার কি হবে, কেউ জানে না। অসুখটা ধরবার আগেও উনি সব সময় এত ব্যস্ত থাকতেন যে আয়েস করে পেছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে, চোখ কুঁচকিয়ে ওপর দিকে তাকানোর সুযোগই হয়নি।

ওর্শচেংকভের বাড়ীর সামনে প্রথমে একটা খড়খড়ির মত কাঠের পাতের দরজা। তারপর পিরামিড আকৃতির প্যানেলওলা, পেতলের হাতল লাগানো, পুরানো ধরনের সদর দরজা। এই ধরনের বাড়ীতে পুরানো ধরনের দরজা সাধারণতঃ খোলাই থাকে। নতুন দরজা টেনে ঢুকতে হয়। পুরানো দরজার

আগে দু'টো পাথরের সিঁড়ির ধাপ। ধাপ দু'টোয় ঘাস বা শ্যাওলা গজায়নি। একটা তামার প্লেটে হাতের লেখার হরফে লেখাঃ ডাঃ ভি. টি. ওর্শচেঙ্কভ্। তামার প্লেটটা অতীত কালের মতই ঝকঝকে পালিশ করা। একটা ছোট্ট বাটিতে বসানো বৈদ্যুতিক ঘণ্টি। ঘণ্টিটা দেখে অব্যবহৃত মনে হয় না।

ডণ্ট্সোভা ঘণ্টি টিপলেন। কয়েকটা পায়ের শব্দ শোনা গেল। ওর্শচেঙ্কভ্ স্বয়ং দরজা খুললেন। পরনে অতি ব্যবহৃত বাদামী স্যুট, যা এক কালে খুবই ভাল ছিল, আর টাই বিহীন শার্ট।

"আ, লুডোচ্কা!" ওর্শচেঙ্কভের ঠোঁটের কোণ ঈষৎ বাঁকল। ওটাই ওঁর দিলখোলা হাসি। "এসো ভেতরে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তোমাকে দেখে ভারি খুশি হয়েছি। অপর দিকে, তেমন খুশি হইনিও বটে। কোন ভাল খবর হলে ত' তুমি এ বুড়োর সঙ্গে দেখা করতে আসতে না।"

ডণ্ট্সোভা টেলিফোন করে দেখা করার অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন। উনি ফোনেই নিজের অসুখের কথা বলতে পারতেন, কিন্তু সেটা হত অভব্য আচরণ। এখন অপরাধীর মত ওর্শচেঙ্কভ্‌কে বলতে হ'ল, উনি নিজের প্রয়োজন ছাড়াও দেখা করতে আসতেন·· ডণ্ট্সোভার কোট খোলায় ওর্শচেঙ্কভ্ সাহায্য করতে এগোলেন। কিন্তু বিনয়ের দরুণ ডণ্ট্সোভা ওর্শচেঙ্কভের সহায়তা নিতে চাইছিলেন না। ওর্শচেঙ্কভ্ বললেন, "আমাকে ঐটুকু সেবা করার অনুমতি দাও। আমি বুড়ো হয়ে গেলেও, ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইনি।"

ওর্শচেঙ্কভ্ ডণ্ট্সোভার কোট একটা লম্বা, কালচে পালিশ করা কোট-র‍্যাকে রেখে দিলেন। অত বড় কোট-র‍্যাকে আরো অনেক অতিথির কোট ধরতে পারে। মসৃণ পালিশ করা কাঠের মেঝে। ডণ্ট্সোভাকে নিয়ে বাড়ীর সবচেয়ে সুন্দর আর আলো ঝলমল ঘরের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। ঐ ঘরে একটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো আর, একটা সুরের বই স্ট্যাণ্ডের ওপর খোলা অবস্থায় রাখা। ঐ ঘরে ডাক্তারের বড় নাতনি বাস করেন। ওঁরা ডাইনিং রুমে এলেন। এ ঘরের জানলাগুলোয় শুকনো আঙুর লতা ঝুলন্ত। জানলা দিয়ে উঠোন দেখা যায়। একটা বড় এবং দামী রেডিওগ্রাম রাখা। এর পর ওঁরা দু'জন রোগী দেখবার ঘরে এলেন। এ ঘরে সারি সারি বইয়ের আলমারি, পুরানো ধরনের ভারী, লেখার টেবিল, কয়েকটা আরাম দায়ক চেয়ার আর একটা পুরানো সোফা।

"বাঃ," ডণ্ট্সোভা আলমারির বইগুলো দেখে বললেন, "আপনি আরো অনেক বই সংগ্রহ করেছেন দেখছি।

"না, না, তা ঠিক নয়," মৃদু মাথা নেড়ে ওর্শচেঙ্কভ্ জবাব দিলেন। ওঁর মাথাটা যেন কোন ধাতু দিয়ে ঢালাই করা। মৃদু মাথা নাড়ার মত ওঁর সব ভাব-ভঙ্গীই মৃদু! "অনেক নয়। সম্প্রতি কয়েক ডজন কিনেছি বটে। কার থেকে কিনেছি জানো?" উনি একটু খুশি-খুশি ভাবে তাকালেন। ওঁর সঙ্গে

পরিচিত না হলে ভাবের এই মৃদু পার্থক্য বোঝা সম্ভব নয়। "আমি কাজ্‌-নাচেয়েভ্‌-এর থেকে কিনেছি। ও সবে ষাট বছর বয়স হয়ে অবসর গ্রহণ করেছে। ঠিক ওর অবসর গ্রহণের দিন জানলাম, ও মনের দিক থেকে কখনই রশ্মি-চিকিৎসক ছিল না। অবসর গ্রহণের পর এক দিনও ডাক্তারি করবে না। ওর চিরকালই মৌমাছি পালন করার ইচ্ছে। এখন থেকে শুধু মৌমাছি পালনে মন দেবে। ওর পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হ'ল বলতে পারব না। ও যদি মৌমাছি পালনেই অত আগ্রহী হয়ে থাকে তবে জীবনের সেরা বছরগুলো অন্য কাজ নিয়ে কাটাল কি করে, কে জানে? যাকগে, এবার বলো কোথায় বসবে, লুডোচ্‌কা?" ডন্টসোভা এক পাকা চুল ঠাকুমা হলেও উনি এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন ডন্টসোভা এখনো এক খুকি আছেন। "এই যে, এই চেয়ারটায় বসো। এটা আরামদায়ক।"

"আমি বেশীক্ষণ বসব না, স্যার। মাত্র মিনিট কয়েকের জন্য দেখা করতে এসেছি," ডন্টসোভা নরম চেয়ারের গভীরে বসে বললেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, এই ঘরে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা হবে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত। যত স্থায়ী দায়িত্ব, প্রশাসনের ভার, নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়, সবই বারান্দার মুখে রাখা কোট-র‍্যাকে কোট ঝোলানোর পর ডন্টসোভার কাঁধ থেকে নেমে গিয়েছে। চেয়ারের গভীরে আরাম করে বসবার পর তাঁর সমস্যাগুলি কাটতে আরম্ভ করেছে। নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আরাম করে বসে ডন্টসোভা তাঁর সুপরিচিত ঘরটা ভাল করে দেখতে লাগলেন। শ্বেত পাথরের হাত ধোয়ার বেসিনটা এখনো অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে দেখে ভাল লাগল। বেসিনটা তেমনি সাফ-সুতর, আর ঢাকা দেওয়া।

ডন্টসোভা ওর্শচেংকভের দিকে সোজাসুজি তাকালেন। উনি যে এখনো সক্রিয় আছেন, দেখে ভাল লাগল। উনি ডন্টসোভার সব উৎকণ্ঠা মুছে দেবেন। ওর্শচেংকভ্‌ একটুও না নুয়ে দাঁড়ান। মাথা একেবারে সোজা। চিরকালই তাঁর এই আত্মবিশ্বাস ভরা চেহারা। যেন যেহেতু তিনি অপরের চিকিৎসা করেন, তিনি সুনিশ্চিত যে তিনি একটুও অসুস্থ হবেন না। পরিপাটি ছাঁটা একটু রুপালী দাড়ি চিবুকে শোভিত। মাথায় এখনো যথেষ্ট চুল আছে, যার সবটা পাকেনি। চুলের মসৃণ, চিকচিকে ভাব বহু বছরের মধ্যে প্রায় বদলায়নি। মুখের আকার এমন যা আবেগে কম্পিত হয় না। মুখের রেখাগুলো আগের মতোই মসৃণ আর যথাস্থানে রয়ে গিয়েছে। শুধু নতুন হয়েছে ওঁর ভুরু দুটো ধনুকের মত বেঁকে ওঠার অভ্যাস। ওতেই ওঁর মনোভাব পুরোপুরি ফোটে।

"তুমি যদি কিছু মনে না করো, লুডোচ্‌কা," ওর্শচেংকভ্‌ বললেন, 'আমি ঐ টেবিলে বসব। তুমি ভেবো না যে এটা আমার একটা পেশাদারী আচরণ। আমি স্রেফ ঐ টেবিলে বসতেই অভ্যস্ত।"

উনি অভ্যস্ত না হওয়াই আশ্চর্যের বিষয় হত। রোগীরা এই ঘরেই আসত। প্রথম প্রথম প্রায় রোজই ঘন ঘন রোগীর আসা যাওয়া লেগে থাকত। তারপর কমে গিয়েছিল। এখনো রোগী আসা থামেনি। কোন কোন রোগীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে হত। দীর্ঘ, বেদনাময় সেই কথাবার্তার ওপর তাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করত। কথোপকথন বিবিধ মোড় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় সবুজ চামড়ার প্যাড লাগানো, গাঢ়-বাদামী রঙের ওক্ কাঠের টেবিলটা রোগীদের বাকি জীবনের স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে যেত। তার সঙ্গে স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে যেত কাঠের তৈরি, পুরানো, কাগজ-কাটা ছুরি, নিকেল প্লেটিং করা স্প্যাটুলা যার সাহায্যে উনি গলার ভেতরে দেখতেন, রোজ তারিখ বদলিয়ে দিতে হয় এমন টেবিল-ক্যালেণ্ডার, তামার ঢাকনিওলা কালির দোয়াত, আর ডাক্তারের প্রিয়, অত্যন্ত কড়া এবং গাঢ়-বাদামী রঙের চা, যা গেলাসেই ঠাণ্ডা হয়ে যেত। ডাক্তার ঐ টেবিলে বসে রোগী দেখতেন। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে বেসিনে হাত ধুতেন কিংবা বইয়ের আলমারি ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। রোগীরা তাঁর খর দৃষ্টি থেকে ক্ষণিক রেহাই আর কিছু ভাববার অবসর পেত। ওর্শচেংকভ্ কখনো অকারণে কোন দিকে তাকাতেন না। রোগী বা অন্য সাক্ষাৎকার প্রার্থীদের প্রতি তাঁর ছিল সদা জাগ্রত দৃষ্টি। নিরীক্ষণের সামন্যতম সুযোগও চোখ দুটো হারাত না। চোখ দুটো জানলার দিকে বা টেবিলে রাখা কাগজগুলোর দিকে অকারণে তাকাতে জানত না। রোগী এবং ছাত্রদের বোঝার জন্য কিংবা নিজের ইচ্ছে বা সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য চোখ দুটোই ছিল তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র।

ওর্শচেংকভের জীবনে অনেকবার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। প্রথম ১৯০২ সালে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের জন্য তাঁর কয়েকটি সহপাঠীর সঙ্গে এক সপ্তাহের ওপর কারাবাস হয়। পরবর্তী নির্যাতন হয় এই কারণে যে তাঁর পরলোকগত পিতা এক পুরোহিত ছিলেন। তার পরের নির্যাতন হয় কারণ তিনি 'প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে' [সোভিয়েত দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে এই নামে অভিহিত করা হত] জারের ফৌজে চিকিৎসা আধিকারিক ছিলেন। (জারের ফৌজে চিকিৎসা আধিকারিক থাকার জন্য ওর্শচেংকভের নির্যাতন হয়নি। তাঁর রেজিমেণ্ট যখন অত্যন্ত ভয় পেয়ে পশ্চাদপসরণ করছিল, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যে জানা যায়, ওর্শচেংকভ্ তখন রেজিমেণ্টকে সংহত করে জার্মানদের প্রতিরোধ করেন, তার ফলে 'সাম্রাজ্যবাদীদের' হাতে জার্মান শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটে) সবচেয়ে লাগাতার আর কষ্টদায়ক নির্যাতন সইতে হয়েছিল ক্রমবর্দ্ধমান কড়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বেসরকারী চিকিৎসা পেশার অধিকার বজায় রাখার স্বার্থে অটল সংগ্রামের জন্য। ওর্শচেংকভের বেসরকারী চিকিৎসা পেশা এক ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির উপায়, তাঁর ঐ কাজকর্ম সৎ কায়িক শ্রম নয়, অতএব নিয়ত বুর্জোয়া শ্রেণী বৃদ্ধির উৎস। ঐ বছরগুলোতে তাঁর তামার নাম-ফলক খুলে ফেলে, সব রোগীকে ফিরিয়ে দিতে

হয়েছিল। রোগীরা যত অসুস্থই হোক বা যত মিনতিই করুক, তাঁর চিকিৎসা করার উপায় ছিল না। কারণ তাঁর পড়শীদের অনেকে কর বিভাগের চর ছিল। কেউ বেতনভুক, কেউ স্বেচ্ছাসেবী চর। তাছাড়া রোগীদের মুখে চাপা দেওয়া যেত না। চিকিৎসা করলে, ওঁর সব কাজ বন্ধ করে দেওয়ার, এমন কি বাড়ী কেড়ে নেওয়ার ধমক দেওয়া হয়েছিল।

বেসরকারী চিকিৎসা পেশা বজায় রাখার অধিকারকে ওর্শেভ্কভ্ অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। দরজায় নিজের নাম-ফলক না থাকা তাঁর কাছে বেআইনিভাবে অজ্ঞাতবাসের সমান। উনি তেমনি পি. এইচ. ডি. গবেষণাপত্র দাখিল করার নীতিগত দিক থেকে বিরোধী ছিলেন। ওঁর আপত্তির কারণ দৈনন্দিন চিকিৎসায় সফলতা গবেষণাপত্রে প্রতিফলিত হয় না। তাছাড়া রোগীরা কোন অধ্যাপককে দিয়ে চিকিৎসা করাতে ইতস্ততঃ করে। সবচেয়ে বড় কথা, পি এইচ্. ডি'র জন্য গবেষণাপত্র দাখিল করতে যে সময় লাগে তার মধ্যে চিকিৎসার অপর কোন শাখায় ভালভাবে জ্ঞান আহরণ করা চলে। ওর্শেভ্কভ্ স্থানীয় মেডিক্যাল কলেজে তিরিশ বছর ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি অন্যান্য কাজ ছাড়া সাধারণ চিকিৎসা বিভাগ, শল্য চিকিৎসা, শিশু রোগ, মহামারী, মূত্র সংক্রান্ত বিভাগ এমন কি চক্ষু বিভাগেও কাজ করেছেন। এসব করার পরই রশ্মি-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ আর ক্যানসার বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। 'সম্মানিত বিজ্ঞানী'দের সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে গেলে ওঁর ঠোঁটের কোণ কুঁচকিয়ে ওঠে। ওঁর ধারণা কোন ব্যক্তি যদি তাঁর জীবিত কালেই 'বিজ্ঞানী' আখ্যা পান এবং তার সঙ্গে 'সম্মানিত' কথাটিও জুড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি ডাক্তার হিসাবে শেষ হয়ে যাবেন। ঐ উপাধির সম্মান এবং গর্ব চিকিৎসার অন্তরায় হবে, যেমন পোষাকের বাহুল্যে মানুষের স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়। এই 'সম্মানিত বিজ্ঞানীরা' এক গাদা স্তাবক নিয়ে চলাফেরা করেন, যেন শিষ্য পরিবৃত নব যীশু। তাঁরা ভুল করার, কোন কিছু না জানার, এবং কোন বিষয় সম্পর্কে ভাবতে সময় চাওয়ার অধিকার খুইয়ে বসেন। তাঁরা আত্মতুষ্ট, সেকেলে, অর্ধ-অজ্ঞ, এবং নিজেদের সেকেলে এবং অর্ধ-অজ্ঞ ভাব ঢাকতে সচেষ্ট হন। তবু জনগণ তাঁদের চিকিৎসা জগতের যাদুকর মনে করে। ওর্শেভ্কভ্ ঐসব সম্মান কোন দিন চাননি। উনি যা চেয়েছেন তা হ'ল বাড়ীর দরজায় নিজের নাম-ফলক আর তার সঙ্গে একটি ঘণ্টি যা যেকোন পথচারী প্রয়োজনে বাজাতে পারবে।

ভাগ্যগুণে উনি এক স্থানীয় অতি হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তির ছেলের চিকিৎসা করেছিলেন। ছেলেটিকে মৃত্যুর মুখ থেকে সারিয়ে তুলেছিলেন। আরেকবার এক আরো বড় হোমড়া-চোমড়ার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তাছাড়া এমন বেশ ক'জনের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন যাদের পরিবারবর্গ ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ সবই এই শহরে ঘটেছিল, কারণ ওর্শেভ্কভ্ আর কোন শহরে কখনো স্থায়ী ভাবে বসবাস করেননি। ফলে প্রভাবশালী মহলে ওঁর খ্যাতি ত' সুপ্রতিষ্ঠিত

হ'লই, তার সঙ্গে ওঁকে ঘিরে এক সুরক্ষা বলয়ও রচিত হ'ল। কোন খাঁটি রুশ শহরে এত সবেও হয়ত বিশেষ সুবিধে হ'ত না, কিন্তু রুশ সাধারণতন্ত্রের পূব দিকের এই শহরের হালচাল অনেক সহজ। উনি যে আবার নিজের নাম-ফলক টাঙিয়ে নতুন করে রোগী দেখছেন, এ ওরা দেখেও দেখল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উনি আর কোন স্থায়ী চাকরি করেননি। বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন আর বৈজ্ঞানিক সভা-সমিতিতে যাতায়াত করেন। অর্থাৎ পঁয়ষট্টি বছর বয়সের পর থেকে উনি এক রকম মুক্ত জীবন যাপন করছেন। ওঁর ধারণা, ডাক্তারের পক্ষে তা প্রয়োজন।

"স্যার, আমি আপনাকে দিয়ে আমার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিন্যাল (পাকস্থলী এবং নিকাশী ব্যবস্থা) পরীক্ষা করাব বলে এসেছিলাম। কোন্ দিন আপনার সুবিধে হবে যদি বলেন, তবে সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।" ডণ্ট্সোভাকে ধূসর দেখাছিল। কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল।

ওশ চেঙকভ্ ওঁকে স্থির দৃষ্টিতে দেখলেন! ওঁর দৃষ্টি একটুও নড়ল না, ভুরু জোড়ায় একটুও বিস্ময় ফুটল না। "নিশ্চয় দেখব, লুডোচ্কা। একটা দিন স্থির করে নেওয়া যাবে। তার আগে কি কি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এবং তাদের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, আমাকে খুলে বলো।"

"লক্ষণগুলো বলছি, কিন্তু লক্ষণগুলো সম্পর্কে আমার ধারণা——আপনি বুঝতে পারেন, আমি ভাববার চেষ্টা করি না। মানে, খুব বেশী ভাবনা এড়িয়ে চলতে চাই। তাতেও রাতে ঘুম হয় না। যদি আমি ঐ বিষয়ে আর একটুও না জানতে পারি, তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। আমি গুরুত্ব দিয়েই একথা বলছি। আপনি যদি কোন হাসপাতালে ভর্তি হতে বলেন, ভর্তি হবো। কিন্তু এ সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে চাই না। আমাকে অপারেশন করা প্রয়োজন হলে, রোগ নির্ণয় সম্পর্কে একটুও জানতে চাই না। জানলে, অপারেশনের মধ্যেও ভাবতে থাকব, ওরা আমার কোনখানটা কাটছে, কি কেটে বাদ দেবে? ……বুঝতে পেরেছেন ত'?"

চেয়ারের আকার দেহের তুলনায় বড় হওয়ার জন্য হোক, বা ওঁর কাঁধ দু'টো ঝুলে পড়ার দরুণই হোক, ডণ্ট্সোভাকে আর বড-সড় চেহারার, বলিষ্ঠ মহিলা দেখাচ্ছিল না। উনি চুপসিয়ে গিয়েছিলেন।

"বুঝতে পারছি কিনা? হ্যাঁ, তোমার কথা বুঝতে পেরেছি, লুডোচ্কা। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে এক মত নই। অপারেশনের কথা প্রথমেই ভাবছ কেন, বলো ত'?"

"মানে আমার ত' তার জন্য তৈরি থাকতেই হবে, তাই……"

"তাহলে তুমি আরো আগে কেন এলে না? আর সবার কথা ছেড়ে দিলেও, তুমি ত' আসতে পারতে…"

"দেখুন, স্যার··" ডণ্ট্সোভা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "জীবনে অবসর আর কবে পেলাম। একটার পর আরেকটা ঝামেলা লেগেই থাকে। অবশ্যই আমার

আরো আগে আসা উচিত ছিল…কিন্তু, ভাববেন না যে অসুখটা অনেক দূর গড়ানোর পর এসেছি।” ডণ্টসোভা ওর্শচেংকভ্‌কে বোঝানোর চেয়ে বেশী নিজের মনকে সাফাই দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে উনি নিজের কেজো ভঙ্গী কিছুটা ফিরে পেয়েছিলেন। “আমি অত অবিবেচক হতে যাব কেন? আমি নিজে একজন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ হয়েও, সব রকমের ক্যানসার সম্পর্কে পুরোপুরি জেনেও, ক্যানসারের আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলি চিনেও, তার সম্ভাব্য ফলাফল আর জটিলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েও কেন কোন এক ধরনের ক্যানসার রোগগ্রস্ত হতে চাইব?”

“এটা বিবেচনার অভাব নয়,” ওর্শচেংকভ্‌ বললেন। ওঁর কণ্ঠস্বর ভারী এবং মাপা, যাতে ওঁর বক্তব্য সহজে শ্রোতার মনে গেঁথে যায়, “বরং এটাই উচ্চতম মানের বিবেচনা। কোন ডাক্তার যে রোগের বিশেষজ্ঞ সে যদি সেই রোগে পড়ে তবেই তার নির্ভুল পরীক্ষা হয়।”

(এর মধ্যে বিবেচনার প্রশ্ন আসে কি করে? নির্ভুল পরীক্ষা! ওঁর পক্ষে ঐকথা বলা সম্ভব, যেহেতু উনি নিজে রোগে পড়েননি।)

“প্যানিয়া ফিওদোরোভা-কে মনে পড়ে, যে নার্স ছিল,” ওর্শচেংকভ্‌ বলে চললেন, “তার মুখের কথাই ছিল, 'রোগীদের সঙ্গে আমার আচরণ এত রূঢ় হয়ে গিয়েছে যে আমার নিজের রোগী হিসেবে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া উচিত'…”

“আমি কিন্তু, কখনো ভাবিনি যে আমারই কঠিন রোগে পড়তে হবে,” ডণ্টসোভার মুষ্টিবদ্ধ দু'হাতের আঙুলগুলো মট্‌মট করে ভাঙার শব্দ হ'ল। তবু গত কয়েক সপ্তাহে ওঁর মনের ওপর যে চাপ পড়েছিল তা এই কয়েক মিনিটে কিছু কমেছিল।

“তোমার রোগের কি কি লক্ষণ লক্ষ্য করেছ, বলো।”

ডণ্টসোভা মোটামুটি যা বলা যায় তা জানালেন। কিন্তু ওর্শচেংকভ্‌ আরো বিশদভাবে শুনতে চান। “অত খুঁটিনাটি শুনতে গেলে ত,' স্যার, আপনার এই শনিবারের সন্ধ্যের পুরোটা লেগে যাবে। আপনি ত' আমার এক্স-রে ছবি দেখবেনই… .”

“তুমি ত' জানো আমি কেমন প্রতিষ্ঠিত আচরণ বিরোধী মানুষ, জানো না? এক্স-রে আবিষ্কৃত হওয়ার কুড়ি বছর আগে থেকে আমি কাজ করছি। তাতেও যে রোগ নির্ণয়গুলো করেছি, তা যদি দেখতে! কতকটা ঘড়ি কিংবা এক্সপোজার মিটার ব্যবহারের মত। ওগুলো না থাকলে চোখ এবং সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ সময় জানে, ফটো তোলার জন্য কতটুকু আলো প্রয়োজন তা নির্ণয় করতে পারে। ওগুলো না থাকলে মানুষ তার বুদ্ধি আর সহজাত গুণ ফিরে পায়।”

রোগের লক্ষণগুলি শ্রেণীভুক্ত ভাবে এবং পৃথক ভাবে, যে খুঁটিনাটিগুলি বললে রোগটি বিপজ্জনক গণ্য হতে পারে সেগুলি যাতে ঠিক মত বলা হয়

সেদিকে সজাগ দৃষ্টিসহ, ডন্ট্সোভা বলে গেলেন। (কিন্তু তবু উনি কিছু বাদ দিতে প্রলুব্ধ হচ্ছিলেন, যাতে ওর্শচেংকভ্ বলেন, "এ কোন ঘাবড়িয়ে দেওয়ার মত রোগ হয়নি লুডোচ্কা। এ কোন রোগই নয়") ডন্ট্সোভা তাঁর রক্তের গঠন, যা একটুও ভাল নয়——বললেন, রক্তের কোষ গণনাও জানালেন। গণনার ফল অত্যন্ত বেশীর দিকে। ওর্শচেংকভ্ মন দিয়ে শুনলেন, কিছু প্রশ্নও করলেন। কিছু প্রশ্নের জবাবে মাথা নাড়লেন, যেন ঐ লক্ষণগুলি সচরাচর দেখা যায় এবং তাদের উপস্থিতি দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে না। অথচ উনি কখনই বললেন না, "এ কোন রোগই নয়।" বিদ্যুৎ চমকের মত ডন্ট্সোভার মনে হ'ল ওর্শচেংকভ্ ইতিমধ্যে রোগ নির্ণয় করে ফেলেছেন এবং এক্স-রের জন্য অপেক্ষা না করে সোজাসুজি তাঁর সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়া যায়। কিন্তু তক্ষুনি সে সিদ্ধান্ত জানতে চাইতেই যে ভয় লাগে; সে সিদ্ধান্ত ভুল, নির্ভুল বা শত সাপেক্ষ, যাই হোক না কেন না, সিদ্ধান্ত মুলতুবি থাক। দিন কয়েক অপেক্ষার ফলে আঘাত কিছু মোলায়েম হবে।

ওঁরা দু'জন আরো কথাবার্তা বললেন। বৈজ্ঞানিক আলোচনা সভায় মিলিত বন্ধু-বান্ধবের মত গল্প। তবু রোগী হিসেবে বড় ডাক্তারের কাছে আসা যেন স্বীকারোক্তি করা আসামীর অবস্থা। দু'জনের মধ্যে একদা যে সমতা ছিল তা অন্তর্হিত হয়েছে। না, ঠিক সমতা কখনই ছিল না। শিক্ষক-ছাত্রীর মধ্যে সমতা থাকে না। সম্পর্কটা অনেক কঠোর। স্বীকারোক্তি দ্বারা ডন্ট্সোভা নিজেকে চিকিৎসকদের উচ্চাসন থেকে অপসৃত করে চিকিৎসকদের ওপর নির্ভরশীল, সাধারণ করদাতায় রূপান্তরিত করেছেন।

ডন্ট্সোভার ঠিক যেখানে ব্যথা লাগে ওর্শচেংকভ্ সে জায়গাটা অনুভব করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন না। বরং তাঁর সঙ্গে অতিথির মত কথা বলতে থাকলেন। ডন্ট্সোভা একাধারে তাঁর ছাত্রী এবং রোগী। কিন্তু উনি এত ভেঙে পড়েছিলেন যে ওঁর আগেকার ধৈর্য আর ছিল না।

"সত্যি বলতে কি, আমাদের ভেরা গ্যাঙ্গার্ট এখন রোগ নির্ণয়কারী হিসেবে এত চমৎকার কাজ করছে যে সাধারণ ব্যাপারে আমার ওর ওপর পুরো আস্থা আছে", দৈনন্দিন কাজের ভিড়ে আয়ত্তব অভ্যাস অনুযায়ী ডন্ট্সোভা তাড়াতাড়ি বললেন, "কিন্তু, স্যার, আমি ভাবলাম···"

"তুমি আমার ছাত্রী। আসবে বৈকি", ওর্শচেংকভ্ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন। ডন্ট্সোভা ওঁর চাউনি খুব বেশী দেখতে পেলেন না। কিন্তু গত দু'বছর ধরে ডন্টসোভা লক্ষ্য করেছেন ওঁর স্থির চাউনিতেও কেমন এক বৈরাগ্যের ছায়া পড়ে। ওঁর স্ত্রী বিয়োগের পর থেকে ঐ ছায়াটা দেখা যায়। "কিন্তু তোমার যদি ক'দিন অসুস্থতার জন্য ছুটি নিতে হয়···ভেরা কি তোমার জায়গায় কাজ করতে পারবে?"

(অসুস্থতার জন্য ছুটি নিতে হবে! এরপরও কি মনে হয়, তেমন জটিল কিছু হয়নি? ডাক্তার অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় ত' সবই বললেন!)

"হ্যাঁ, ভেরা পারবে। ও এখন বিশেষজ্ঞ হিসেবেও অভিজ্ঞ। একটা বিভাগ চালানোর যোগ্যতা ওর আছে।"

ওর্শচেঙকভ্ মাথা হেলালেন। এক হাতে নিজের ছুঁচলো দাড়ি ধরে বললেন, "বেশ, বুঝলাম যে ও এক অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে, কিন্তু ওর বিয়ের কি হ'ল?"

ডণ্ট্সোভা মাথা নাড়লেন। "আমার নাতনিটাও ঐ রকম," ওর্শচেঙকভ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "ও পছন্দমত কাউকে পাচ্ছে না। ভারি মুস্কিল।" ও'র ভুরু দু'টো ঈষৎ উঠে উদ্বেগ প্রকাশ পেল।

ওর্শচেঙকভ্ ডণ্ট্সোভাকে যথাশীঘ্র সম্ভব পরীক্ষা করার ওপর জোর দিলেন। বললেন, আগামী সোমবার পরীক্ষা করবেন। উনি অত তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করতে চান কেন? (·)।

অবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নেওয়ার সময় এল। ডণ্ট্সোভা উঠলেন। কিন্তু ওর্শচেঙকভ্ চা খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন।

"সত্যিই আমার এখন চা খেতে ইচ্ছে করছে না, স্যার।"

'না করুক। আমার ইচ্ছে করছে। এখনই আমার চা খাওয়ার সময়।" এ যেন অপরাধীর মত অসুস্থ ডণ্ট্সোভাকে অসম্ভব স্বাস্থ্যবান প্রতিপন্ন করার দৃঢ় প্রয়াস।

"আপনার নাতনি কি বাড়ীতে আছে?" ডণ্ট্সোভা বললেন। ওর্শচেঙকভের নাতনি ডণ্ট্সোভার মেয়ের চেয়ে ছোট।

"না। বাড়ীতে কেউ নেই। আমি একাই আছি।"

(চা খাওয়াতে চাইলেও, ওর্শচেঙকভ্ যে ওঁকে রোগী দেখার ঘরে বসিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ত' তাঁর বক্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য জোরদার করা।)

"আপনিই তাহলে আমার জন্য গৃহকর্ত্রীর ভূমিকা পালন করবেন?" ডণ্ট্সোভা বললেন, "আমি তা হতে দেব না।"

"তার প্রয়োজনও নেই। পুরো এক ফ্লাস্ক চা আছে। আলমারিতে প্লেট আর কিছু কেক আছে। ইচ্ছে হলে নিতে পারো।"

ও'রা চা খেতে ডাইনিং রুমে এলেন। ওক্ কাঠের এক বিরাট, বর্গাকার টেবিল। টেবিলটা এত বড় যে কোন সাধারণ দরজা দিয়ে বেরোবে না। পুরানো দেওয়াল ঘড়িটায় দেখা গেল সন্ধ্যে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গিয়েছে।

ওর্শচেঙকভ্ নাতনির সম্পর্কে গল্প করতে শুরু করলেন। উনি নাতনিকে খুব ভালবাসেন। নাতনি গীত-বাদ্য শিক্ষালয়ে একটা শিক্ষাক্রম সম্প্রতি শেষ করেছে। ও চমৎকার বাজায়, সুন্দরী এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমতী (যা বাদকদের মধ্যে কদাচ দেখা যায়)। উনি নাতনির একটা ফটোও দেখালেন, কিন্তু নাতনির বিষয়ে আর বেশী কিছু বললেন না। ওর্শচেঙকভ্ এও চাইলেন না যে ডণ্ট্সোভা তাঁর নাতনির বিষয়ে অখণ্ড মনযোগ দেন। ডণ্ট্সোভার পক্ষে নিজের অসুস্থতা ছাড়া আর কোন বিষয়ে মনযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। ও'র

মনটাই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, আর তাকে জোড়া লাগানো যাবে না। একথা ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে এমন এক মানুষের সঙ্গে সহজভাবে বসে চা খেতে হচ্ছে, যিনি রোগের বিস্তার এবং সম্ভাব্য বিকাশ সম্পর্কে অবহিত হয়েও রোগের বিষয়ে কোন কথা বলছেন না। শুধু কেক-বিস্কুট এগিয়ে দিচ্ছেন।

ডণ্ট্‌সোভারও গল্প করার মত বিষয় ছিল। না, উনি বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া মেয়ের গল্প করতে চান না। ঐ বিষয়টি অত্যন্ত বেশী বেদনাদায়ক। গল্পের বিষয় ডণ্ট্‌সোভার ছেলে। ছেলেটা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর পড়া শেষ করে বলেছে আর পড়বে না। ওর মতে আর পড়া অর্থহীন। মা-বাপের কোন যুক্তিই সে শুনবে না। "পড়াশোনা করতেই হবে, কারণ মানুষের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শিক্ষা আর কৃষ্টি"—"পড়ে কি হবে? জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ফুর্তিতে দিন কাটানো।"—"লেখাপড়া না শিখলে ভাল চাকরি পাবি না। তখন কি করবি, কুলি গিরি?"—"আমার ভাল চাকরির দরকার নেই! আর, আমার গাধার মত খেটে মরারও ইচ্ছে নেই।"—"তবে কি করে পেট চালাবি?"—"আমি ঠিক কিছু খুঁজে নিতে পারব। শুধু খুঁজতে জানা চাই, তাতেই সব হবে।" ছেলেটা কয়েকটা অত্যন্ত সন্দেহজনক ছেলের সঙ্গে মেশে। ওকে নিয়ে ডণ্ট্‌সোভার ভাবনার শেষ নেই।

ওর্শচেঙকভের মুখ দেখে মনে হ'ল উনি আরো এ ধরনের কাহিনী শুনেছেন। উনি বললেন, "আমাদের যুব সম্প্রদায়ের অন্যতম সমস্যা হ'ল তারা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ গুরুকে হারিয়েছে, অর্থাৎ পারিবারিক চিকিৎসক। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের ব্যক্তিগত কথা বলার জন্য একজন চিকিৎসক প্রয়োজন। স্কুলের ডাক্তারকে দিয়ে হবে না। সে ডাক্তার মাত্র তিন মিনিটে একটি করে ছাত্র হিসেবে এক সঙ্গে চল্লিশটি ছাত্রকে দেখেন। ওদের দরকার এমন এক ডাক্তার যিনি শৈশবে ওদের গলার ভেতর দেখেছেন, কখনো কখনো ওদের বাড়ীতে এসে চা খান। ওরা তাঁকে 'কাকা' বলে ডাকতে পারে। এই ধরনের আপাতঃ-কঠোর কিন্তু সত্যিই দয়ালু ডাক্তার কাকু, যিনি বাপ-মায়ের মত ছেলে-মেয়েদের রাগ-অভিমান বা আব্দারের তোয়াক্কা রাখেন না, তিনি যদি হঠাৎ কোন উঠতি বয়সের ছেলে বা মেয়েকে ডেকে নিয়ে, নিজের ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ করে দিয়ে ধীরে ধীরে এমন অচেনা বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন যা যেমন লজ্জাদায়ক তেমনি চিত্তাকর্ষক, তাঁকে জানানোর আগেই তার অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল প্রশ্ন আঁচ করে নিয়ে নিজেই সামাধান করে দেন, তার কি ফল হতে পারে কখনো ভেবে দেখেছ? তার ওপর তিনি যদি সেই ছেলে বা মেয়েটিকে আবার দেখা করতে বলেন? নিশ্চয় ওরা ভুল করার ব্যাপারে সাবধান হবে, কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে নিজের শারীরিক ক্ষতি করার আগে ভেবে দেখবে। ওদের জগত সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাও পরিশুদ্ধ হবে। মূল উদ্বেগগুলি এবং বাসনা গুলির বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি হলে সেগুলির কোন রূপরেখাই আর দুর্বোধ্য মনে হবে না। তখন আর বাপ-মায়ের সুযুক্তি বিরক্তিকর মনে হবে না।"

নিজের ছেলের কাহিনী শুনিয়ে ডণ্ট্সোভা নিজেই এ বক্তৃতার উদ্ভব ঘটিয়েছেন। ছেলের সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। সুতরাং তাঁর ওর্শচেংকভের পরামর্শ শুনতে হবে এবং ছেলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ভাবতে হবে। ওর্শচেংকভের কণ্ঠস্বর ভরাট এবং মোলায়েম, বয়সের দরুন কম্পিত নয়। চোখ দুটো উজ্জ্বল এবং সজীব। তাতে বক্তব্য অর্থপূর্ণ এবং প্রত্যয় পূর্ণ হয়।

ডাক্তারের সুচিন্তিত বক্তব্য শুনতে শুনতে ডণ্ট্সোভার মনে হ'ল রোগী দেখার ঘরে তাঁর যে শান্তিদায়ী, সুখকর ভাব এসেছিল তা আর নেই ; কি যেন হারানোর ভীতিজনক অনুভূতি বুক চেপে ধরেছে। উঠে পালানোর ইচ্ছে হচ্ছিল, যদিও কেন বা কোথায় যাবেন তা জানা নেই।

"আপনি ঠিকই বলেছেন," ডণ্ট্সোভা বললেন, "আমরা যৌন শিক্ষাদানে অবহেলা করেছি।"

"আমরা ভাবি ছেলে-মেয়েরা নিজেরা যৌন জ্ঞান আহরণ করে নেবে। জীবজন্তু যেমন করে থাকে। ওরাও জীবজন্তুর মতই শিখছে। আমরা ওদের বিকৃতি সম্বন্ধে সচেতন করি না, কারণ আমাদের ধারণা সুস্থ সমাজের সব মানুষ স্বাভাবিক হবে। ওরা একে অপরের থেকে শেখে। যা শেখে তা অস্পষ্ট এবং বিকৃতও বটে। আমরা আর সব ক্ষেত্রে ওদের শিক্ষা দান অত্যাবশ্যক মনে করি। অথচ শুধু এই বেলায় শিক্ষা দান 'লজ্জাকর' গণ্য হয়। কিছু কিছু স্ত্রীলোকের দেখা মেলে যাদের পূর্ণ অনুভূতির অভিজ্ঞতা হয়নি। শুধু এই জন্য যে, তাদের পুরুষরা জানত না শুভ রাত্রির মিলন ঠিক কিভাবে শুরু করবে।"

"হুঁ, ঠিকই," ডণ্ট্সোভা বললেন।

"ঠিক ত' বটেই," ওর্শচেংকভ্ জোর দিয়ে বললেন। ডণ্ট্সোভার মুখে চিন্তাক্লিষ্ট, অধীর, বিব্রত, ভাব ক্ষণিকের জন্য দেখা দিল এবং ওর্শচেংকভ্ তা লক্ষ্য করলেন। ডণ্ট্সোভা যখন তাঁর রোগের ধরন সম্পর্কে জানতে ব্যগ্র নন, এবং এক্স-রে মেশিনের সামনে দাঁড়ালেই সোমবার তা জানতে পারবেন, তখন শনিবারের সন্ধ্যেটা রোগের লক্ষণগুলো আবার আলোচনা করা কি দরকার? ডাক্তার হিসেবে ওর্শচেংকভের কর্তব্য ডণ্ট্সোভাকে কথায় ভুলিয়ে রাখা। দু'জন ডাক্তারের কথোপকথনের শ্রেয়তর বিষয় আর কি আছে?

"মোটামুটিভাবে বলা চলে," ওর্শচেংকভ্ বললেন, "পারিবারিক চিকিৎসক মানব জীবনে অন্যতম শান্তিদায়ী ব্যক্তি, অথচ তাঁরই মূলোৎপাটন করা হচ্ছে। পারিবারিক চিকিৎসক ছাড়া বিকশিত সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। মা যেমন পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির রুচি চেনেন, পারিবারিক চিকিৎসক তেমনি তাদের প্রয়োজন জানেন। যে ছোটখাটো শারীরিক অসুবিধেগুলোর জন্য আমরা হাসপাতালের বহির্বিভাগে দেখানোর কথা ভাবতেও পারি না—কেন না ওখানে গেলে প্রথমে কার্ড সংগ্রহ করতে হবে, তার পর যেহেতু

ওখানে ঘণ্টায় ন'জন করে রোগী দেখার নিয়ম তাই নিজের ডাক আসার অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়——পারিবারিক চিকিৎসককে সেগুলি বলতে অসুবিধে নেই। কিন্তু ঐ ছোটখাটো অসুবিধেগুলোই অবহেলার ফলে এক দিন জটিল আকার নেয়। যদি খোঁজ নাও তাহলে জানতে পারবে ঠিক এই মুহূর্তে অসংখ্য প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি বোবা ভীতি নিয়ে সেই রকম এক ব্যক্তির পথ চেয়ে আছে যার কাছে তারা সেই ভীতিগুলি সম্পর্কে মন খুলে কথা বলতে পারবে যে ভীতিগুলি তারা মনের গভীরে লুকিয়ে রেখেছে, এমন কি লজ্জিতও বোধ করেছে। বন্ধু-বান্ধবের কাছে সব সময় সঠিক চিকিৎসকের খোঁজ চাইতে পারা যায় না, খবর কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া চলে না। এ সন্ধান উপযুক্ত স্বামী বা স্ত্রী চয়নের চেয়ে কম জটিল নয়। আজকাল ত' বরং ভাল বৌ পাওয়া সেই ধরণের চিকিৎসক পাওয়ার চেয়ে সহজ হয়েছে, যে চিকিৎসক ব্যক্তিগতভাবে পরিবারের সবার দেখভাল করবে, তাদের পুরোপুরি বুঝবে।"

ডণ্ট্সোভার কপাল কুঞ্চিত হ'ল। ওর্শচেঙ্কভের অভিমত বিমূর্ত ধ্যান-ধারণার বেশী কিছু নয়! ইত্যবসরে রোগের আরো, আরো লক্ষণ সর্বাধিক ভয়াবহ সমাবেশে সজ্জিত হয়ে ওঁর চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

"আপনার বক্তব্য খুবই ভাল, কিন্তু ঐ ব্যবস্থা কার্যকর করতে কতগুলি পারিবারিক চিকিৎসক প্রয়োজন হবে তা কি ভেবে দেখেছেন? আমাদের নিঃশুল্ক সার্বজানিক জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায়…… ঐ ব্যবস্থা খাপ খায় না।"

"হ্যাঁ, নিঃশুল্ক জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় ঐ ব্যবস্থা খাপ খায় না বটে, সার্বজনিক জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় খাপ খাবে," ওর্শচেঙ্কভ্ দৃঢ়তা সহ নিজের মত আঁকড়িয়ে রইলেন।

"এটা আমাদের মহত্তম কৃতিত্ব···· কারণ এটা নিঃশুল্ক সেবা।"

"সত্যিই কি এটা একটা বিরাট কৃতিত্ব? এটা কি সত্যিই নিঃশুল্ক সেবা? ডাক্তাররা যে বিনা পয়সায় সেবা করে না তা ত' তুমি জানো। অর্থাৎ ডাক্তারদের জাতীয় ব্যয় বরাদ্দ থেকে মাইনে দেওয়া হয়, যে ব্যয় বরাদ্দ রোগীরাই বহন করে। একে নিঃশুল্ক সেবা বলা চলে না। রোগীদের যদি ঐ অর্থ সরকারী ব্যয় বরাদ্দে না দিতে হত তবে, প্রয়োজনে পাঁচবার ডাক্তার দেখিয়েও তাদের হাতে দশ রুবল করে থেকে যেত। একে বড় জোর নৈর্ব্যক্তিক সেবা বলা চলে।"

"কোন রোগীর যদি ডাক্তার দেখানোর অর্থ না থাকে?"

"সে রোগী তখন ভাববে, 'চুলোয় যাক নতুন পর্দা আর এক জোড়া বাড়তি জুতো কেনা! আমার শরীরই যদি ঠিক না থাকে তবে ওসব দিয়ে কি হবে?' আজকাল কি ওর চেয়ে ভাল কিছু হচ্ছে? কোন প্রকৃত যোগ্য ডাক্তারকে দেখাতে গেলে কত যে ফি দিতে হয় তা কেউ সঠিক জানে না, এবং সে ফি দিতে

চাইলেও দেখানোর মত ডাক্তার পাওয়া যায় না। তাদেরও নির্দিষ্ট রোগী সংখ্যা আছে, সময়ও বাঁধা ধরা। অর্থাৎ 'পরবর্তী রোগী এবার আসুন'। যে ডাক্তারখানা ফি নেয় সেখানে রোগীর ভিড় অন্য জায়গার চেয়ে বেশী। রোগীরা ওখানে যায় কেন, জানো? অসুস্থতা জনিত ছুটির জন্য সার্টিফিকেট কিংবা প্রতিবন্ধী ভাতা পাওয়ার সুবিধের জন্য যায়। ঐ ডাক্তারদের একমাত্র কাজ অসুস্থতার অজুহাতে কাজ ফাঁকি দিতে ইচ্ছুক রোগীদের ধরা। রোগী-ডাক্তারে শত্রুর সম্পর্ক। একে চিকিৎসা বলে? এবার ওষুধের কথায় আসি। দ্বিতীয় দশকে বিনা পয়সায় ওষুধ মিলত, মনে পড়ে?"

"তাই নাকি? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তাই ঠিক। আজকাল বড় ভুল হয়ে যায়," ডঃ সোভা বললেন।

"তুমি সত্যিই ভুলে গিয়েছ। তখন ওষুধ নিঃশুল্ক ছিল। কিন্তু আমাদের তা বন্ধ করে দিতে হ'ল। কেন জানো?"

"হয়ত ব্যবস্থাটা সরকারের অত্যন্ত ব্যয় বহুল মনে হয়েছিল," ডঃ সোভা একটুক্ষণ চোখ বুজে, চেষ্টা করে বললেন।

"শুধু ঐটুকু নয়। দেখা গেল, ব্যবস্থাটা চরম অপচয়পূর্ণ। দাম লাগত না বলে রোগীরা যথেচ্ছা ওষুধ হস্তগত করত, আর অর্দ্ধেক ফেলে দিত। আমি একথা অবশ্যই বলি না যে রোগীর সব রকম চিকিৎসার জন্য দাম দিতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসার দাম তারই দেওয়া উচিত। তারপর রোগী হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ পেলে সেখানকার চিকিৎসা নিঃশুল্কই হওয়া উচিত, যেহেতু সে চিকিৎসা জটিল এবং ব্যয় বহুল। যেকোন হাসপাতালের কথা ধরো। বলতে পারো, হাসপাতালে শুধু একজন সার্জন অপারেশন করে আর বাকি দু'জন তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কেন? কারণ তারা সরকার থেকে মাইনে পায়। বেসরকারী চিকিৎসা পেশায় থাকলে কোন রোগীই ওদের কাছে যেত না। সুতরাং তারা দুশ্চিন্তায় ভুগবে কেন? তোমাদের হালমুহামেদভ্ আর প্যান্টিওখিনার ত' বিনা কাজে ছোটাছুটি করা ছাড়া কোন কম্মই নেই। সরকারী মাইনের ওপর নির্ভর না করে ডাক্তারদের বরং রোগীদের মনের ওপর নির্ভর করা উচিত। জনপ্রিয়তার ওপর ভরসা করা উচিত। আজকের ডাক্তারের তা করতে হয় না।"

"প্রতিটি একক রোগীর ওপর ভরসা করার চেয়ে ঈশ্বরের ওপর ভরসা করা ভাল। ঐ কুৎসা রটনাকারী রোগিণ, পলিনা জাভদ্‌চিকোভা'র কথাই ধরুন না⋯ ⋯"

"ওর ওপরও ভরসা করতে হবে।"

"সে যে চরম অবমাননাকর ব্যাপার হবে!"

"ওটা কি হাসপাতালের প্রবীণ চিকিৎসকের ওপর ভরসা করার চেয়েও খারাপ? কোন আমলার মত কেবল সরকারী মাইনে নেওয়ার চেয়ে অসৎ কাজ হবে?"

"কিছু রোগী এত খুঁটিনাটি জানতে চায়, যেমন র‍্যাবিনোভিচ্ আর কস্টোগলোটভ্, ওরা পুঁথিগত প্রশ্ন তুলে তুলে আমাদের শ্রান্ত করে তোলে। ওদের সব প্রশ্নেরই জবাব দিতে হবে ?"

ওর্শচেংকভের উঁচু কপালে একটাও রেখা পড়ল না। উনি ডণ্ট্সোভার জ্ঞানের সীমা জানেন, এবং সে সীমা সংকুচিত নয়। ডণ্ট্সোভা জটিলতম রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রায় দু'শোটা ছোট ছোট প্রবন্ধ, দেখতে হোমড়া-চোমড়া না হলেও, চিকিৎসা বিজ্ঞানের জটিলতম দিকে সবচেয়ে দুরূহ রোগ নির্ণয়ের পরিচায়ক। "হ্যাঁ," ওর্শচেংকভ্ বললেন, "ওদের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।"

"কিন্তু সে সময় কোথা থেকে পাব, তা কি ভেবে দেখেছেন ?" ডণ্ট্সোভা উষ্ণভাবে বললেন। ওর্শচেংকভের পক্ষে ওকথা বলা সহজ। চটি পায়ে নিজের বাড়িতে পায়চারি করতে করতে অনেক কিছু বলা চলে। "কোন চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্রে আজকাল কত যে কাজের চাপ থাকে তা কি জানেন ? আপনাদের সময় এ রকম ছিল না। ডাক্তার পিছু রোগীর সংখ্যাই এখন কত বেশী।"

"উপযুক্ত প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে," ওর্শচেংকভ্ বললেন, "হাসপাতালে রোগীর চাপ কমবে। অবহেলিত রোগীর ঘটনাও থাকবে না। প্রাথমিক চিকিৎসক ঠিক সে ক'জন রোগীর সেবা করবেন যা তাঁর স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞানে সম্ভবপর। রোগীরা তাঁর অধিতব্য বিষয় হবে। প্রাথমিক স্তরে চিকিৎসা ফেল্ডশের রুশ গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসক। পুরোপুরি চিকিৎসক হওয়ার যোগ্যতা এঁদের থাকে না। পর্যায়ে চিকিৎসার বেশী কিছু নয়।"

"হায় !" ডণ্ট্সোভা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন তাঁদের এই কথোপকথনের ফলে সত্যিই কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন বা সংস্কার সাধিত হবে। "কোন চিকিৎসকের পক্ষে কোন রোগীকে তাঁর অধিতব্য বিষয় মনে করে চিকিৎসা করা এক ভয়াবহ সম্ভাবনা।"

ওর্শচেংকভ্ বুঝতে পারছিলেন যে এ আলোচনা শেষ করার সময় হয়েছে। কিন্তু ওঁর বুড়ো বয়সে অনবরত বক্‌বক্ করার ব্যামো ধরেছিল। উনি বললেন, "রোগীর দেহের গঠনতন্ত্র একথা জানে না যে, আমাদের জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত। অথচ গঠনতন্ত্র সেভাবে বিভক্ত নয়। তলস্তয় বলতেন, 'ডাক্তাররা যে ওষুধের বিধান দেন তার সম্পর্কে অল্পই জানেন, এবং যে গঠনতন্ত্রের জন্য ঐ ওষুধের বিধান দেন তার সম্পর্কে জানেন আরো কম।' অধিতব্য বিষয় হিসেবে কোন রোগীকে জানা নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ। আর যা হোক, কোন শারীরস্থান বিশারদ যে নক্সা প্রস্তুত করেন তা শব ব্যবচ্ছেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি হয়। কিন্তু জীবন্ত মানুষ তাঁর আওতার বাইরে। রশ্মি-চিকিৎসা বিশারদ হাড় ভাঙা রোগীদের চিকিৎসার দান করেন, কিন্তু হজম প্রক্রিয়া তাঁর ক্ষেত্র বহির্ভূত। ফলে রোগী বাসকেট বলের মত এ বিশেষজ্ঞ

ও বিশেষজ্ঞের কাছে ছোটাছুটি করে মরে। এর থেকেই বোঝা যায় কোন চিকিৎসক কি করে আজীবন এক অত্যুৎসাহী মৌমাছি-পালক হয়ে থাকতে পারেন। কোন চিকিৎসক যদি এক একটি রোগীকে এক একটি পূর্ণ অধিত্যব্য বিষয় মনে করেন তবে তাঁর আর কোন নেশা থাকতে পারে না। এটাই আসল কথা। সেজন্য চিকিৎসকেরও সব দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে।"

"চিকিৎসকেরও স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে?" ডণ্টসোভা প্রায় কাতর মিনতি করলেন। নিজের মানসিক অবস্থা উদ্বেগ বিহীন হলে ওঁর এই বিশদ আলোচনা চিত্তাকর্ষক লাগত। কিন্তু ভগ্ন হৃদয়, ক্লান্ত ডণ্টসোভা আর এ আলোচনায় মন দিতে পারছিলেন না।

"হ্যাঁ, লুডোচকা, তাই। তুমি নিজেই ত' একজন স্বয়ং সম্পূর্ণ চিকিৎসক। তুমি নিজেকে হেয় জ্ঞান করছ কেন? এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। আমরা যারা রুশ বিপ্লবের আগে নগরপালিকার ডাক্তার ছিলাম তাদের প্রত্যেকেরই তাই হতে হত। আমরা চিকিৎসা বিশারদ ছিলাম, কিন্তু প্রশাসক ছিলাম না। আর আজকের জেলা হাসপাতালের প্রবীণ ডাক্তাররা তাঁদের অধীনে কম করে দশজন বিশেষজ্ঞ না থাকলে কাজই করতে চান না।"

ওর্শচেংকভের মনে হ'ল এবার কথাবার্তা সত্যিই শেষ করা উচিত। ডণ্টসোভার ক্লান্ত মুখ আর পিটপিট করতে থাকা চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে যে-কথাবার্তার উদ্দেশ্য ছিল মন ভোলানো, তা বিফল হয়েছে। এমন সময় বারান্দার দিকের দরজা খুলে গেল আর ভেতরে চলে এল…কুকুরের মত দেখতে, কিন্তু অবিশ্বাস্য রকম বড় এক প্রাণী যাকে দেখে বরং মনে হয় এক মানুষ কোন অজ্ঞাত কারণে চতুষ্পদ হয়ে গিয়েছে। ডণ্টসোভার প্রথম খুব ভয় লাগল, পাছে ও কামড়ায়। কিন্তু ওকে কোন সাধারণ সুবুদ্ধিযুক্ত মানুষের চেয়ে বেশী ভয় করার কারণ নেই।

ও ধীরে সুস্থে ঘরটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল, যেন চিন্তামগ্ন এক মানুষ। অপরে যে তার আবির্ভাবে অবাক হতে পারে সে সম্পর্কে অনবহিত। ও একবার নিজের সাদা, পুরু লেজটা উঁচিয়ে অভিবাদন জানাল। ঝুলন্ত, কালো কানদুটো ছাড়া ওর দেহ সাদা—আদা রঙে মেশানো। পিঠের ওপর লোম এত ঘন যে সাদা কম্বল মনে হয়। পায়ের দিক প্রায় কমলা রঙ। ও ডণ্টসোভার কাছে এল, শুঁকলও বটে, কিন্তু অত্যন্ত আলতোভাবে। অন্য কুকুর যেমন টেবিলের কাছে গিয়ে বসে ও তা করল না। ও টেবিল ধরে দাঁড়াল। তরল-বাদামী চোখ দুটো টেবিলের মাথার ওপর জ্বলজ্বল করে উঠল।

"কি বিশাল চেহারা! ও কোন্ জাতের কুকুর?" ডণ্টসোভা এই সন্ধ্যায় প্রথম এত অবাক হলেন যে রোগের ব্যথা এবং নিজেকে পুরোপুরি ভুলে গেলেন।

"ও সেণ্ট বার্নাড জাতের কুত্তা", ওর্শচেংকভ্ ওর দিকে স্নেহ দৃষ্টিতে

খাওয়াতে গেলেই মানিয়া রেগে বলে, 'তোর কান দুটো কি দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দিতে হবে?' কান দুটো অনবরত ওর খাবারের ডিশে পড়ে।"

ডণ্ট্সোভা ভাল করে ওকে দেখলেন। ওঁর ওকে ভাল লাগল। শহরের হট্টগোলে এমন রাজসিক কুকুরের স্থান নেই। সাধারণ জন পরিবহণ ওকে নেবে না। হিমালয় যদি পৃথিবীতে তুষার মানবের একমাত্র স্থান হয় তবে এ ধরনের কুকুর থাকতে পারে শুধু একতলা বাগানবাড়ীতে।

ওর্শচেঙ্কভ্ এক ফালি কেক্ কেটে ওকে দিলেন। মজা দেখার জন্য কিংবা দয়া পরবশ হয়ে লোকে রাস্তার কুকুরকে খাবার ছুঁড়ে দেয়; কুকুরগুলো লাফিয়ে উঠে লুফে নেয়। ওর্শচেঙ্কভ্ তা করলেন না। এ কুকুরটি যে উঠে দাঁড়িয়েছে, তা খাদ্য ভিক্ষা করার জন্য নয়। ওর উদ্দেশ্য প্রভুর কাঁধে হাত রেখে বন্ধুত্ব প্রকাশ করা। ওর্শচেঙ্কভ্ ওকে এক বন্ধুর মত কেক্ দিলেন। ও বন্ধুর মত গ্রহণ করল। ও ভব্য ভাবে ডাক্তারের হাত থেকে কেকের ফালি মুখে নিল যেন কোন মানুষ প্লেট থেকে খাবার তুলছে। ওর হয়ত খিদেও ছিল না। শুধু ভদ্রতার খাতিরে নিল।

শান্ত, ভদ্র কুকুরটির আগমণে ডণ্টসোভার মনের গ্লানি দূর হ'ল। আবার চাঙ্গা লাগল। টেবিল থেকে উঠতে উঠতে মনে হ'ল, হয়ত তেমন কোন অসুখ করেনি। হয়ত অপারেশন করতে হবে না। মনে পড়ল, ডাক্তারের কুশল জানা হয়নি। ডণ্ট্সোভা বললেন, "আমি একেবারে অবিবেচক হয়ে গিয়েছি, স্যার। শুধু নিজের কামড়ানো ব্যথা, ছুঁচ বেঁধা ব্যথার কাহিনী শোনালাম। আপনি কেমন আছেন, তা জানতে চাইনি। বলুন স্যার, কেমন আছেন?"

ডাক্তার সিধে হয় দাঁড়ালেন। ডণ্ট্সোভার দিকে সোজাসুজি চেয়ে। ঈষৎ স্থূলকায় হয়েছেন, কিন্তু চোখে জলীয় পর্দা পড়া এখনো শুরু হয়নি। কানেও সব শুনতে পান। কে বলবে, উনি ডণ্ট্সোভার চেয়ে পঁচিশ বছরের বড়।

"এখনো ঠিকই আছি", ডাক্তার হাসলেন। অমায়িক, কিন্তু তেমন প্রাণ খোলা হাসি নয়। "স্থির করেছি, মরার আগে পর্যন্ত অসুস্থ হবো না। হঠাৎ একদিন দম ফুরিয়ে যাবে।"

ডণ্ট্সোভাকে বিদায় দিয়ে ওর্শচেঙ্কভ্ ডাইনিং রুমে ফিরে এলেন। আবলুস কালো কাঠে হলুদ জালির নক্সা কাটা দোলনা-চেয়ারে বসলেন। চেয়ারটার হেলান দেওয়ার জায়গা এত বছর ব্যবহারের ফলে ম্লান হয়ে গিয়েছে। দোলনা-চেয়ারের দোলা ক্রমে কমে এল। দোলনা-চেয়ারে বসলে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে যায়, তবু পড়ে না। ঐভাবে অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন।

'ওঁর আজকাল ঘনঘন বিশ্রাম নিতে হয়। শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য দেহ তাই চায়। একই রকম জোরদার দাবী অন্তরাত্মার। সব রকম শব্দ, কথাবার্তা,

কাজের চিন্তা, অর্থাৎ যা কিছু তাঁকে ডাক্তার করেছে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন নীরব আত্মানুসন্ধান। বিশেষতঃ স্ত্রী বিয়োগের পর ওঁর আত্ম-চেতনা নির্মল স্বচ্ছতার অভিলাষী হয়ে উঠেছে। কোন প্রকার পরিকল্পনা বিহীন, এমন কি চিন্তার ভাসমান মেঘ বর্জিত, এ ধরনের স্থানুবৎ নীরবতা ওর্শচেৎকভকে আত্মিক পবিত্রতা আর পরিপূর্ণতা এনে দেয়।

ঐ নীরব মুহূর্তগুলোয় জীবনের——তাঁর নিজের দীর্ঘ অতীত এবং হ্রস্ব ভবিষ্যৎ জীবন, তাঁর পরলোকগতা স্ত্রীর জীবন, যুবতী নাতনির জীবন, পরিচিত সবার—তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে তাৎপর্যের রূপরেখা তিনি দেখতে পান তার কাঠামো, কিন্তু, সেই মানুষগুলির কাজ কর্ম বা পেশা,—যে কাজ-কর্মে তারা নিজেরা অত নিমগ্ন থাকে, যা তারা মনে করে তাদের জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ এবং যদ্বারা তারা অপরের কাছে পরিচিত হয়,—নয়। যে শাশ্বত সৃষ্টির ভাবনা নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে আসে তা সম্পূর্ণ অটুট, অবিকৃত ভাবে বজায় রাখাই জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য। যেমন কোন স্থির সায়রে রুপালী চাঁদ স্থির হয়ে থাকে।

বাজারের দেবতা

ওর অভ্যন্তরে এক অতি-সজাগ ভাব গড়ে উঠেছিল। এ ভাব ক্লান্তিদায়ী নয়, এবং আনন্দকর। দেহের ঠিক কোন্ জায়গায় ঐ ভাবের অবস্থান ও তা সনাক্ত করতে পারছিল। জায়গাটা ওর বুকের সামনের দিক, হাড়ের ঠিক নিচে। সজাগ ভাবটা বেলুনের ভেতরে উষ্ম বাতাসের মত ওর অভ্যন্তরে আলতো চাপ বজায় রেখে এক ধরনের উপভোগ্য বেদনা সৃষ্টি করেছে। ঐ ভাবটা বোধ করি শোনাও যায়। কিন্তু ঐ ভাব কোন পার্থিব শব্দে ব্যক্ত নয় তাই কাণ তার নাগাল পায় না।

যে ব্যাকুলতা সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহে ওকে জোয়ার পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এ তার থেকে পৃথক। সে ব্যাকুলতার নিবাস ওর অন্তঃকরণ ছিল না।

ও এই নতুন অতি-সজাগ ভাব নিজের অভ্যন্তরে লালন করেছে, তার ভাষায় কান পেতেছে। মনে পড়ে যৌবনেও এই ভাবের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, তারপর তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। কি তার স্বরূপ? কি তার স্থায়িত্ব? কোন অলীক ভাব নয় ত'? যে মেয়েগুলির দরুন ঐ ভাবের উদ্রেক হয়েছিল ভাবটি কি তাদের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল, না মেয়েগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, অন্ততঃ মেয়েগুলিতে অভ্যস্ত না হওয়ার মধ্যে অন্তর্নিহিত রহস্যের ওপরও নির্ভরশীল? এ ভাব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হতে পারে না?

'মেয়েগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ' কথাটা ওর কাছে এখন আর অর্থবহ নয়।

তাই নাকি ? কিন্তু অন্তঃকরণে ঐ অনুভূতিই ওর একটি মাত্র আশা স্বরূপ হয়ে আছে, যেজন্য ও তা সযত্নে লালন করেছে। ওটাই জীবনের চরম পূর্তি, সর্বাধিক মূল্যবান অলঙ্করণ হয়ে আছে। যা কিছু ঘটেছে ও তাতে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছে। ভেরার উপস্থিতি ক্যানসার ওয়ার্ডকে রঙ আর প্রাণে ভরে দিয়েছিল। গোটা ওয়ার্ডের সঙ্গে ও নিজে যে অঙ্কুরেই শুকিয়ে যায়নি তার একমাত্র কারণ ওরা আজও···বন্ধু রয়ে গিয়েছে। আজও কদাচিত ভেরার সঙ্গে দেখা হয়। তাও খুব অল্প ক্ষণের জন্য। দিন কয়েক আগে ভেরাই ওকে রক্ত প্রদানের ব্যবস্থাপনায় ছিল। তখন কথাবার্তা হয়েছে। খুব খোলাখুলি কথা হয়নি। কারণ একটি নার্সও উপস্থিত ছিল।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য ওলেগ্ সবকিছু করেছে, কিন্তু ছাড়া পাওয়ার সময় এগিয়ে আসতে ওর মন-মরা লাগছিল। উশ্-টেরেকে ভেরাকে দেখতে পাওয়া যাবে না। তখন কি হবে ?

আজ রোববার। ভেরাকে দেখতে পাওয়ার আশা নেই। রোদ ঝলমল গরম দিন। বাতাস স্থির হয়ে আছে। ওলেগ্ হাসপাতালের মাঠে বেড়াতে বেরোল। উষ্ণ বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে দেহে দলাই-মলাই করার পরবর্তী চাঙ্গা ভাব এল। ভেরা কেমন করে রোববারটা কাটাচ্ছে ? কি করছে ভেরা ?

ওলেগের গতিবিধি আগের মত ক্ষিপ্র নেই। ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সরল রেখায় চলত। রেখার শেষ বিন্দুতে ক্ষিপ্র গতিতে পেছনে ফিরত। ওর এখনকার পদক্ষেপ দুর্বল, সাবধানী। মাঝে মাঝে থেমে, বেঞ্চিতে বসে পড়ে। আর কেউ না থাকলে বেঞ্চিতে শুয়েও পড়ে।

ওলেগ্ আজও তাই করছিল। ও মন্থর গতিতে নিজের দেহটা টেনে নিয়ে চলল। ড্রেসিং গাউনের বোতাম খুলে হাঁ হয়ে আছে। কাঁধদুটো ঝুলে পড়েছে। ও থেকে থেকে থেমে, মুখ ফিরিয়ে গাছ দেখছিল। কিছু গাছ অর্দ্ধেক পত্র শোভিত, কিছু গাছ সিকি। ওক্ গাছের পাতাই হয়নি। না হোক,······তবু কি ভাল লাগে !

কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে এক জায়গার জবুলজবুলে সবুজ ঘাস এত বেড়ে উঠেছে যে ঘাসগুলো দেখে গত বছরের মনে হত, যদি না ঘাসগুলো অত সবুজ হত।

ওলেগের চলার পথের এক ধারে শুলুবিনকে দেখা গেল। ও হেলান দেওয়ার জায়গা বিহীন একটা সরু বেঞ্চিতে উটকো হয়ে, দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসে আছে। গায়ে রোদ পড়ছে। অত রোদ ঝলমল পশ্চাদপটে মাথা ঝুঁকিয়ে একাকী বসে থাকা শুলুবিন যেন অনিত্যতার প্রতিমূর্তি।

ওলেগের শুলুবিনের কাছে গিয়ে বসতে আপত্তি ছিল না। এখনো শুলুবিনের সঙ্গে ওর তেমন ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়নি। শিবিরের অভিজ্ঞতায় ওলেগ্ জেনেছে যারা কম কথা বলে তাদের মনে অনেক কথা জমে থাকে।

তাছাড়া শুলুবিন যেভাবে ওকে বিতর্কে সমর্থন করেছিল তাতে ওলেগ্ ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

তবু ওলেগ্ স্থির করল, শুলুবিনের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করবে না। কারণ একথাও ও বন্দী শিবির থেকে শিখেছিল যে মানুষের একাকিত্ব এক পবিত্র অধিকার, তা লঙ্ঘন করা অনুচিত।

ও শুলুবিনের সামনে দিয়ে মন্থর গতিতে, বুট দিয়ে পথের নুড়ি পাথরে লাথি মারতে মারতে এগিয়ে চলল। শুলুবিন চাইলে ওকে কাছে ডাকার অসুবিধে নেই। শুলুবিন ওর বুট দেখল, ওকেও দেখল। ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ওলেগের দিকে তাকাল, যার অর্থ "আমরা দু'জন একই ওয়ার্ডের রোগী ত', তাই নয় ?" ওলেগ্ দু'পা এগোল। শুলুবিন ইতস্ততঃ করে বলল, "আপনি বসবেন না ?"

শুলুবিনও বুট পরেছে। কোন মতে বুড়ো আঙুলে লেগে থাকা হাসপাতালের চটি পরেনি। তার মানে ও বাইরে বেরোতে পারে। ও টুপি পরেনি। কয়েক গোছা পাকা চুল উঁচু হয়ে আছে।

ওলেগ্ এগিয়ে এসে বসল। ওর এমন ভাব যেন বসা বা ঘুরে বেড়ানো, ওর কোনটায় আপত্তি নেই। তবে, যেহেতু বসতে অনুরোধ করা হয়েছে, ও তাই বসেছে।

ওলেগ্ ভাবছিল আলাপ একটু এগোলে ও শুলুবিনকে এমন একটা মোক্ষম প্রশ্ন করবে যার জবাবে শুলুবিনের পুরো কাহিনী জানা যাবে। কিন্তু, ও তা না করে স্রেফ জিজ্ঞেস করল, "তাহলে পরশু দিন হচ্ছে, তাই ত', আলেক্সি ফিলিপোভিচ্ ?"

ওলেগের নিজের প্রশ্নের জবাব দরকার ছিল না। সারা ওয়ার্ডই জানত, পরশু দিন শুলুবিনের অপারেশনের হবে। তার চেয়ে বড় কথা ওলেগ্ শুলুবিনকে তার নাম ধরে ডেকেছে, ওয়ার্ডের কেউ এ পর্যন্ত যা করেনি। এ যেন দুই পুরানো সৈনিকের আলাপ।

শুলুবিন মাথা হেলাল। "রোদ পোয়ানোর শেষ সুযোগ কাজে লাগাচ্ছি।"

'না, না, শেষ সুযোগ কেন হবে ?" ওলেগ্ বলল। কিন্তু আড় চোখে শুলুবিনকে দেখে মনে হ'ল হয়ত ওর কথাই ঠিক। ও খিদে থাকলেও কম খায়। পেট ভরে খেলে ওর ব্যথা লাগে। ফলে, ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। শুলুবিনের কি অসুখ করেছে ওলেগ্ তা জানত। "তাহলে অপারেশনই স্থির হ'ল ? ওরা কি মল নির্গম আরেক দিকে ঘুরিয়ে দেবে ?"

শুলুবিন ঠোঁট দুটো চাপল। যেন একটু পরেই ঠোঁট চাটবে। তারপর মাথা হেলাল। কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না। "যে নামই দিন না কেন ক্যানসার ক্যানসারই," শুলুবিন ওলেগের দিকে না তাকিয়ে ঘোষণা করল, "কিন্তু এক ধরণের ক্যানসার আছে যা আর সবক'টার চেয়ে জঘন্য। সব ক্যানসারেই রোগীর দুর্ভোগ হয়। কিন্তু আমারটা এমনই যে না তার

সম্পর্কে লোকের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে, না তাদের পরামর্শ চাওয়া যাবে।"

"আমারটাও ত' ঐ রকম।"

"না, যেভাবেই দেখুন না কেন আমারটা আরো খারাপ। আমারটা বিশেষ অবমাননাকর, গ্লানিকর। পরিণাম ভয়াবহ। যদি বেঁচে থাকি—যদিটাও মস্ত বড়—শুধু আমার কাছে দাঁড়ানো বা বসা, যেমন আপনি এখন বসে আছেন, বিরক্তিকর হবে। সবাই বেশ ক'পা তফাতে থাকতে চাইবে। কেউ যদি কাছে আসেও আমি ভাবব, লোকটা দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে মনে মনে গাল দিচ্ছে। অর্থাৎ আমি মানুষের সঙ্গ হারাব।"

ওলেগ্ কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল। ওর অজানিতে ওর চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিসের মত হাওয়া বেরোল। "কার অসুখ যে বেশী কষ্টদায়ক তা পরিমাপ করা কঠিন," ও বলল, "মানুষের সফলতা বা কৃতিত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেয়ে রোগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুরূহ। সবাই নিজের কষ্ট বড় করে দেখে। আমি হয়ত ভাবব আমার চেয়ে হাতচ্ছাড়া জীবন আর কারো হয় না। কিন্তু তা কি ঠিক? হয়ত আপনার জীবন আরো কষ্টে কেটেছে। এসব বাইরে থেকে পরিমাপ করা সম্ভব?"

"পরিমাপ করতে যাবেন না। পরিমাপ নির্ঘাৎ ভুল হবে," শুলুবিন ওলেগের দিকে ফিরে বলল। ওর ভাঁটা ভাঁটা, লাল চোখ দুটো কি ভয়ানক বাঙ্ময়। "যে মানুষ জীবিকান্বেষণে বেরিয়ে সমুদ্রে প্রাণ হারায়, কিংবা যে মাটি খোঁড়ে, অথবা যে মরুভূমিতে জল সংধান করে মরে, এদের কারো অদৃষ্টই কঠোরতম বলা চলে না। বরং তার অদৃষ্টই কঠোরতম যার রোজই বাড়ী থেকে বেরোতে গিয়ে দরজার ওপর দিকে মাথা ঠুকে যায়, কারণ দরজাটা অত্যন্ত নিচু······আপনার কথা শুনে মনে হয়েছে আপনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছেন— আর তার পর শ্রম শিবিরে ছিলেন, তাই ত'?"

"ঠিক, এবং তার সঙ্গে আছে: উচ্চ শিক্ষা নিতে পারিনি, ফৌজে অফিসার হতে পারিনি, আর চিরকালের জন্য নির্বাসিত হয়েছি"——ওলেগ্ সবক'টা কথা ভেবে-চিন্তে এবং উপমা বিহীন ভাবে বলল——"হ্যাঁ, আরেকটা কথা: আমার ক্যানসার হয়েছে।"

"বেশ, ক্যানসারের ব্যাপারে দুজনের লেনদেনে সমান হ'ল। অপর ব্যাপারগুলো সম্পর্কে আমার বক্তব্য শুনুন, যুবক······"

"চুলোয় যাক যুবক। আমার ঘাড়ের ওপর নতুন একটা মাথা গজায়নি কিংবা গায়ের খোলস পাল্টায়নি বলে আমাকে যুবক ভাবছেন?"

"আপনার মন্তব্য সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলি, শুনুন। আপনার আর যা কিছু করতে হোক, মিথ্যে কথা বলতে হয়নি। আপনি যে অত নিচে নামতে বাধ্য হননি, এ কত বড় সৌভাগ্য ভাবুন ত'? আপনাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, আর আমাদের ভেড়ার পালের মত সভায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আপনাদের 'মুখোস' খুলে দিতে। ওরা আপনাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ

দিয়েছে, আর আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে ঐ আদেশ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সহর্ষ সাধুবাদ জানাতে। না, শুধু সাধুবাদ জানানো নয়, আপনাদের গুলি করে হত্যা দাবী করতে বাধ্য করেছে। হ্যাঁ, আমাদের বাধ্য করেছে! খবর কাগজগুলোয় কি লেখা হত, মনে পড়ে? লিখত, '.......এর জঘন্যতম, অশ্রুতপূর্ব অপরাধের কথা শুনে সারা সোভিয়েত দেশ এক অভিন্ন মানুষের মত ধিক্কার জানিয়েছে··· ' ঐ 'এক অভিন্ন মানুষ' কথাটির অর্থ আমাদের বেলায় কি দাঁড়াত জানেন? আমরা এক একটি পৃথক ব্যক্তি হলেও হঠাৎ আমরা 'এক এবং অভিন্ন মানুষ' হয়ে যেতাম। ঐ সাধুবাদ জানানোর সময় আমাদের বড় বড় মজবুত হাতগুলো শূন্যে আস্ফালন করতে হত, যাতে আমাদের চার পাশের মানুষ আর মঞ্চে উপস্থিত ব্যক্তিরা তা দেখতে পায়। কে আর নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায় না, বলুন? কে আর আপনাদের সমর্থন করতে এগোবে? ঐ রায়ে আপত্তি জানাবে কে? আজ তারা সব কোথায় গেল? ভিমা ওলিৎস্কি বলে একজনকে আমি জানতাম। ও সমর্থন জানায়নি। না, না, আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। ও স্রেফ সমর্থন করেনি। ও স্রেফ 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্টি''র সদস্যদের গুলি করে মারার রায়ে ভোট দেয়নি। [১৯৩০ নভেম্বরে অনেক প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী আর অর্থনীতিবিদকে প্রতিবিপ্লবী ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্টির সদস্য হিসেবে অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ঐ পার্টির বাস্তবে কোন অস্তিত্বই ছিল না। ঐ বিচারটি তখনো অনাগত 'বিরাট শুদ্ধির' আভাস মাত্র] ওরা ওলিৎস্কি'র মুখের ওপর হুকুম হাঁকল 'কৈফিয়ৎ দাও! তোমার কাজের কৈফিয়ৎ দাও!' গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া ওলিৎস্কি উঠে দাঁড়াল। 'আমি বিশ্বাস করি', ও বলল, 'বিপ্লবের এই দ্বাদশ বছরে দমনের বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হওয়া উচিত ছিল......' তবে রে, পাজী! শত্রুর চর কোথাকার! অন্তর্ঘাতীদের সাকরেদ! পর দিন জি পি উ [সোভিয়েত নিরাপত্তা দপ্তর। এর অনেক বার নাম বদলিয়েছে] ওকে ডেকে পাঠাল। ও বাকি জীবনটা ওখানেই রয়ে গেল।"

শুলুবিন নিজের অদ্ভুত ভঙ্গীতে এদিক-ওদিকে ঘাড় ঘোরাল। দাঁড়ে বসা অতিকায় পাখীর মত সামনে- পেছনে দুলে বসল।

শুলুবিনের কথায় আহ্লাদিত ভাব হওয়া দমন করে ওলেগ্ বলল, "এটা বরাত, আলেক্সি ফিলিপোভিচ্। কোন্ তাস আপনার বরাতে উঠল তার ওপর সব নির্ভর করে। বিপরীত পরিস্থিতিতে আপনারাই হতেন শহীদ আর আমরা হতাম কর্তৃপক্ষের তাঁবেদার। কিন্তু আরো একটা কথা আছে: আপনাদের মত মানুষ যারা বুঝতে পেরেছিলেন, খুব দেরী হওয়ার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, কি ঘটছে, তাঁরা অন্তর্দাহে জ্বলেছেন। কিছু এমন মানুষও ছিলেন যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁরা ভুল করছেন না। তাঁদের হাত রক্ত কলুষিত হয়েছে। আবার, রক্ত কলুষিত হয়নিও বটে, যেহেতু তাঁরা পরিস্থিতি বুঝতেই পারেননি।"

শুলুবিন পুড়িয়ে দেওয়ার মত দৃষ্টিতে ত্যারছা তাকাল। বলল, "সেই মানুষগুলি কারা, যাঁরা বিশ্বাস করতেন?"

"কেন, আমি নিজে বিশ্বাস করতাম। ফিনল্যাণ্ড-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্দি তাই করেছি"। [১৯৩৯-৪০ শীতে এই যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে লাল ফৌজের অবিশ্বাস্য প্রস্তুতি হীনতা দেখা গিয়েছিল। ফলে স্ট্যালিনী শাসনে জনগণের হতাশা আসে]

"কিন্তু এমন মানুষ ক'জন আছেন যাঁরা না বুঝে বিশ্বাস করতেন? আপনি যাই বলুন না কেন, আমি একথা মানতে নারাজ যে দেশের সব মানুষই হঠাৎ নির্বোধ হয়ে গিয়েছিল। আমি তা বিশ্বাস করি না। আগের যুগে জমিদাররা তাঁদের বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে একগাদা বাজে বক্‌বক্ করতেন আর গরীব চাষীরা শুনতে শুনতে গোঁফ দাড়ির আড়ালে মুচকি হাসত। জমিদার তা দেখতে পেতেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নায়েব-গোমস্তারাও পেত। আর, সময় মত ঐ চাষীরাই 'এক এবং অভিন্ন মানুষ' হয়ে প্রণাম জানাত। কিন্তু তার মানে কি এই যে ওরা জমিদারকে বিশ্বাস করত? যারা বিশ্বাস করবে তাদের কি ধরনের মানুষ হওয়া প্রয়োজন মনে করেন?" শুলুবিন ক্রমে রেগে উঠছিল। ও রেগে গেলে মুখভাব পুরোপুরি বদলিয়ে যায়। ওর কোন কিছুই স্বভাবিক থাকে না। "বলুন, কি ধরনের মানুষ হওয়া প্রয়োজন?" শুলুবিন বলে চলল, "যত ইঞ্জিনিয়ার আর অধ্যাপক ছিল হঠাৎ দেখা গেল তারা সবাই বিধ্বংসকারী হয়ে গিয়েছে, এবং তারা নিজেরাও তাই বিশ্বাস করতে লাগল! গৃহ-যুদ্ধ ডিভিশনের সেরা সেনাপতিরা দেখা গেল জার্মান আর জাপানী চর হয়ে গিয়েছে; তারাও ঐকথা বিশ্বাস করে নিল! লেনিনের আমলের পুরানো রক্ষী দলের সবাই জঘন্য দলত্যাগী হয়ে গেল; ওরাও তাই বিশ্বাস করল। তাদের বন্ধু-বান্ধব আর পরিচিত ব্যক্তিদের মুখোস খুলে দিয়ে বলা হ'ল ওরা আসলে গণশত্রু; সে বেচারীরাও বিশ্বাস করল! দেখা গেল লক্ষ লক্ষ রুশ সৈন্য দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; সৈনিকরাও তাই বিশ্বাস করল! দেশের বুড়ো আর শিশুদের পিষে ফেলে দিল; তারাও বিশ্বাস করেছে! জিজ্ঞেস করি, এরা কেমন মানুষ, মূর্খ? গোটা দেশই মূর্খ হয়ে গেল? মাফ করবেন, আমি তা মেনে নিতে পারছি না। আমার ধারণা ওরা সবাই যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিল, কিন্তু ওরা স্রেফ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল। বড় বড় জাতির মধ্যে একটা সাধারণ নিয়ম দেখা যায়ঃ প্রাণে বাঁচতে হলে সহ্য করতে হবে। একে একে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব। ইতিহাস হয়ত তখন আমাদের কবরের পাশে এসে প্রশ্ন করবে, 'এটা কার কবর?' তার উত্তর শুধু পুশকিনের ভাষায় দেওয়া চলবেঃ

"আমরা সবাই, প্রত্যেকে মোরা
দুঃসময়ের সঙ্গী—
অত্যাচারী, নয় বিশ্বাসঘাতী
অথবা নিছক বন্দী।"

ওলেগ্ চমকিয়ে উঠল। ও পুশকিনের ঐ কবিতার সঙ্গে পরিচিত নয়। তবু পংক্তি ক'টায় কি অন্তর্ভেদী সত্যতা। সত্য যেন কবির মতই পার্থিব আকারে রূপান্তরিত।

শুলুবিন আঙ্গুল নেড়ে বলল, "কবির কাব্যে মূর্খের স্থান নেই, যদিও তিনি অবশ্যই জানতেন পৃথিবীতে মূর্খ বড় কম নেই। না, আমার তিনটে সম্ভাবনার কথা মনে আসে। আমি কখনো কয়েদ হইনি। অত্যাচারীও ছিলাম না। সুতরাং আমি·····" শুলুবিন হাসল। তারপর কাশতে আরম্ভ করল। "সুতরাং আমি······"

উটকো হয়ে বসা শুলুবিন কাশতে কাশতে ফুলতে লাগল। কাশি থামতে বলল, "আপনি কি মনে করেন আমার জীবন আপনার থেকে সহজভাবে কেটেছে? আমি সারা জীবনই ত্রাসে কাটিয়েছি। কিন্তু এখন আমি আপনার সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করতে ভয় পাই না।"

শুলুবিনের মত ওলেগ্ও দাঁড়ে বসা বড আকারের পাখীর মত দুলছিল। ওদের দু'জনের কালো ছায়াও ওদের সঙ্গে দুলছিল।

"না, আলেক্সি ফিলিপোভিচ্ আপনি ভুল করছেন। আপনার নিন্দা যেমন ব্যাপক, তা তেমনি অকারণ কঠোর। আমার মতে তারাই বিশ্বাসঘাতক যারা লিখিত ধিক্কার দাখিল করে কিংবা সাক্ষ্য দেয়। এ ধরণের মানুষও কয়েক লক্ষ আছে। প্রতি বন্দী পিছু, অন্ততঃ তিনজন বন্দী পিছু একজন চর থাকে, ধরে নেওয়া চলে। অর্থাৎ বেশ কয়েক লক্ষ চর আছে। তবু প্রতিটি চরকে বিশ্বাসঘাতক বলা অযৌক্তিক। পুশকিনও অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা বলেছেন। তুফান উঠলে বড বড গাছ ভেঙে পড়ে, কিন্তু ঘাসের শুধু মাথা নুয়ে পড়ে। অতএব, ঘাস কি গাছের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলা চলবে? সবারই নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ আছে। আপনার ভাষাতে বলি, প্রাণ বাঁচা·· চাওয়া সব জাতিরই ধর্ম।"

শুলুবিন এমন করে চোখ-মুখ কোঁচকাল যে ওর চোখ অদৃশ্য হয়ে গেল। মুখের সামান্যই ঠিক রইল। চোখ দুটো বুজে যেতে চার পাশের ছিটে ছিটে দাগ লাগা ত্বক প্রকট হ'ল। ও তারপর মুখভাব সহজ করল। চোখের মণিকে ঘিরে তামাক-বাদামী রঙ, সাদা অংশ লালচে। ঘোলাটে দৃষ্টি। ও বলল, "বেশ, তবে এই প্রবৃত্তিটাকে যূথ-প্রবৃত্তির মার্জিত রূপ বলা যাক। অর্থাৎ দল-ছুট, একা হওয়ার ভীতি। এটা নতুন কিছু নয়। দার্শনিক ফ্রান্সিস্ বেকন ষোড়শ শতকেই তাঁর উপাস্য দেবতার নীতি লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ কেবল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাঁচতে চায় না। অভিজ্ঞতাকে সংস্কার দ্বারা কলুষিত করে বাঁচতে চাওয়া তার পক্ষে সহজতর। এই সংস্কারগুলিই তার উপাস্য দেবতা। বেকন এই সংস্কারগুলিকে 'দলের উপাস্য দেবতা', বা 'গুহার উপাস্য দেবতা' বলেছেন······"

শুলুবিন 'গুহার উপাস্য দেবতা' কথাটা উচ্চারণ করতে এক ধোঁয়া ভর্তি,

মাঝখানে আদিম মানব আগুনে মাংস সেঁকা, আর তার গভীরে, প্রায় অদৃশ্য এক নীলাভ দেবতা সম্বলিত এক গুহার কল্পনা ওলেগের মনে এল।

" ...এবার 'রঙ্গ মঞ্চের দেবতা'র কথা। সে দেবতার অধিষ্ঠান কি মঞ্চের পর্দার অন্তরালে, না রঙ্গশালার বৈঠকখানায়? না, তাকে বরং পাওয়া যাবে রঙ্গশালার সামনের ছোট্ট বাগানটিতে।"

"আপনি 'রঙ্গ মঞ্চের দেবতা' কাকে বলছেন?"

"কেন, জন সাধারণের যে অভিজ্ঞতা হয়নি সে সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য মতামত, যা জনগণ ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ বলে মেনে নিতে পারে, তাকেই রঙ্গমঞ্চের দেবতা বলব।"

"অমন ত' প্রায়ই ঘটে থাকে।"

"কিন্তু কখনো কখনো জনসাধারণের বাস্তব অভিজ্ঞতা হলেও তারা নিজের চক্ষু-কর্ণকে বিশ্বাস না করাই সুবিধাজনক মনে করে।"

"আমি ঐ ধরণের কিছু ঘটনাও দেখেছি .... "

"রঙ্গমঞ্চের আরেক উপাস্য দেবতা হল আমাদের বিজ্ঞান সম্বলিত যুক্তি মেনে নেওয়ার অতি-প্রবণতা। সহজ ভাষায় একে বলা চলে অপরের ত্রুটি স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া।"

"সুন্দর," ওলেগ্ সানন্দে বলে উঠল, "অপরের ত্রুটি স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া! দারুণ বলেছেন!"

"আরো আছে—বাজারের উপাস্য দেবতা।" ওলেগের পক্ষে এই দেবতার কল্পনা সহজতম কাজ। বাজারের সামনে দণ্ডায়মান কোন ব্রোঞ্জের মূর্তি ওর মনে এল। শুলুবিন আবার বলল, "পরস্পরের বার্তা বিনময় জনিত ভুলকে বজারের দেবতা বলব। মানুষ কতকগুলি কথা এবং ফর্মুলা প্রয়োগের অভ্যাস করে ফেলেছে, যদিও তা যুক্তি-বিরোধী। তা থেকেই ঐ ভুলের উৎপত্তি। যেমন আপনি যেই মাত্র কারো সম্পর্কে উচ্চারণ করবেন 'গণশত্রু!' 'বিশ্বাসঘাতক!' সঙ্গে সঙ্গে সবাই আপনার সুরে সুর মেলাবে।"

শুলুবিন এক একবার এক হাত তুলে নিজের বক্তব্য জোরদার করল। ওকে আবার এক বড আকারের পাখির মত দেখাচ্ছিল, যার ডানা কেটে দেওয়ার ফলে ওড়ার চেষ্টা করেও পারে না।

বসন্ত কাল হিসেবে রোদের তেজ অত্যন্ত বেশী। ওদের পিঠ পুড়ে যাচ্ছিল। সবে সবুজ হওয়া গাছের ডালগুলোয় পাতার সম্ভার তেমন হয়নি। ডালে ডালে জড়াজড়ি হয়নি। একটু ছায়া নেই। আকাশের রঙ তখনো রোদে পোড়া হয়নি। মাঝে মাঝে সাদা মেঘের ফালি ভেসে বেড়ানো আবরণ মোটা-মুটি নীল। কিন্তু শুলুবিনের চোখ এসব দেখছিল না, নয়ত' যা দেখছিল তা বিশ্বাস করছিল না। ও তর্জনী উঁচু করে বলল, "এত রকমের উপাস্য দেবতার ওপর ছেয়ে থাকে ভীতির আকাশ। সে আকাশ ধূসর মেঘ থমথমে: ঝড়ের আভাস ছাড়াই কখনো সন্ধ্যের আকাশ কালো আর ধূসর ঘন মেঘে ভারী হয়ে

উঠতে দেখেছেন কি? সন্ধ্যার অনেক আগেই থমথমে অন্ধকার নেমে আসে। তখন পৃথিবীর কোন কিছুতেই স্বস্তি মেলে না। শুধু নিজের পাকা বাড়ীর তপ্ত কোণে পরিবার বর্গের কাছাকাছি বসে থাকতে ইচ্ছে করে। আমি ঐ রকম আকাশের নিচে পঁচিশটি বছর কাটিয়েছি। কোন মতে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি। কারণ আমি ঘাড় গুঁজে, মুখ বুজে থাকতাম। পঁচিশটি বছর মুখ বুজে থেকেছি, আঠাশ বছরও হতে পারে। প্রথমে মুখ বুজেছি স্ত্রীর স্বার্থে, তারপর সন্তানদের হিত কামনায়, সব শেষে নিজের এই পাপী দেহটার জন্য। স্ত্রী মারা গেল। আর আমার দেহ দূষিত মলে ভর্তি হয়ে রইল— এরা সেই মল বের করে দেওয়ার জন্যই এক পাশে একটা ফুটো করবে। আর, আমার ছেলেমেয়েরা এত অবিবেচক হয়েছে যা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অতীত। জানেন, আমার মেয়ে হঠাৎ আমাকে চিঠি পাঠানো শুরু করল। গত দু'বছরে মোট তিনটে চিঠি দিয়েছে—এখানে নয়, আমার বাড়ীতে। কেন জানেন, ওর পার্টি সংগঠন ওকে বাপের সঙ্গে সম্পর্ক শুধরিয়ে নিতে বলেছে। ব্যাপারটা বুঝছেন? কিন্তু পার্টি আমার ছেলেকে ওসব করতে বলেনি…"

শুলুবিন ওলেগের দিকে ফিরে নিজের ভারী ভুরু দু'টো কোঁচকাল। ওর সব কিছু আলুথালু। ওলেগের হঠাৎ মনে হ'ল, ও 'জল পরী'র দর্গোমিজস্কি লিখিত বিখ্যাত নৃত্যনাট্য পাগলা গমকলওলা; উন্মত্তের মত ঘোষণা করছে: "আমি গমকলওলা নই, আমি দাঁড় কাক! দাঁড় কাক!"

"আমার আর বেশী কথা মনে পড়ে না। যেন ঐ ছেলেমেয়ের কোন দিনই অস্তিত্ব ছিল না। ওরা যেন এক অলীক স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে আচ্ছা, মানুষ কি একটা কাঠের তক্তা হয়ে যেতে পারে? কোন তক্তা একাই পড়ে থাক বা আরো ক'টা তক্তার সঙ্গে থাক, তাতে তক্তার কিছু আসে যায় না। আমি যেমন জীবন যাপন করি তাতে কখনো যদি হঠাৎ দম ফুরিয়ে মেঝেয় পড়ে থাকি তবে বেশ ক'দিনের মধ্যে কেউ আমার খোঁজই নেবে না। পড়শীরাও খোঁজ নেবে না। কিন্তু ওটাই সব কথা নয়। আরো আছে। শুনুন।" ও ওলেগের কাঁধ শক্ত করে ধরল। পাছে ওলেগ ওর কথা না শুনতে চায়। "আমি এখনো সাবধানে থাকি। ঠিক আগের মত। কিছু করার আগে নিজের পেছন দিকটা দেখে নিই। ওয়ার্ডে প্রকাশ্যে অনেক কথা বলে ফেলেছি বটে, কিন্তু আমার নিজের শহর কোকন্দ-এ, ওসব বলার সাহস কিছুতেই হবে না। আর, আপনাকে এখন যা বলছি তা বলছি এই কারণে যে ওরা আমাকে ঠেলা গাড়ী ঠেলে অপারেশন টেবিলে নিয়ে চলল বলে। কোন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত নেই বলে এখনো এসব বলতে পারছি। থাকলে, পারতাম না। ওরা আমাকে ঠেলতে ঠেলতে এত দূরে নিয়ে এসেছে…জানেন, আমি কৃষি মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক। তারপর ঐতিহাসিক এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে উচ্চতর পাঠক্রম শেষ করেছি। কয়েকটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম…মস্কোর মত

জায়গায়। তারপর মহীরুহের পতন আরম্ভ হ'ল। কৃষি মহাবিদ্যালয়ের মুরাটভ্-এর পতন হ'ল। ডজন ডজন অধ্যাপক গ্রেফতার করা হতে লাগল। আমাদের 'ভুল' স্বীকার করতে বলা হ'ল। আমি ভুল স্বীকার করলাম। আমাদের বলা হ'ল, ওদের ধিক্কার করো। আমি ধিক্কার করলাম। সামান্য কিছু লোক নিজের প্রাণ বাঁচিয়েই ফেলে। আমি তাদের একজন। আমি কৃষি বিদ্যা ছেড়ে তাত্ত্বিক জীব-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা শুরু করলাম। নিরুপদ্রব কাজ। ভালই ছিলাম। তারপর ওখানেও শুদ্ধি আরম্ভ হ'ল। সে কি ব্যাপক শুদ্ধি! জীব-বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকটা অধ্যাপক পদ বেশ করে ঝেঁটিয়ে শুদ্ধ করে দিল। আমাকে বলা হ'ল, অধ্যাপকের পদ খালি করে দিতে পারো না? তাই করলাম। অধ্যাপকের পদ ছেড়ে অধ্যাপকের সহকারী হলাম। বুঝতে পারছেন, আমি পদ মর্যাদা হ্রাস মেনে নিয়ে ছোট আকারের মানুষ হতে রাজী হলাম।"

যে শুলুবিন ওয়াডে সব সময় চুপচাপ থাকে, সেই অবিশ্বাস্য অনায়াসে কথাগুলো বলছিল। যেন জন সভায় বক্তৃতা করাই ওর কাজ।

"ওরা পাঠক্রম ও' বদলিয়ে দিচ্ছিলই, খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের লেখা পাঠ্য পুস্তকগুলো ধ্বংস করছিল। ঠিক আছে, তাও মেনে নিলাম ঃ আমরা নতুন পাঠ্য পুস্তকই পড়াব। ওরা তারপর বলল, শারীরস্থান বিদ্যা, আর জীব-বিজ্ঞান আর স্নায়ু রোগ-বিদ্যার পাঠক্রম এমন নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে এক অজ্ঞ কৃষি বিজ্ঞানী আর এক মূর্খ উদ্যানবিদের ['অজ্ঞ কৃষি বিজ্ঞান' মানে ত্রোফিম লাইসেঙ্কো। ১৯৬৪তে ক্রুশ্চেভের পতনের সময় অব্দি লাইসেঙ্কো রুশ জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধিপত্য করেছেন। তিনি নিরাপত্তা পুলিশের কাছে ধিক্কার জানিয়ে বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর সর্বনাশ করেছিলেন। 'মূর্খ উদ্যানবিদ' মানে আইভান মিচুরিন। মিচুরিন নতুন ধরনের ফলের গাছ উদ্ভাবনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। লাইসেঙ্কো মিচুরিনের বৈজ্ঞানিক কাজের অপপ্রয়োগ করেছেন] মতামত অনুসারী হয়। তোফা! আমি ওদের কথা জেনে নিলাম। না, ঐটুকু যথেষ্ট নয়। ওরা জানতে চাইল আমি সহকারী অধ্যাপকের পদ ছাড়তে রাজী আছি কিনা। তাতেও রাজী হলাম। বললাম, আমি নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী জীব-বিজ্ঞান পড়াতে রাজী আছি। আমাকে স্কুল শিক্ষকের কাজ দাও। ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে বরখাস্ত করলই, স্কুলেও কাজ দিল না। শেষে আমি জানালাম, আমি সুদূর কোকন্দ্-এ গ্রন্থাগারিক-এর চাকরি নিতে চাই। বুঝতেই পারছেন আমি অনেক দূর পেছু হটেছি। তবু ও' আজও বেঁচে আছি। আর, আমার ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়েছে। যাহোক গ্রন্থাগারগুলোও কর্তৃপক্ষের থেকে গোপন নির্দেশ পায়। তাতে বলা থাকে, অমুক লেখকের অমুক বই নষ্ট করে ফেলো। এসব আমার কাছে নতুন কিছু নয়। আমিই কি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অধ্যাপক হিসেবে পঁচিশ বছর আগে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বকে প্রতি বিপ্লবী সেকেলেপনা আখ্যা দিইনি। আমি স্রেফ বইগুলোর তালিকা তৈরি করে তাতে

কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি আর বিশেষ বিভাগের প্রতিনিধির সই নিয়ে নিতাম। বইগুলোকে ফায়ারপ্লেসে ঢুকিয়ে দিতাম। আগুনে ঠেসে দিতাম প্রজনন বিদ্যা, বামপন্থী কান্তিশাস্ত্র, প্রাণী দেহের নিয়ন্ত্রণ কৌশল, গণিত আরো কত যে বই ”

খ্যাপা দাঁড়কাকটা হাসতেও পারে বটে।

“.... রাস্তায় বই পুড়িয়ে কি হবে? যত অর্থহীন নাটুকেপনা! ঘরের কোণায় ফায়ারপ্লেসই ভাল। ঘরটাও গরম থাকে। ওরা আমাকেও ঐ ফায়ারপ্লেসেই বারবার ঠেলে দিয়েছে......তবু আমি একটা পরিবার প্রতিপালন করতে পেরেছি। আজ আমার মেয়ে এক প্রাদেশিক খবর কাগজের সম্পাদিকা। ও একটা ছোট্ট কবিতা লিখেছে। শুনুন!

পিছু হটতে শিখিনি——পিছু হটব না, হটব না!
ক্ষমা চাইতেও পারিনা——পারব না পারব না!
আমার লড়াই? যোদ্ধার মত খোলা তরোয়াল হাতে;
শিখিনিকো বুড়ো বাপের মত ভয়ে মুখ লুকাতে।”

শুলুবিনের ড্রেসিংগাউন যেন এক জোড়া অসহায় ডানা। “আমি স্বীকার করি,” ওলেগ্ কোন মতে বলতে পারল, “আপনার জীবন আমার থেকে একটুও সহজ হয়নি।”

“আঃ, আমি বাঁচলাম”, শুলুবিন প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল। ও আগের ভঙ্গীতে বসে, অনেক সহজ ভাবে বলতে লাগল, “যুগ পরিবর্তনের ধাঁধাআমি আমি আর কিছুতে সমাধান করে উঠতে পারলাম না। দশ বছরের ও কম সময়ে দেশের তাবৎ জন সাধারণ কি করে সামাজিক উদ্যম আর সাহসিকতা খুইয়ে ফেলে আমি বুঝতে পারি না। বরং বলব, সেই উদ্যগ্র সাহসিকতা শূন্যাঙ্কের অনেক নিচে নেমে গিয়েছে দেখে হতবাক হয়ে যাই। জানেন, ১৯১৭ থেকেই আমি বলশেভিক। কি করে আমরা তাম্বভ-এ ‘সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদল’ আর মেনশেভিকদের তাড়া করে ওদের আঞ্চলিক পরিষদ ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলাম, তা স্পষ্ট মনে পড়ে। অথচ তখন অস্ত্র বলতে আমাদের ছিল হাতের আঙুল ক’টা যা মুখে পুরে খুব জোর শিস্ দেওয়ার বেশী কিছু করা যেত না। আমি গৃহযুদ্ধে লড়েছি। সে লড়াই করতে গিয়ে নিজেদের একটুও সুরক্ষিত করিনি। বিশ্ববিপ্লবের জন্য আমরা সব কিছু দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তা আমাদের এমন হ’ল কেন? আমাদের পক্ষে কি নতি স্বীকার করা সম্ভব? কেন ঘটল এই অধঃপতন? ভয়? বাজারের উপাস্য দেবতা না, রঙ্গমঞ্চের দেবতার জন্য ঘটল? বেশ, আমি নয় এক ছোট-খাটো মানষ, কিন্তু নাদিয়েজ্দা কনস্ট্যান্টিনোভ্না ক্রুপ্স্কায়া’র [লেনিনের স্ত্রী] বেলায় কি বলবেন? যা কিছু ঘটছিল ক্রুপস্কায়া কি তার কিছুই বুঝতে পারেননি? তবে কেন সোচ্চার হলেন না? তাঁর একটি মাত্র বিবৃতি—হয়ত তার জন্য তাঁর প্রাণ যেত—আমাদের কাছে কত যে মূল্যবান হত!

কে জানে, হয়ত আমরা কঠোর হয়ে রুখে দাঁড়াতাম, আর একটুও অধঃপতন ঘটতে দিতাম না। বেশ, ক্রুপ্স্কায়ার কথা নয় ছেড়েই দিলাম, অর্দোনিকিজে'র [এক প্রবীণ বলশেভিক নেতা। তৃতীয় দশকে রুশ দেশের শিল্পায়নের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৩৭-এ আত্মহত্যা করেন] বেলায় কি বলবেন? ওঁর মত খাঁটি মানুষ হয়? ওরা ওঁকে শ্লুসেলস্বুর্গ দুর্গে বন্দী রেখেও ভাঙতে পারেনি, সাইবেরিয়ায় কঠোর শ্রম নির্বাসন দিয়েও পারেনি। উনি কেন একটি বারও স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি? কিসের বাধা? না, ওঁরা রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যু বরণ কিংবা আত্মহত্যা শ্রেয়ঃ মনে করলেন। একে সাহস বলবেন? বলবেন নির্ভীকতা, বলুন?"

"আমি কি করে বলব, আলেক্সি ফিলিপোভিচ? আমার বলার যোগ্যতা আছে? অপনিই বরং বলুন।"

শুলুবিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করল। যে ভাবেই বসুক, ওর ব্যথা লাগে। লাগুক। "আরো একটা প্রসঙ্গ আমার মন তোলপাড় করে। এই যে আপনি। বিপ্লবোত্তর যুগে আপনার জন্ম। আপনাকেও ওরা নির্বাসন দিয়েছে। ফলে আপনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস হারিয়েছেন ত', হারাননি?"

ওলেগ্ অস্পষ্ট হেসে বলল, "ঠিক বলতে পারব না। ওখানকার কঠোরতা অত বেশী যে যা কিছু করতে মন চায় না, রাগের বশে তাও করতে ইচ্ছে করে।"

শুলুবিন যে হাত দিয়ে বেঞ্চিতে দেহের ভর রাখছিল, রোগে দুর্বল সেই হাত তুলে ওলেগের কাঁধ ধরল। "আপনি যুবক। তাই বলি, ভুল বুঝবেন না। নিজের দুঃখ-কষ্টময় জীবনের জন্য সমাজবাদকে দায়ী করবেন না। আপনি যে দিক থেকেই দেখুন না কেন, ইতিহাস পুঁজিবাদকে চিরতরে প্রত্যাখ্যান করেছে।"

"শিবিরে থাকাকালীন আমরা বলাবলি করতাম, ব্যক্তিগত উদ্যোগের অনেক ভাল দিক আছে। ওতে জীবন সহজতর হয়। সব জিনিষ সব সময় পাওয়া এবং কোথায় পাওয়া যাবে তাও জানা যায়।"

"ওটা আদর্শে আস্থাহীন মানুষের যুক্তি। একথা ঠিক যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ অসম্ভব নমনীয়, কিন্তু তা এক অতি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে উপকারী। ব্যক্তিগত উদ্যোগকে যদি কঠোরতম নিয়ন্ত্রণে না রাখা হয় তবে তা থেকে এমন মানুষের জন্ম হয় যারা পশুর চেয়ে ভাল নয়। যেমন, সীমাহীন লোভী শেয়ার বাজারের চাঁইরা, যারা কোন রকম নিয়ন্ত্রণের তোয়াক্কা রাখে না। অর্থনৈতিক বিচারে ধূলিসাৎ হওয়ার অনেক আগেই পুঁজিবাদ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।"

"সত্যি বলতে কি," ওলেগ্ কপাল কুঁচকিয়ে জবাব দিল, "আমাদের সমাজেও এমন মানুষ কম নেই যাদের লোভ নিয়ন্ত্রণ মানে না। সরকারের থেকে লাইসেন্স-

প্রাপ্ত মেরামতি মিস্ত্রি এবং অন্য কারিগরদের কথা বলছি না। ইমেলিয়ান-সাশিক-এর কথাই ধরুন না ”

“ঠিক বলেছেন,” ওলেগের কাঁধে শুলুবিনের হাতের চাপ বাড়ল, “কিন্তু, তার জন্য কি সমাজবাদ দায়ী? আমরা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরেছি। ভেবেছি, উৎপাদনের পদ্ধতি বদলানোই যথেষ্ট, এবং তার সঙ্গে জনগণও বদলাবে। তাই কি বদলিয়েছে? জনগণ একটুও বদলায়নি। আর যাহোক, মানুষ এক জীব মাত্র। তাকে বদলাতে কয়েক হাজার বছর লেগে যাবে।”

“এখনো কি সমাজবাদ থাকবে?”

“এ একটা হেঁয়ালি, তাই নয়? ওরা 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'-এর কথা বলে, কিন্তু ঐ সমাজবাদ এত জলো যে তাতে সমাজবাদের সারটাই বাদ পড়ে। যায়। ঐ কথাটিতে শুধু সমাজবাদ কি আকারে প্রবর্তিত হ'ল, অর্থাৎ যে রাষ্ট্র সমাজবাদ প্রবর্তন করছে তার কাঠামোর কথা জানা যায়। ঐ কথাটিকে বরং এক নিছক ঘোষণা মনে করা চলে যে, সমাজবাদ প্রবর্তিত হওয়ার ফলে কারো মথো কাটা যাবে না। কিন্তু ঐ সমাজবাদ কোন্ ভিত্তির ওপর গড়া হবে তা ঐ কথাটি থেকে বোঝা যায় না। পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্যের ওপর সমাজবাদ গড়া চলে না। কারণ মানুষ মাঝে মাঝে মেষের মত আচরণ করতে অভ্যস্ত। ফলে সম্পদগুলি তার পায়ের তলায় পিষে যায়। তেমনি হিংসা-দ্বেষের বাণী সার করেও সমাজবাদ গড়া যায় না, কারণ হিংসা সমাজ জীবনের ভিত্তি হতে পারে না। একটি মানুষ সারা বছর হিংসা উদ্গীরণ করে হঠাৎ এক দিন ঘোষণা করতে পারে না, ‘যথেষ্ট হয়েছে। আমি আজ থেকে হিংসা ভুলে শুধু ভালবাসব!’ না, তা হয় না। কেউ হিংসা-দ্বেষ শুরু করলে, হিংসাই করে চলবে। সে তার হিংসার পাত্র খুঁজে নেবে। আপনি হেরওয়েগ্-এর [জর্জ হেরওয়েগ (১৮১৭—১৮৭৫) বিপ্লবী জার্মান কবি। এক সময় কার্ল মার্ক্সের বন্ধু ছিলেন] এই কবিতাটা জানেন?

যতকাল এ বাহু হবে না পঙ্গু
তরবারি হবে না নতশির, হবে না!
ভালবাসা সবই উজাড় করেছি,
ভাণ্ডারে আছে হিংসা, দ্বেষ আর ঘৃণা!”

“অবশ্যই জানি। স্কুলে পড়তে হত,” ওলেগ্ কবিতার ঐ পংক্তিটি পুনরাবৃত্তি করল।

“ঐ দেখুন, স্কুলে পড়তে হত—কি ভয়াবহ পরিস্থিতি। অথচ স্কুলে শেখানো উচিত ছিল ঠিক ওর বিপরীত মর্মার্থযুক্ত কোন কবিতা। তার বাণী হওয়া উচিত ছিলঃ ‘হিংসার হোক আজ অবসান, ধরো ভালবাসার ঐকতান’! এই হওয়া উচিত সমাজবাদের কাঙ্খিত রূপ।”

“আপনি কি খৃষ্টান সমাজবাদের কথা বলছেন?” ওলেগ্ প্রশ্ন করল।

“এ সমাজবাদকে ‘খৃষ্টান’ অভিহিত করা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। হিটলার

আর মুসোলিনির আমলে তাদের সমাজে কয়েক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছিল যারা নিজেদের 'খৃষ্টান সমাজবাদী' নামে অভিহিত করত। কিন্তু কি ধরণের মানুষ নিয়ে তারা ঐ সমাজবাদ গড়েছিল তার কোন ধারণা আমার নেই। গত শতকের শেষ দিকে টলস্টয় সমাজে বাস্তব খৃষ্টবাদ প্রচলন করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সমসাময়িকদের পক্ষে ঐ আদর্শ রূপায়ণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাঁর মতবাদ বাস্তবের সঙ্গে অসম্পৃক্ত ছিল। আমার ধারণা, আমাদের এই পাপ স্বীকার, প্রায়শ্চিত্ত আর বিদ্রোহ ভরা রাশিয়ায়, আমাদের দস্তয়েভস্কি, টলস্টয় আর ক্রোপোটকিনের রাশিয়ায় যে একটি মাত্র খাঁটি সমাজবাদ সম্ভব তা হ'ল নৈতিক সমাজবাদ, এবং তা সম্পূর্ণ বাস্তব।"

ওলেগের চোখ দুটো কুঁচকিয়ে গেল। "কিন্তু এই নৈতিক সমাজবাদের রূপরেখা কি ধরণের হবে?"

"সেটা কল্পনা করা কঠিন ব্যাপার নয়," শুলুবিন বলল। ওর হতচকিত দাঁড়কাকের ভাব চলে গিয়ে সজীবতা ফিরে এসেছিল। ও যেন ওলেগকে শেখাতে ব্যগ্র এক শিক্ষক। "বিশ্বের চোখের ওপর আমাদের এমন এক সমাজ তুলে ধরতে হবে যার যাবৎ সম্পর্কাদি, মৌলিক নীতি এবং আইন সরাসরি নৈতিক সূত্র থেকে উৎসারিত। নৈতিক বিচার হবে সব সিদ্ধান্তের ভিত্তি। সন্তানাদি পালন, তাদের শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু চয়ন, বয়স্কদের কাজ-কর্মের লক্ষ্য এবং অবসর যাপন সবই নৈতিক বিচার সম্মত হবে। কেবল মাত্র সেই বিজ্ঞান চর্চা চলবে যার সঙ্গে নৈতিকতার সংঘাত নেই, এবং যা গবেষকদের ক্ষতির কারণ হবে না। বৈদেশিক সম্পর্কেও একই নীতি অনুসৃত হবে। বিতর্কিত রাষ্ট্র-সীমার প্রশ্নে আমাদের রাষ্ট্রের সম্মান, প্রতিপত্তি বা সমৃদ্ধি বৃদ্ধি সীমানা নির্দ্ধারণের মাপকাঠি হবে না। মাপকাঠি হবে নৈতিক বিচার।"

"আপনার বক্তব্য শুনলাম, কিন্তু ওসব কি আগামী দু'শো বছরেও বাস্তবায়ন সম্ভবপর?" ওলেগ্ ভ্রূকুটি করল, "আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, আপনার পরিকল্পনার ভিত্তি কি হবে? সে সমাজেও অর্থনীতির স্থান থকবে ত'? কারণ অর্থনীতির ত' সর্বোচ্চ আসন পাওয়ার কথা।"

"তাই কি? এটা তর্ক সাপেক্ষ। যেমন ধরুন, সলোভিয়েভ্। [রুশ ধর্মীয় চিন্তা নায়ক ভ্লাদিমির সলোভিয়েভ্ (১৮৫৩—১৯০০, যাঁর মতবাদ আধুনিক অ-মার্ক্সীয়দের মনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে] যথেষ্ট প্রতীতি আনয়নের মত করে বলেন, অর্থনীতিও নৈতিক ভিত্তির ওপর রচিত হওয়া সম্ভব এবং উচিত।"

"কি বললেন, নৈতিকতা আগে আর অর্থনীতি পরে?" ওলেগ্ হতভম্ব।

"যথার্থ। শুনুন, যদিও আপনি রুশ, আপনি যে এক লাইনও সলোভিয়েভ্ পড়েননি একথা বাজী রেখে বলতে পারি। পড়েছেন?"

ওলেগ্ নেতিবাচক ঠোঁট কোঁচকাল। "বেশ, সলোভিয়েভের নামটা ত' শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, শুনেছি। কারাগারে থাকতে শুনেছি।"

"অন্ততঃ কয়েক পাতা ক্রোপট্‌কিন ত' পড়েছেন ? ওঁর 'মানব সমাজে পারস্পরিক সহায়তা' পড়েছেন ?"

ওলেগ্‌ আবার নেতিবাচক ঠোঁট কোঁচকাল। "ওঁর মতবাদ, অবশ্য, ভ্রান্ত। তা পড়ে আর কি হবে ? কিন্তু মিহাইলোভস্কি ? [জনমুখী সমাজবাদের অগ্রণী প্রবক্তা মিহাইলোভ্‌স্কি (১৮৪০-১৯০৪)] না, আপনি মিহাই লোভস্কিও পড়েননি। ওঁর মতবাদ পরাস্ত এবং নিষিদ্ধ হয়েছিল। গ্রন্থাগার থেকে ওঁর বইগুলো প্রত্যাহৃত হয়েছিল, তাই নয় ?"

"ঐসব বই আমি কখন পড়তাম বলুন ত' ? কোন্‌ বই আমি পড়তে পেয়েছি ?" ওলেগ্‌ বিরক্তি প্রকাশ করল। "সারা জীবন দেহের রক্ত জল করা খাটুনি খাটতে হয়েছে। তবু লোকে জিজ্ঞেস করে, এ বই পড়েছ, সে বই পড়েছ ? ফৌজে থাকতে কখনো কোদাল হাত ছাড়া করতে পারিনি। বন্দী শিবিরেও তাই। তারপর নির্বাসনেও কিছু বদলায়নি, শুধু কোদালের বদলে খুরপি আর নিড়ানি হাতে উঠেছে। এর মধ্যে কখন পড়তাম ?"

গোল গোল চোখ আর মোটা মোটা ভুরুওলা শুলুবিনের মুখ শিকার ধরতে উদ্যত শ্বাপদের মত উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছিল। "নৈতিক সমাজবাদ কি, তা আপনাকে বললাম," শুলুবিন বলল, "কখনই মানুষকে নিছক সুখের দিকে চালিত করা অনুচিত, যেহেতু সুখও এক প্রকার বাজারের উপাস্য দেবতা। বরং মানুষকে পরস্পরের প্রতি স্নেহশীল হতে শেখানো উচিত। শিকার করা পশুর মাংস ছিঁড়ে খায় যে শ্বাপদ সেও সুখী হতে পারে, কিন্তু কেবল মাত্র মানুষের পক্ষে পরস্পরের প্রতি স্নেহশীল হওয়া সম্ভবপর, এবং ঐটুকু পারাই মানুষের আশা-আকাঙ্খার মহত্তম কীর্তি পরিগণিত হবে।"

"না, না, তবু আমার শুধু সুখ চাই। আর কিছু না পেলে চলবে," ওলেগ্‌ খুব জোর দিয়ে বলল, "জীবনের আর যে'কটা মাস বাকি আছে তা স্রেফ সুখে কাটাতে চাই। চুলোয় যাক..."

"সুখ এক মরীচিকা মাত্র," শুলুবিন বিশেষ জোর দিয়ে বলল। ওর শরীরের সব শক্তি নিংড়িয়ে বক্তব্য রাখতে হচ্ছিল, ফলে ওকে বেশ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। "সন্তানাদি প্রতিপালন করে আমি সুখ পেয়েছিলাম, কিন্তু তারা আমার আত্মায় থুতু ফেলে দিল। সুখবোধকে জীইয়ে রাখতে আমি বই ভাল বাসলাম। সত্যের আকর ঐ বইগুলো হুতাশনে আহুতি দিতে হ'ল। আর তথাকথিত 'আগামী প্রজন্মের সুখ' ত' আরো বেশী মরীচিকা। সে প্রজন্মকে কে চেনে, কে তার সঙ্গে কথা বলেছে ? তারা কোন্‌ দেবতার আরাধনা করবে তা কে জানে ? সুখ সম্পর্কে ধারণা যুগে যুগে অত্যন্ত বদলিয়ে যায়। সুতরাং অনাগত প্রজন্ম সম্পর্কে আগাম পরিকল্পনা করার হঠকারিতা না করাই মঙ্গলকর। আমাদের যদি পায়ের তলায় মাড়িয়ে নষ্ট করার মত বাড়তি রুটি থাকে, যদি আমাদের গলা পর্যন্ত ঠেসে দেওয়ার মত দুধের প্রাচুর্য হয়, তবু সুখ এতটুকু বাড়বে না। কিন্তু

আমাদের পর্যাপ্ত না থেকেও যদি তা ভাগ করে নিই, আমরা আজই সুখী হতে পারি। কেবল যদি সুখের জন্য পাগলামি করি আর নিজেদের প্রজাতি বৃদ্ধি করে যাই, তদ্বারা আমরা শুধু অবিবেচকের মত ধরাতলে ভিড় বৃদ্ধি করব আর এক ভয়ানক সমাজ সৃষ্টি করতে সক্ষম হব ·····মাফ করবেন, আমার বিশেষ ভাল লাগছে না···যাই, শুয়ে পড়িগে···"

শুলুবিনকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ও ইতিমধ্যে কত ভয়াবহ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ওলেগ্ তা আগে লক্ষ্য করেনি। "আমার হাত ধরুন, আলেক্সি ফিলিপোভিচ্।"

শুলুবিনের পক্ষে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ানো সহজ কাজ নয়। ওরা ধীর পায়ে হেঁটে চলল। ওদের ঘিরে বসন্তের লঘুভাব। ওরা দু'জন গুরু-ভারে পিষ্ট। দেহের হাড়গুলো, যেটুকু মাংস এখনো অবশিষ্ট আছে, পরনের পোষাক, জুতো, এমন কি সূর্যের আলোও গুরুভার দিয়ে ওদের ঠেসে ধরছিল।

দুই চলমান নির্বাক রোগী। কথোপকথনে ক্লান্ত।

ক্যানসার ওয়ার্ডের বাড়ীর গাড়ী বারান্দার নিচে পেঁছে শুলুবিন মুখ খুলল। ওলেগের হাতে ভর রাখা শুলুবিন মাথা তুলে পপলার গাছ আর এক ফালি হাসিখুসি আকাশ দেখল। বলল, "শুধু কি জানেন, আমি অপারেশনের ছুরির নিচে শুয়ে মরতে চাই না। ভয় লাগে। অতীত জীবন যত জঘন্যই হোক না কেন আর আগামী জীবন যত দীর্ঘ আর কষ্টদায়ক হোক না কেন, তবু বেঁচে থাকতে চাই···"

ওরা এক তলার বড় হলঘরে এল। ভ্যাপসা, গরম ঘরটা। ওরা ধীরে ধীরে, এক ধাপ করে লম্বা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। ওলেগ্ বলল, "আচ্ছা, বিগত পঁচিশ বছর আপনি যখন নতি স্বীকার করে, নিজের বিশ্বাস ত্যাগ করে দিন যাপন করতেন, তখনই কি আপনার এই মতবাদ সম্পর্কে ভাবতেন?"

শুলুবিন দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল "হ্যাঁ, তখনই ভেবেছি। আমি সব বর্জন করে, শুধু চিন্তা করেছি। পুরানো বইগুলো ফায়ারপ্লেসে ঠেসে দিয়ে চিন্তা করেছি। কেন চিন্তা করব না? অত দুর্ভোগ সয়ে আর বিশ্বাসঘাতকতা করেও কি আমার একটু ভাবনা-চিন্তা করার অধিকার হয়নি?"

বিপরীত চিত্র

ডণ্ট্সোভা কখনো কল্পনাও করেননি যে বস্তুর ভেতর-বাইরে তিনি পুরোপুরি জানেন তা একেবারে অচেনা, নতুন হওয়ার মত বদলিয়ে যেতে পারে। যে তিরিশ বছর উনি মানুষের রোগ ঘাঁটাঘাঁটি করছেন তার বিশটি বছর কেটেছে এক্স-রে'র পর্দার সামনে বসে। অজস্র বার এক্স-রে পর্দা আর

ছবি দেখেছেন, আর দেখেছেন রোগীদের মিনতি ভরা চোখ। যা দেখেছেন তা বই আর বিশ্লেষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন; সহকর্মীদের সঙ্গে তর্ক করেছেন, রোগীদের বুঝিয়েছেন আর প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যা জেনেছেন সে জ্ঞান ক্রমে তর্কাতীত প্রমাণিত হয়েছে, ক্রমশঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়েছে। নিদানতত্ত্ব, রোগ জননতত্ত্ব রোগের লক্ষণ বিচার, রোগ নির্ণয়, রোগের গতিপথ, চিকিৎসা, রোগ নিরোধ, রোগের পূর্বাভাস, এ সবই বাস্তব হয়ে উঠেছে। ডাক্তার হিসেবে রোগীদের সংশয়, ভীতি এবং তজ্জনিত চিকিৎসা প্রতিরোধ প্রবণতার প্রতি ওঁর সহানুভূতি থাকতে পারে। ওগুলি বোধগম্য মানব দুর্বলতা বই কিছু নয়। কিন্তু চিকিৎসার পদ্ধতি নির্দ্ধারণে ওসব ধর্তব্যের মধ্যে আসত না। যুক্তির বর্গক্ষেত্রের মধ্যে ওসব মনোবিকারের স্থান হয় না।

এ পর্যন্ত জানা গিয়েছে যে মানব শরীর মাত্রের গঠন অভিন্ন। প্রচলিত শারীরস্থান বিদ্যার পাঠ্য বইগুলি তাই বলে। দেহের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলি এবং অনুভূতিগুলির শারীরবৃত্তও অন্য দেহের থেকে অভিন্ন। কোন্‌টা স্বাভাবিক আর কোন্‌টা স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুত তাও প্রামাণিক বইগুলিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা আছে।

তবু হঠাৎ সামান্য ক'দিনে ডণ্ট্‌সোভার নিজের দেহ এই মহান সুব্যবস্থিত প্রক্রিয়ার কক্ষচ্যুত হয়ে কঠিন ধরাতলে পড়ল। সে দেহ এখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বোঝাই এক অসহায় বোঝা মাত্র—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেকোন মুহূর্তে ব্যথায় কেঁদে উঠতে পারে।

মাত্র ক'দিনে সব ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। ওঁর দেহ এখনো ওঁর চেনা অঙ্গ-প্রতঙ্গ দিয়েই গঠিত আছে। কিন্তু এখন তা সামগ্রিকভাবে অচেনা, ভয়াবহ হয়ে গিয়েছে।

ওঁব ছেলে যখন ছোট ছিল তখন দু'জনে মিলে ছবি দেখতেন। সাধারণ গেরস্থালি জিনিষ-পত্রের ছবি; কেটলি, চামচ কিংবা চেয়ার। অনভ্যস্ত দৃষ্টি-কোণ থেকে আঁকা হলে, ও ঐ জিনিষগুলো চিনতে পারত না। রোগের গতি এবং চিকিৎসা প্রক্রিয়া, ওঁর নতুন অবস্থান, আজ ওঁব কাছে তেমনি অচেনা হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় উনি যে যুক্তিবাদী নির্দেশক শক্তি ছিলেন, আজ থেকে উনি আর তা থাকবেন না। উনি এক যুক্তি বিরহিত, যুক্তি-প্রতিরোধী পদার্থের তাল হয়ে পড়েছেন। যে মুহূর্তে রোগের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে উনি পায়ে মাড়ানো ব্যাঙের মত রোগ-পিণ্ড হয়ে গিয়েছেন। রোগের সঙ্গে মানিয়ে চলা প্রথমে অসহ্য মনে হয়েছে। অস্তিত্বের তাবৎ ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে ওঁর জগতটার ভরাডুবি হয়েছে। এখনো ত' মারা যাননি। তবু এর মধ্যেই স্বামী, ছেলে-মেয়ে, নাতি এবং নিজের ডাক্তারি কাজও ছেড়ে দিতে হবে। এবং তাঁরই কাজ, চিকিৎসা ব্যবস্থা, তাঁরই ওপর দিয়ে এবং ভেতর দিয়ে সোরগোল-ভরা ট্রেনের মত ছোটাছুটি করবে। একটি মাত্র দিনে সবকিছু

ছেড়ে গিয়ে দুর্ভোগের প্রস্তুতিতে এক ফিকে-সবুজ ছায়ায় রূপান্তরিত হতে হবে; দীর্ঘকালের মধ্যে জানতেও পারবেন না মৃত্যু অনিবার্য, না সুস্থ হওয়া সম্ভবপর।

ওঁর মাঝে মাঝে মনে হয়েছে জীবনে রঙ,রস আর উৎসবের একান্ত অভাব। কেবল কাজ আর দুশ্চিন্তা, আবার কাজ। তবু সেই জীবনই এখন কত চমৎকার মনে হয়! ঐ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে ভেবে এত অসহ্য লাগল যে সজোরে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হ'ল।

এই রোববারটা এর মধ্যেই অন্য রোববারের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। আগামী কাল ওঁর অন্ত্রের এক্স-রে'র প্রস্তুতিতে গোটা দিনটা কেটে গিয়েছে।

সোমবার সকাল সোয়া ন'টায় পূর্ব ব্যবস্থামত একজন শিক্ষার্থী ডাক্তার, ভেরা গ্যাঙ্গাট আর ডাঃ ওর্শচেংকভ্ এক্স-রে কামরার আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে নিজেদের চোখকে অভ্যস্ত করে তুলতে লাগলেন। ডন্টসোভা পোষাক খুলে পর্দার পেছনে গেলেন। এক পরিচারিকা এক গ্লাস তরল বেরিয়াম খেতে দিল। গ্লাসটা ধরতে গিয়ে কিছু বেরিয়াম গোলা চলকিয়ে পড়ল। এই ঘরেই ঐ হাতে রবারের দস্তানা পরে ডন্টসোভা কত রোগীর পেট টিপে টিপে দেখেছেন। আর আজ ঐ হাতই কেঁপে গেল।

ডাক্তাররা ডন্টসোভার বেলায় তাঁদের নিয়ম মাফিক প্রক্রিয়াদি অবলম্বন করলেন: দেহের বিভিন্ন জায়গা টিপে দেখলেন, উপুড় করে দেখলেন, দু'হাত উঁচু করে নিঃশ্বাস নিতে বললেন, শেষে টেবিলে শুইয়ে নানা কোণ থেকে ফটো নিলেন। তরল বেরিয়াম খাদ্য নালিতে এবং হজম প্রক্রিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে। তাই ডন্টসোভা কিছুক্ষণ ফটো তোলা থেকে অব্যাহতি পেলেন। এক্স-রে যন্ত্র তাই বলে অলস রইল না: শিক্ষানবিশ ডাক্তারটি ইতিমধ্যে নিয়মিত রোগীদের ছবি নিতে লাগলেন। ডন্টসোভা কয়েকবার উঠে বসে শিক্ষানবিশ ডাক্তারকে সাহায্য করতে চাইলেন। কিন্তু ওঁর মন বসল না। তাছাড়া ওঁকে দিয়ে তখন তেমন কোন কাজ করানো যেতও না। ওঁর আবার পর্দার পেছনে গিয়ে বেরিয়াম গোলা খেয়ে ফটো তোলানোর সময় এসে গেল।

এ পরীক্ষাটাও আর যে কোন ডাক্তারি পরীক্ষার মতই হ'ল। তফাৎ শুধু পরীক্ষার সময় যে চেনা, কেজো নীরবতা থাকে,—যা মাঝে মাঝে ডাক্তারদের হ্রস্ব নির্দেশেই শুধু ভঙ্গ হয়—তা ছিল না। ওর্শচেংকভ্ অল্প বয়সী সহকারীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছিলেন। ওদের নিয়ে, ডন্টসোভাকে নিয়ে, এমন কি নিজেকে নিয়েও ঠাট্টা করছিলেন। উনি বললেন, ছাত্রাবস্থায় ওঁকে একবার অসভ্য আচরণের জন্য মস্কো আর্টস থিয়েটার থেকে বের করে দিয়েছিল। তখন সবে ঐ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওখানে টলস্টয়ের নাটক 'আঁধারের শক্তি' [রুশ কৃষকের কাহিনী] নতুন মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকের এক পাত্র নাম আকিম, এত বাস্তব ভঙ্গীতে জোরে নাক ঝাড়ছিল আর পায়ের পটি খুলছিল যে ওর্শচেংকভ্ আর তাঁর বন্ধু শিস্ দিয়ে উঠেছিলেন।

তারপর থেকে যখনই উনি ঐ রঙ্গালয়ে গিয়েছেন সব সময় ভয় হয়েছে যে ওরা চিনতে পেরে আবার ওঁকে বের করে দেবে। নিঃশব্দ পরীক্ষার ফাঁকে কষ্টদায়ক যতি সহজতর করার জন্য ওঁরা সবাই যথাসম্ভব কথাবার্তা বলছিলেন। ডণ্ট্‌সোভার তবু বুঝতে অসুবিধে হ'ল না যে ভেরার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, কষ্ট করে কথা বলতে হচ্ছে। ভেরাকে উনি এত বেশী চেনেন যে ওঁর চোখ ভুল করে না।

যেভাবে পরীক্ষা সমাধা হ'ল তা ডণ্ট্‌সোভার পছন্দ। উনি তরল বেরিয়াম খেয়ে মুখ মুছে, বললেন, "রোগীর সব কথা জানা ঠিক নয়। চিরকালই আমার এই অভিমত, নিজের বেলাও তাই। আপনাদের আলোচনার সময় এলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাব।"

ডাক্তাররাও এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। প্রতিবার ওঁদের আলোচনার সময় এলে ডণ্ট্‌সোভা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক্স-রে পরীক্ষাগার সহায়কদের কিছু কাজ করে দিলেন নয় অন্য রোগীদের রোগের ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত কাজ সারলেন। অনেক কাজ বাকি আছে। কিন্তু মনে হ'ল উনি কোন কাজই সারতে পারবেন না। যতবার ডাক পড়ল, উনি দুরুদুরু বুকে ডাক্তারদের কাছে গেলেন; মনে আশা, ভেরা ওঁকে সুখবর শোনাবে, আনন্দে এবং স্বস্তিতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু সেসব হ'ল না। শুধু হ'ল ক্যামেরার নিচে আরো অনেক ভঙ্গীতে থাকা, আরো নির্দেশ পাওয়া, এবং আরো পরীক্ষা।

ডাক্তারদের প্রতিটি নতুন নির্দেশ মানার সঙ্গে সঙ্গে ডণ্ট্‌সোভা ওঁদের নির্দেশের কারণ সম্পর্কে না ভেবে পারলেন না। ওঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "আপনারা কি খুঁজছেন বুঝতে পেরেছি। আপনাদের কাজের পদ্ধতি থেকে অনুমান করেছি।"

ডণ্ট্‌সোভার ধারণা হ'ল ডাক্তাররা পাকস্থলী বা গ্রহণীর নয়, অন্ননালীর টিউমার আশঙ্কা করছেন। ওটা খুবই দুরূহ টিউমার, কারণ ঐ টিউমার অপারেশনের জন্য আংশিক ভাবে বুক কাটতে হয়।

"শোনো, লুডোচ্‌কা", ওর্শচেংকভ অন্ধকারের মধ্যে থেকে বললেন, "তুমি প্রথমে অবিলম্বে রোগ নির্ণয় চেয়েছিল। এখন বলছ, আমাদের পদ্ধতি তোমার অপছন্দ! তবে কি তুমি তিন-চার মাস দেরী করতে চাও? সেক্ষেত্রে তোমাকে পরীক্ষার ফলাফল এখনই জানতে পারি।"

"ধন্যবাদ, আমি তিন-চার মাস অপেক্ষা করতে চাই না।"

দিনের শেষে পরীক্ষাগার থেকে পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর বড় এক্স-রে ছবিটাও ডণ্ট্‌সোভা দেখতে চাইলেন না। নিজের নির্ণায়ক, পুরুষালি ভঙ্গী ত্যাগ করে উনি উজ্জ্বল আলোর নিচে একটা চেয়ারে কাদার তালের মত বসেছিলেন। ওর্শচেংকভের শেষ কথার অপেক্ষায়। শেষ কথা রোগ নির্ণয় সম্পর্কে নয়, ডণ্ট্‌সোভা সম্পর্কে।

"আমার সম্মানার্হ সহকর্মী, গুণীজনের মত-পার্থক্য দেখা

দিয়েছে," ত্যারছা ভুরুর নিচ থেকে ডণ্ট্সোভার দিকে চেয়ে ওর্শচেংকভ খোশ মেজাজে বললেন। ডণ্ট্সোভা যে কত ঘাবড়িয়ে গিয়েছেন তা উনি স্পষ্টই বুঝলেন। আশা করেছিলেন, সুদৃঢ় এবং অটল ডণ্ট্সোভা নিজের বেলায় এর চেয়ে বেশী শক্তির পরিচয় দেবেন! ওঁর এই হঠাৎ ভেঙে পড়ায় ওর্শচেংকভের ধারণা সুদৃঢ় হ'ল যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো আধুনিক মানব একেবারে অসহায়, মৃত্যুর মোকাবিলা করার উপযুক্ত অস্ত্র তার নেই।

"আপনাদের মধ্যে কার ধারণা আমার রোগের পরিস্থিতি সুবিধার নয়? কষ্টে হেসে ডণ্ট্সোভা বললেন। (ওর্শচেংকভের ঐ ধারণা না হলে বাঁচি)

ওর্শচেংকভ্ এক হাতের আঙুলগুলো প্রসারিত করলেন। "তোমার 'মেয়ে' দু'টি আমার সঙ্গে ভিন্ন মত,' উনি বললেন, "দ্যাখো ত' তুমি ওদের কেমন মানুষ করেছ। আমি বরং ওদের চেয়ে মতামতের ব্যাপারে অনেক দরাজ।" ওঁর ঠোঁট দুটো অনাবিল রঙ্গে ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল। ভেরার মুখ অশরিরীর মত ফ্যাকাশে। যেন ডণ্ট্সোভার নয়, ওরই ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়ে গিয়েছে।

"তাই নাকি? আপনাকে ধন্যবাদ।" ডণ্ট্সোভা একটু স্বস্তি বোধ করলেন। "এবার কি করণীয়?"

এক্স-রে ফটো নেওয়ার পরবর্তী একই ধরনের যন্ত্রের পর ডণ্ট্সোভার সামনে বসে থাকা কত রোগীই যে তাঁর সিদ্ধান্ত জানতে ঐ প্রশ্ন করেছে তার হিসেব আছে? সিদ্ধান্ত হত অবধারিত ভাবে বিজ্ঞান এবং পরিসংখ্যান নির্ভর, এবং যুক্তি দ্বারা পরীক্ষিত। সিদ্ধান্তের জন্য প্রতীক্ষার এই মুহূর্তগুলো কি যে এক ভীতিজনক পিপে!

"দ্যাখো লুডোচ্কা" ওর্শচেংকভ্ মোলায়েম স্বরে বললেন, "আমরা এক বিবেকহীন জগতের বাসিন্দা, তা ত' জানো। তুমি যদি আমাদেরই একজন না হতে তাহলে তোমাকে সরাসরি সার্জনের হাতে তুলে দিতাম। তার সঙ্গে দিতাম রোগ নির্ণয়ের বিকল্প বিধান। সার্জন হয়ত শরীরের কোন অংশ বেশী করে কেটে একটা টুকরো তুলে নিত। ওরা কি যে হতচ্ছাড়া জীব তা ত' জানোই। কারো তলপেট চিরলে তার কোন একটা স্মারক না নিয়ে ছাড়ে না। ওরা তোমার অপারেশনের পরই বোঝা যাবে আমাদের মধ্যে কে সঠিক রোগ নির্ণয় করেছে। কিন্তু, আর যাহোক তুমি আমাদেরই একজন। মস্কোর রশ্মি-চিকিৎসা বিদ্যালয়ে আমাদেরই বন্ধু লেনোচ্কা আর সেরিওজা কাজ করে। তাই সিদ্ধান্ত করেছি, তুমি মস্কো যাবে। বুঝেছ? তোমার সম্পর্কে আমরা যে রিপোর্ট দেব ওরা তা ত' দেখবেই, তাছাড়া ওরা স্বতন্ত্র ভাবেও পরীক্ষা করবে। ফলে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরো কিছু বিকল্প মত পাওয়া যাবে। আর, অপারেশন যদি অনিবার্য হয় তাহলে ওখানে যাওয়া আরো ভাল। সতি বলতে কি সব চিকিৎসাই ওখানে আরো ভাল ভাবে হতে পারবে, তাই নয়?"

(ওর্শচেংকভ্ যে বললেন 'অপারেশন যদি অনিবার্য হয়,' তার মানে কি

অপারেশন প্রয়োজন নাও হতে পারে ? না স্রেফ আমার মন রাখতে ঐ কথা বললেন··)

"আপনি কি বলতে চান যে," ডণ্ট্সোভা সাহস করে বললেন "অপারেশনটা এত জটিল যে আপনারা এখানে করতে ভরসা পাচ্ছেন না ?"

"না, অবশ্যই তা নয়", ওর্শচেঙ্কভ্ ভ্রূকুটি করে একটু গলা চড়ালেন, "আমার কথার পেছনে লুকানো মানে খুঁজো না। আমরা শুধু তোমার জন্য আরেকটু···কথাটা কি যেন ?···একটু বাড়তি যোগাযোগের ব্যবস্থা করছি। যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না হয়," ওর্শচেঙ্কভ্ টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলেন, "ঐ এক্স-রে ছবিটা দেখে নাও না।"

অতি সহজ ব্যাপার, তাই নয়? হাত বাড়িয়ে ছবিটা টেনে নিয়ে ডণ্ট্সোভা নিজেই ত' বিশ্লেষণ করলে পারেন।

"না, না," এক্স-রে ছবি আর নিজের মধ্যে কল্পিত ব্যবধান রচনা করে ডণ্ট্সোভা বললেন, "আমি দেখতে চাই না।"

সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। ওঁরা প্রবীণ ডাক্তার নিজামুদ্দিনের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ডণ্ট্সোভা রুশ সাধারণতন্ত্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রকে দেখা করলেন। অদ্ভুত ব্যাপার ওখানে একটুও দেরী হ'ল না। ওরা ডণ্ট্সোভাকে রেলের পাশ আর মস্কোর চিকিৎসালয়ে ভর্তির চিঠি লিখে দিল। হঠাৎ মনে হ'ল যে শহরে উনি গত কুড়িটি বছর কাজ করেছেন সেখানে ও'কে রেখে দেওয়ার কোন যুক্তিই নেই।

ডণ্ট্সোভা যখন ব্যথার কথা সবার কাছে গোপন রাখতেন উনি তখনই জানতেন উনি কি করছেন। একটি মাত্র মানুষকে জানানো দরকার ছিল। ফলে তুষার-ঝড় অনিবার্য ভাবে শুরু হয়ে গেল। তারপর থেকে কিছুই আর ওঁর ওপর নির্ভরশীল নয়।

জীবনের যে বন্ধনগুলো অত মজবুত আর স্থায়ী মনে হত সেগুলোই ঢিলে হয়ে, ভেঙে যাচ্ছিল। কয়েক দিনে নয়, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে।

যে ডণ্ট্সোভা হাসপাতালে আর নিজের বাড়ীতে ছিলেন অদ্বিতীয়া এবং যাঁকে বদল করা ছিল অচিন্তনীয়, আজ তাঁরই বদলে অন্য ব্যক্তি কাজ করবে।

আমরা এই পৃথিবীর অত আসক্ত হয়েও তাকে শক্ত করে ধরবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

আর দেরী করা অর্থহীন। ঐ সপ্তাহেরই বুধবার উনি ভেরার সঙ্গে শেষ রাউণ্ডে গেলেন। রশ্মি-চিকিৎসা বিভাগের ভার ভেরাকে বুঝিয়ে দিলেন।

সকালে রাউণ্ড শুরু হয়ে দুপুরে খাওয়ার সময় অব্দি চলল। ডণ্ট্সোভা ভেরার ওপর ভরসা করেন। ভেরা রোগীদের রোগ সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। ডণ্ট্সোভা জানেন এটাই ওঁর শেষ রাউণ্ড। উনি অন্ততঃ এক মাসের আগে ফিরছেন না, তাও যদি আদৌ ফিরতে পারেন। তবু রোগীদের বেডের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওঁর নিজেকে একটু হাল্কা আর

মজবুত লাগল। কাজে আগ্রহ আর যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ফিরে এসেছিল। উনি স্থির করেছিলেন সকালে নিজের কাজ-কর্ম গোছাবেন আর বাকি কাগজ-পত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সই সেরে, বাড়ী ফিরে মস্কো যাত্রার জন্য তৈরি হবেন। কিন্তু সব পরিকল্পনা ওলট-পালট হয়ে গেল। আসলে উনি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিতে এত অভ্যস্ত যে আজও অন্ততঃ এক মাসের মানসিক ভবিষ্যদ্বাণী না করে কোন রোগী দেখা সারতে পারলেন না। রোগের গতি কি হতে পারে তা অনুমান করলেন ; কি ওষুধ দরকার হবে, এবং কি আপৎকালীন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার হতে পারে জানালেন। অবিকল অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ওয়ার্ডগুলোয় হাঁটাহাঁটি করলেন। গত ক'দিনের ছোটাছুটি আর মন-খারাপের পর এই প্রথম কয়েক ঘণ্টা স্বস্তি পেলেন।

উনি নিজের দুর্ভাগ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলেন।

তবু ওয়ার্ডগুলোয় রাউণ্ড দিতে গিয়ে মনে হ'ল উনি চিকিৎসকের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, যেন কোন অমার্জনীয় কাজের ফলে উনি ডাক্তারি করার অধিকার খুইয়েছেন, সৌভাগ্যক্রমে তা রোগীদের জানানো হয়নি। নকল সাধুর মত উনি অনেকক্ষণ ধরে রোগীদের দেখলেন, ওষুধ লিখে দিলেন আর নির্দেশাদি দিলেন। কিন্তু সারাক্ষণই নিজেকে মনে হচ্ছিল এক অনধিকার চাকারী ভণ্ড তপস্বী। শিরদাঁড়া জুড়ে কি যেন এক শীতল অনুভূতি। ও'র আর অপরের জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে রায় ঘোষণার অধিকার নেই। ক'দিন পরে ও' উনি নিজে এক বেডে শুয়ে থাকবেন, ওদেরই মত বোবা আর অসহায়, নিজের চেহারার প্রতি উদাসীন, বরিষ্ঠ চিকিৎসকদের রায়ের প্রতীক্ষমানা, ব্যথায় ভীত, হয়ত ঐ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দরুন পরিতাপে জর্জর। হয়ত অন্য রোগীদের মত উনিও সন্দেহ করবেন সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে না, আর হাসপাতাল থেকে নাম কাটিয়ে নিয়ে সন্ধে বেলায় নিজের বাড়ী ফেরার জিদ করবেন, যেন ঐটাই জগতের সেরা আনন্দ।

এই সব চিন্তা-ভাবনায় ডণ্ট্সোভার অটল মনও দুর্বল হয়ে পড়ল।

অপর দিকে ভেরা এক আনন্দহীন বোঝা ঘাড়ে তুলছিল, যার জন্য ও এই মূল্য চোকাতে অনিচ্ছুক। সত্যি বলতে কি ভেরা আদৌ ঐ দায়িত্ব নিতে চায় না।

ওরা ডণ্ট্সোভাকে 'মা' বলে ডাকে। ভেরার কাছে ঐ ডাক একটা শব্দ মাত্র নয়। তিনজন ডাক্তারের মধ্যে ডণ্ট্সোভার রোগ সম্পর্কে ভেরাই সবচেয়ে আশাহীনতা ব্যক্ত করেছে। ওর ধারণা ডণ্ট্সোভার খুব দুর্বলকারক অপারেশন প্রয়োজন হবে, যার ফলে উনি বাঁচতে নাও পারেন। কারণ উনি এমনিতে লাগাতার রশ্মি-বিকিরণ জনিত রোগে ভোগেন। ডণ্ট্সোভার পাশে পাশে ওয়ার্ডে রাউণ্ড দিতে দিতে ভেরার মনে হ'ল এটাই হয়ত ও'র শেষ রাউণ্ড, তারপর থেকে ভেরার আরো অনেক বছর এই মহিলার বেদনা ভরা স্মৃতি নিয়ে বেডগুলোর পাশ দিয়ে যাতায়াত

করতে হবে। মনে পড়বে এই মহিলাই ওকে ডাক্তার করেছিলেন। সবার অলক্ষিতে ভেরা একটা আঙুল তুলে অশ্রু মুছল।

আজই ভেরার রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার বিধান এত নিখুঁত হতে হবে যা অতীতে প্রয়োজন ছিল না। এর পর থেকে পঞ্চাশটি রোগী পুরোপুরি ওর দায়িত্বে থাকবে। ও এমন কাউকে পাবে না যার থেকে পরামর্শ পাওয়া চলে।

উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত দুই ডাক্তার দিনের প্রথমার্দ্ধের রাউণ্ডে বেরোলেন। প্রথমে মেয়েদের ওয়ার্ডে গেলেন। তারপর যে রোগীরা সিঁড়ির বাঁকে কিংবা বারান্দায় আছে তাদের পালা। স্বাভাবিক ভাবেই বেশী সময় নিয়ে সিবগাটভ্‌কে দেখতে হ'ল।

ডাক্তাররা এই শান্ত তাতার ছেলেটিকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছেন। সফল হয়েছেন মৃত্যুকে কয়েক মাস ঠেকিয়ে রাখতে। কি কষ্টকর মাস ক'টা! আলো-বাতাসহীন সিঁড়ির কোণে দুঃখময় প্রাণ ধারণ। নিতম্বের ত্রিকাস্থি ওর দেহের ভার রাখতে অক্ষম। দু'টি সবল হাতে পাছা না ধরে দাঁড়াতে পারে না। ওর ব্যায়াম বলতে আছে পাশের ওয়ার্ডে হেঁটে যাওয় আর সেখানে বসে রোগীদের কথোপকথন শোনা। ও বেড থেকে দূরে অবস্থিত একটা মাত্র জানলা থেকে সামান্য বাতাস পায়। ওর আকাশ বলতে আছে মাথার ওপর চাল।

ওর যে দুঃখময় হাসপাতালের জীবনে লাগতার ওষুধ আর চিকিৎসা, পরিচারিকাদের ঝগড়া, হাসপাতালের খাদ্য, তাস খেলা আর নিতম্বে হাঁ হয়ে থাকা ঘা ছাড়া কিছু নেই, তাতেও ডাক্তাররা রাউণ্ড দিতে এলে ওর ব্যথায় কাতর চোখ দুটো কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়।

সিবগাটভ্‌কে দেখে ডণ্টসোভার মনে হ'ল উনি যদি নিজের মাপকাঠি ত্যাগ করে ওর মাপকাঠি গ্রহণ করতে পারেন, তাতে স্বস্তি পাবেন।

সিবগাটভ্‌ কোন সূত্রে শুনেছিল যে আজই ডণ্টসোভার রাউণ্ডের শেষ দিন। দুজনে দুজ'নকে নীরবে দেখল। দুই পরাস্ত কিন্তু মিত্রতায় অটল মানুষ; দু'জনই জানে যে বিজেতার কশাঘাত শীঘ্রই দু'জনকে বিশ্বের দুই প্রান্তে তাড়িত করবে।

"শোনো, শারফ্‌," ডণ্টসোভার চোখ দু'টো বলতে চাইল, "যা কিছু পারতাম তার সবই তোমার জন্য করেছি। এখন আমি নিজেই ঘায়েল হয়েছি। শীঘ্রই পড়ে যাব।"

"আমি জানি, মা," সিব গাটভের চোখ জবাব দিল, "আমার জন্মদাতৃও আমার জন্য এত করেনি। দুঃখ লাগছে তোমাকে বাঁচানোর জন্য আমি যে কিছুই করতে পারব না।"

আহমদজানের ক্ষেত্রে ডাক্তাররা চমৎকার সফল হয়েছিলেন। ওর বেলায় কোথাও কোন অবহেলা হয়নি। ডাক্তাররা তাঁদের পুঁথি অনুযায়ী কাজ

করতে পেরেছিলেন, এবং সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছিল। ভেরা আর ডন্ট্‌সোভা হিসেব করলেন ওকে কতখানি রশ্মি বিকিরণ দেওয়া হয়েছে, তারপর ডন্ট্‌সোভা বললেন, "আমরা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।"

ওকে আরো সকালে ঐ খবর জানানো উচিত ছিল। ও তাহলে নার্স কে বলে হাসপাতালের পোষাক ফেরৎ দিয়ে নিজের পোষাক ছাড়িয়ে নিতে পারত। ওর আর তর সয় না। ও ক্রাচ্‌ না নিয়েই নার্স মিটাকে জানাতে চলল। একটা বাড়তি রাতও হাসপাতালে কাটানো ওর কাছে অসহ্য। ওর বন্ধুরা ঐ সন্ধ্যেতেই পুরনো শহরে ওর জন্য অপেক্ষা করবে।

ভাদিমও শুনেছিল ডন্ট্‌সোভা তাঁর বিভাগের ভার অন্যের হাত তুলে দিয়ে মস্কো চলেছেন। গত সন্ধ্যেয় ও মায়ের থেকে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছিল। ডন্ট্‌সোভা আর ওর নামে পাঠানো টেলিগ্রামটায় জানানো হয়েছে যে তেজস্ক্রিয় সোনা হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। ভাদিম তক্ষুণি টলমল করতে করতে নিচতলায় চলল। ডন্ট্‌সোভা স্বাস্থ্য মন্ত্রকে দেখা করতে গিয়েছিলেন কিন্তু ভেরা ইতিমধ্যে টেলিগ্রাম দেখেছিল। ভেরা ওকে উৎসাহিত করল আর ওদের রশ্মি চিকিৎসক এলা র‍্যাফাইলোভ্‌না'র সঙ্গে আলাপ করাল। ঐ সোনা হাসপাতালে পৌঁছনো মাত্র এলা চিকিৎসা শুরু করবে। এমন সময় ডন্ট্‌সোভা ফিরে এলেন। টেলিগ্রাম পড়লেন। ওঁকে বিধ্বস্ত এবং পরাজিত দেখাচ্ছিল। তবু ভাদিমকে যথাসাধ্য উৎসাহিত করলেন।

টেলিগ্রাম পেয়ে ভাদিম এত আনন্দিত হয়েছিল যে রাতে ঘুমোতে পারে না। কিন্তু সকাল নাগাদ অন্য ভাবনা দেখা দিল। সোনা কখন এখানে পৌঁছবে? ওরা যদি মায়ের হাতে সোনা তুলে দিয়ে থাকে তবে তা সকালেই এখানে পৌঁছনোর কথা। তিন দিন লেগে যাবে? না, এক সপ্তাহ? সকালে ডাক্তাররা ওকে দেখতে আসা মাত্র ও ঐ প্রশ্ন করল। ডন্ট্‌সোভা বললেন, "সামান্য ক'দিন লাগবে, স্রেফ কয়েক দিন।" কিন্তু ঐ সামান্য ক'দিন আসলে কি, উনি তা ভালই জানেন। ওঁর মনে পড়ল, অনুরূপ একটা রোগে মস্কোর কোন চিকিৎসা গবেষণাগার রিয়াজান শহরের এক হাসপাতালে কোন একটা ওষুধ তৈরি করে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু অফিসের যুবতী কেরাণী চিঠিতে রিয়াজান-এর পরিবর্তে কাজাকস্তানের রাজধানী আলমা আটা লিখেছিল বলে ওষুধটা ভুল ঠিকানায় পৌঁছল।

সুখবর মানুষের অনেক কিছু করতে পারে। ভাদিমের গাঢ় কালো চোখ দুটো যা ইদানিং বিষণ্ণ থাকত, এখন আশায় চক্‌চক্‌ করছিল। যে ঠোঁট দুটো ফাটা ফাটা হয়ে ঝুলে পড়েছিল এখন তা মসৃণ আর নতুন লাগছিল। ভাদিম দাড়ি কামিয়ে ছিমছাম, সংযত আর ভব্য হয়েছে। যেন জন্মদিন উপলক্ষে চোখ মেলে দেখছে চার পাশে উপহার সাজানো আছে।

ও কি আর মনমরা থাকতে পারে? ও গত দু'সপ্তাহে কি করে এত মনোবল হারিয়েছিল ভেবে অবাক লাগে। মনোবলই ওর মুক্তির উপায়, ওর

সবকিছু। দৌড়টা এবারই শুরু হবে। এখন রোগের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপসর্গগুলি আর তিরিশ সেণ্টিমিটার এগোনোর আগে তেজস্ক্রিয় সোনা তিনহাজার কিলোমিটার দূরত্ব পেরিয়ে এখানে আসা প্রয়োজন। সোনা ওর নিতম্বের রোগ দূর ত' করবেই, দেহের বাকি অংশও সুরক্ষা করবে। একটা পা, অবশ্য, বাদ দিতেই হবে। কে জানে, সোনা হয়ত পায়ের রোগও সারিয়ে দিতে পারে (যেহেতু দেখা গিয়েছে বিজ্ঞান বিশ্বাসকে পুরোপুরি উৎপাটিত করতে অক্ষম)

আর যাহোক, ওই যে বেঁচে থাকবে এটা যেমন যুক্তিসঙ্গত তেমনি ন্যায্য। মৃত্যুকে মেনে নেওয়া, মৃত্যুরূপী কালো বাঘটা ওকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে একথা মেনে নেওয়াই এক চরম আহাম্মকি আর দুর্বলতা। ওর অযোগ্যও বটে। ওর বিশ্বাস উত্তরোত্তর দৃঢ় হচ্ছিল যে, আর যাই হোক না কেন, শুধু উজ্জ্বল প্রতিভার দরুনই ও বেঁচে থাকবে। অর্ধেক রাত উদ্বেলিত আনন্দ ওকে ঘুমোতে দিল না। যে সীসা নির্মিত পাত্রে সোনা আসবে তা মানশ্চক্ষে ভেসে উঠল। সোনাটা কি বিমান যাত্রীদের মালপত্র বইবার গাড়ীতে রেখেছে? না, বিমান এখনো বিমান বন্দরে পেঁছিয়নি? ও তিন হাজার কিলোমিটার ব্যাপী নৈশ দূরত্বে চোখ মেলল। সোনার গতি ত্বরিত করার প্রয়াস। দেবদূতদের অস্তিত্ব থাকলেও তাদেরও সহায়তা প্রার্থনা করত।

কিন্তু রাউণ্ডের সময় ডাক্তাররা কি করেন ও সেদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখল। ডাক্তাররা কিছুই খারাপ বললেন না। ওঁদের মুখভাবে তেমন কিছু ফুটল না। ওঁরা বরং ওকে উৎসাহিত করলেন। কিন্তু ওঁরা ওর দেহের নানা জায়গা টিপে টিপে দেখলেন। ওঁদের মধ্যে দু-একটা সাধারণ মন্তব্য বিনিময়ও ঘটল। ভাদিম অনুমান করার চেষ্টা করল ডাক্তাররা ওর অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে বেশী যকৃত নিয়ে খোঁচাখুঁচি করছে কিনা।

(ডাক্তাররা লক্ষ্য করেছিলেন এই রোগীটির স্নায়ুগুলি কত টানটান আর ও কত সজাগ। ওঁরা তাই অকারণে ওর প্লীহার ওপর হাত দিয়ে দেখতেন। আসল উদ্দেশ্য ছিল যকৃতের কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা লক্ষ্য করা)

ডাক্তাররা যে পাভেলকে এড়িয়ে যাবেন সে উপায় নেই। ডাক্তারদের নজরের বেলাও ওর পাওনা 'অফিসারদের বিশেষ র‍্যাশন'। ও ইদানিং ডাক্তারদের পছন্দ করছে। ডাক্তাররা 'সম্মানিত বিজ্ঞানী' বা বিজ্ঞানের অধ্যাপক না হোন, ওঁরা ওকে সারিয়ে তুলেছেন ত'। ওর টিউমার এখন ছোট হয়ে, আলগা ভাবে ঝোলে। যত ভয়াবহ ভাবা হয়েছিল গোড়াতেই তা হয়ত ছিল না।

"কমরেডগণ, আপনারা সত্যিই অনেক কিছু জানেন," পাভেল ডাক্তারদের বলল, "আপনাদের জন্যই ভাল হতে চলেছি। কিন্তু আমি ইন্‌জেকশন নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কুড়িটার বেশী ইন্‌জেকশন নিয়েছি, তা যথেষ্ট

নয় ? বাকি চিকিৎসা কি আমার বাড়ীতেই করা সম্ভব নয় ?"

যদিও পাভেলকে চারবার রক্ত দেওয়া হয়েছে, তবু ওর রক্তের অবস্থা ভাল নয়। ওকে চুপসানো, ফ্যাকাশে আর কোঁকড়ানো দেখায়। কাপড়ের তৈরি মাথার টুপিটাও মাপে বড় লাগে।

"আমার আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আমি গোড়ায় ভুল করেছি", পাভেল অকপট ভাবে ডণ্ট্সোভাকে বলল, "আপনি আমাকে ভাল করেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।"

ডণ্ট্সোভা অভ্যাস বসে মাথা হেলালেন। উনি পাভলের বক্তব্যের মানে বুঝতে পারছিলেন না। ডণ্ট্সোভার ধারণা ওর আরো কয়েকটা লালাগ্রন্থিতে টিউমার হওয়ার আশঙ্কা আছে। পাভেল এ বছরটা টিকবে কিনা তা রোগ বিস্তারের গতির ওপর নির্ভরশীল।

বস্তুতঃ পাভেল আর ডণ্ট্সোভার রোগের পরিস্থিতি অভিন্ন।

ভেরা আর ডণ্ট্সোভা এত জোরে জোরে পাভেলের দু'বগল আর দুই অক্ষকাস্থির কাছাকাছি টিপে টিপে দেখলেন যে ও ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল।

"ওসব জায়গায় সত্যিই কিছু নেই," পাভেল ডাক্তারদের আশ্বস্ত করল। ও স্পষ্ট বুঝেছে যে ডাক্তাররা ওকে রোগের ভয় দেখাতে চান। কিন্তু ও এ পর্যন্ত ঘাবড়ায়নি। অনায়াসে সব অসুবিধে পেরিয়েছে। ও নবলব্ধ আত্মবিশ্বাসের জন্য গর্বিত।

"এ পর্যন্ত ভালই দেখছি, কিন্তু আপনি খুব সাবধান হবেন, কমরেড রুসানভ," ডণ্ট্সোভা বললেন, "আরো দু'-একটা ইনজেকশন দেওয়ার পর হয়ত আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আপনি মাসে একবার করে আমাদের দেখিয়ে যাবেন। কোন কিছু বেগতিক দেখলেই এখানে চলে আসবেন।"

কিন্তু খুশিতে ডগমগ পাভেল অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে যে স্রেফ এদের কেতাবী হিসেব ঠিক রাখার স্বার্থে ওসব বাধ্যতামূলক নিয়মিত হাসপাতালে দেখিয়ে যাওয়া-টাওয়া। ওরা তাতে খাতার উপযুক্ত ঘরে উপযুক্ত মন্তব্য লিখতে পারবে। ও নিজের পরিবারকে টেলিফোনে সুখবর জানাতে চলল।

এবার ওলেগের পালা। ও মিশ্র মনোভাব নিয়ে ডাক্তারদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এক অর্থে ডাক্তাররা ওকে বাঁচিয়েছেন, আরেক অর্থে ধ্বংস করেছেন। ও'রা যেন সমপরিমাণ তেল আর জল পরিবেশন করেছেন, যা যেমন পান করার অনুপযুক্ত তেমনি চাকাকে চলমান রাখতে অক্ষম।

ভেরা একা ওকে দেখতে এলে ভেগা হয়ে যায়। কর্তব্যের খাতিরে ভেরা ওকে যাকিছু বলে কিংবা যে ওষুধ বিধান দেয় ও তাতে রাগ করে না। ভেরাকে দেখে ওর ভাল লাগে। ওর শারীরিক ক্ষতি সাধনে ভেরার যে ভূমিকা ছিল গত সপ্তাহ থেকে ওলেগ্ তাও মাফ করে দিয়েছে। ও মেনে নিয়েছে যে ওর দেহের ওপর ভেরার এক ধরনের অধিকার আছে। ওলেগ্ তাতে এক ছোটখাটো, অস্পষ্ট তৃপ্তি পেয়েছে। ভেরা এলেই ওর ভেরার হাতে হাত

বোলাতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু এখন ভেরার সঙ্গে ডণ্ট্সোভাও এলেন। নিয়মে বাঁধা দুই ডাক্তার। ওলেগের আহত বোধ ফিরে এল।

ডণ্ট্সোভা ওর বেডে বসে বললেন, "কেমন আছেন?" ডণ্টসোভার পেছনে দাঁড়ানো ভেরা ঈষৎ হাসল। স্বভাব বশেই হোক আর প্রয়োজন বোধেই হোক ভেরা ওলেগের সঙ্গে দেখা হলে হাসার অভ্যাস নতুন করে শুরু করেছিল। বেশী না হোক, একটু মুচকি হাসত। কিন্তু আজ সকালের হাসিটা কেমন যেন প্রচ্ছন্ন।

"বিশেষ ভাল নেই", বেডের বাইরে ঝুলন্ত মাথাটা বালিশে রেখে ওলেগ্ ক্লান্ত জবাব দিল। "চলাফেরা করতে হলে বুকে কেমন একটা চাপ বোধ হয়। মোটামুটি বলতে পারি ডাক্তারির ঠেলায় আমি মরতে বসেছি। আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন।"

ওলেগের দাবীর সঙ্গে ক্রোধ মিশে নেই। বরং আছে নিরাসক্তি। যেন সমস্যাটা আদৌ ওর নয় এবং সমাধানও এত স্পষ্ট যে তা উচ্চারণ নিষ্প্রয়োজন।

ডণ্ট্সোভাও ডাক্তার হিসেবে তাঁর পরামর্শ আরেকবার জানানো প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাছাড়া উনি এমনিতেই যথেষ্ট ক্লান্ত। "সে সিদ্ধান্তের জন্য আপনিই দায়ী হবেন। যা ভাল বোঝেন তাই করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার চিকিৎসা শেষ হয়নি।"

ডণ্ট্সোভা ওর দেহের বিকিরণপ্রাপ্ত অংশের চামড়া দেখলেন। চামড়া যেন চিৎকার করে বলছে, চিকিৎসা থামাও। প্রয়োজনীয় সবকটা বিকিরণ বৈঠকের পর চামড়ার বিক্রিয়া আরো বাড়তে পারে।

"একে কি এখনো দিনে দু'বার করে বিকিরণ দেওয়া হচ্ছে?" ডণ্ট্সোভা বললেন। "না, এখন একটা করে দেওয়া হয়", ভেরা জবাব দিল।

('এখন একটা করে দেওয়া হয়', এই মামুলি কথা কটা ভেরা ওর সরু গলা সামনে বাড়িয়ে এমন করে বলল, যেন ওগুলো কারো হৃদয় স্পর্শ করার মত নরম কথা)

মেয়েদের মাথার নরম, লম্বা চুলের মত কয়েকটা সজীব সুতো ভেরাকে ওলেগের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। ঐ সুতোয় টান পড়লে, ছিঁড়ে গেলে ভেরাই ব্যথিত হয়, ওলেগ্ নয়। অথচ কি হচ্ছে তা আর কেউ টের পায় না। যেদিন ভেরা জোয়ার সঙ্গে ওলেগের নৈশ অভিসারের কথা শোনে, মনে হয়েছিল ওর মাথার এক গোছা চুল ছিঁড়ে গিয়েছে। হয়ত দু'জনের সম্পর্ক ঐখানেই ইতি করা ভাল। সুতো ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনায় ভেরার একটা জাগতিক নিয়মের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল: পুরুষ সমবয়সী স্ত্রীলোক চায় না, কম বয়সী চায়। ও কিছুতেই ভুলতে পারছিল না যে, ওর সময় পেরিয়ে গিয়েছে। একেবারে পেরিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তারপর থেকে ওলেগই নির্লজ্জভাবে ওর সঙ্গে বারান্দায় দেখা করত, ওর একটা কথা শোনার জন্য হা-পিত্যেস করে থাকত, এমন মুগ্ধ-দৃষ্টিতে ওকে দেখত যে চুলের জট আপনা থেকে খুলে নতুন করে দু'জনকে বেঁধে দিল।

ঐ সুতোগুলো আসলে কি? তা ব্যাখ্যার অতীত, ব্যাখ্যা করতে চাওয়াও অসুবিধাজনক। ওলেগের এখান থেকে দূরে কোথাও সরে যেতে হবে। ও সেখানেই থেকে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ও হাসপাতালে ফিরবে কেবল যদি মৃত্যু ওকে ঠেসে ধরে। স্বাস্থ্য ফিরে পেলে ফিরবে না। সম্ভবতঃ কখনই ফিরবে না।

"একে এ পর্যন্ত সিনেস্ট্রল দেওয়া হয়েছে?" ডণ্টসোভা প্রশ্ন করলেন।

"যথেষ্টর চেয়ে অনেক বেশী" ভেরা জবাব দেওয়ার আগেই ওলেগ্ বলল। ও বেজার ভাবে ওদের দিকে চেয়ে বলল, "যা দেওয়া হয়েছে তা কোন মানুষের সারা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট।"

অন্য সময় ডণ্টসোভা ওলেগের অত রূঢ় জবাব হজম ত' করতেনই না, বরং দু'কথা শুনিয়ে দিতেন। কিন্তু ঠিক তখন ওঁর মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা এমন যে কোন মতে রাউণ্ড শেষ করতে পারলে বাঁচেন। যে কর্তব্যভার থেকে উনি বিদায় নিতে উদ্যত তার বাইরে কিন্তু ওঁর ওলেগের বক্তব্যে আপত্তি করার ছিল না। বেচারীর সত্যিই এক বর্বর চিকিৎসা সইতে হচ্ছিল।

"আমি আপনাকে ক'টা কথা বলতে চাই", উনি নরমভাবে বললেন, যাতে শুধু ওলেগই শুনতে পায়, "আপনি পারিবারিক সুখ ভোগের আশা করবেন না। বেশ কিছু বছর কাটার আগে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনের কথা ভাবা ঠিক হবে না", ভেরা এই জায়গায় চোখ নিচু করল, "……কারণ, মনে রাখবেন, আপনার চিকিৎসা অত্যন্ত অবহেলিত হয়েছে। আপনি অত্যন্ত দেরীতে এখানে এসেছেন।"

পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আশাহীনতার কথা ওলেগ্ আগেই জানত, সোজাসুজি ডণ্টসোভার মুখ থেকে শুনে অত্যন্ত অবাক হ'ল। ও বিড়বিড় করল, "হ্যাঁ, তা বটে"। তারপর একটা লাগসই জবাব মনে পড়ল, "পারিবারিক জীবন যাতে বরাতে না জোটে, প্রশাসন কর্তৃপক্ষই এমনিতে সেদিকে নজর রাখবে।"

"ভেরা, একে 'পেণ্টাক্সিল' আর 'টেজন' দিতে থাকো। কিন্তু একে কিছু বিরতিও দিতে হবে। শুনুন, কস্টোগলোটভ্, আপনাকে তিন মাসের জন্য 'সিনেস্ট্রল' প্রেসক্রাইব করে দিচ্ছি। ওষুধের দোকানে পাবেন। আপনি যেখানে ফিরে যাবেন সেখানে ইন্‌জেকশন নেওয়ার অসুবিধে থাকলে ট্যাবলেট আকারে সিনেস্ট্রল কিনে নেবেন! বাড়ীতে ওষুধটা খেতে কিংবা ইন্‌জেকশন নিতে ভুল হয় না যেন।"

ওলেগ্ বলতে চাইল প্রথমতঃ ও যেখানে ফিরে যাবে সেটা ওর বাড়ী নয়, নির্বাসনের জায়গা; দ্বিতীয়তঃ ওর ওষুধ কেনার মত অর্থ নেই; এবং তৃতীয়তঃ ও আত্মহত্যা করতে চাওয়ার মত আহাম্মক নয়। কিন্তু ডণ্ট্‌সোভার মুখে এক ধূসর-সবুজ, শ্রান্ত ভাব দেখে, ও বলতে পারল না।

রাউণ্ড শেষ হয়ে গেল।

আহমদজান ঝড়ের মত ওয়ার্ডে ফিরে এল। সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে, এমনকি ও নিজের পোষাকও ফিরে পেয়েছে। ও ঐ সন্ধ্যাতেই বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ফুর্তিতে পান করবে! ও নিজের কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে আগামীকাল ফিরে আসবে। আনন্দে পাগলের মত উত্তেজিত আহম্মদজান এত দ্রুত আর জোরে কথা বলছিল, যেমন ওকে এর আগে কখনো দেখা যায়নি। ওর ভাবভঙ্গীও এত সুস্থ-সবল আর নির্ণায়ক ধরনের যেন ও কখনই অসুস্থ হয়ে অপর রোগীদের সঙ্গে দু'মাস হাসপাতালে কাটায়নি। ওর কালো, ঘন আর কদম ছাঁট চুলের নিচে গাঢ় কালো ভুরু জোড়া। ভুরুর নিচে ওর চোখ দুটো মাতালের চোখের মত জ্বলছিল। চোখে নতুন জীবনের নেশা। হাসপাতালের ওপারেই সে জীবন। ও নিজের জিনিষপত্র গোছগাছ করতে চলছিল, কিন্তু স্থির করল, তা করবে না। ও তার বদলে অনুমতি চাইতে চলল। তেতলার রোগীদের সঙ্গে দুপুরের খাওয়া খেতে হলে বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন।

ডাক পেয়ে ওলেগ্ রশ্মি-বিকিরণ নেওয়ার জন্য এল। একটু পরেই ওর এক্স-রে যন্ত্রের নিচে শুয়ে পড়ার ডাক এল। ও তারপর বারান্দায় চলল — দিনটা এত গোমড়ামুখো লাগছে কেন, জানতে হবে।

গোটা আকাশ জুড়ে দ্রুত সঞ্চরমান ধূসর মেঘ ফুটছে। তাদের পেছনে গাঢ় বেগুনী মেঘ হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। কিন্তু গরম অত্যন্ত বেশী। বৃষ্টি হলেও তা হবে বসন্তের বর্ষণ।

এখন বেড়াতে বেরনো চলে না। ও ওপরতলায় নিজের ওয়ার্ডে ফিরে চলল।

ওলেগ্ বারান্দা থেকে শুনল উত্তেজিত আহমদজান উঁচু গলায় একটি কাহিনী শোনাচ্ছে। "চুলোয় যাক", আহমদজান বলছিল, "ওরা সৈনিকদের চেয়ে ভাল র‍্যাশন পায়—দিনে বারশো গ্রাম খাদ্য। ওদের খেতে দেওয়া উচিত মানুষের মল! কাজ? কিস্যু কাজ করে না! আমরা ওদের নির্দিষ্ট অঞ্চলে নিয়ে যাই। ওরা পালিয়ে যায় আর লুকিয়ে সারা দিন ঘুমোয়।"

ওলেগ্ নিঃশব্দে ওয়ার্ডে ঢুকল। আহমদজান তার জিনিষপত্রের বাণ্ডিল নিয়ে নিজের বেডের কাছে দাঁড়িয়ে। বেডের চাদর আর বালিশের ওয়াড় খুলে রাখা হয়েছে। সাদা ঝকঝকে দাঁত বের করে, আর এক হাত আস্ফালন করে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আহমদজান তার শেষ কাহিনী শোনাচ্ছিল।

ওয়ার্ডটা একেবারে বদলিয়ে গিয়েছে। ফেদেরো চলে গিয়েছে। দর্শনের

অধ্যাপক গিয়েছে। শুলুবিনও নেই। অদ্ভুত হলেও, ওলেগ্ কখনো আহমদজানকে এই কাহিনী শোনাতে দেখেনি।

"ওরা তাহলে কোন কাজই করে না?" ওলেগ্ শান্তভাবে বলল, "তাহলে ঐ অঞ্চলে কোন বাড়ী-ঘরই তৈরি হয় না?"

"হ্যাঁ, তৈরি হয়", অপ্রস্তুত আহমদজান জবাব দিল, "ওরা যা কিছু তৈরি করে খারাপভাবে করে।"

"তুমি ত' ওদের সাহায্য করতে পারতে" ওলেগ্ শান্তভাবে বলল, যেন ওর শক্তি কমে আসছিল।

"আমার কাজ—রাইফেল; ওদের কাজ—কোদাল!" আহমদজান ফুর্তিতে জবাব দিল।

ওলেগ্ আহমদজানের মুখের দিকে তাকাল। ও যেন প্রথম দেখল, যদিও অনেক বছর ধরে ওটাই আহমদজানের আসল চেহারা—, ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে আহমদজান দাঁড়িয়ে আছে, কাঁধে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ঝুলছে। ওর লেখাপড়া তাস খেলার স্তরের ওপর যায়নি, কিন্তু ওর হাবভাব সিধেসিধি আর অকপট।

এক-একটি মানুষের আসল কাহিনী যুগ যুগ ধরে অচেনা রয়ে যায়। প্রতিটি মানুষের আছে এক-একটি পৃথক কাহিনী। মাঝে মাঝে মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাদের চেয়ে নিজের দেশের মানুষকে চেনা কঠিন হয়ে পড়ে।

ওলেগ্ তবু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। 'কোন মানুষকে মানুষের দল থেকে বাধ্য করা—তুমি কি এই মত পোষণ করো, না নিছক তামাশা করছ?"

"তামাশা! না, আমি তামাশা করিনি। যাদের সম্পর্কে ঐকথা বলেছি তাদের একটাও মানুষ নয়!" আহমদজান রাগতভাবে বলল।

আহমদজান আশা করেছিল ওয়াডের আর সবার মত ওলেগ্কেও ও নিজের মতামত বিশ্বাস করাতে পারবে। ওলেগ্ যে একজন নির্বাসিত ব্যক্তি ও তা জানত, কিন্তু ও জানত না যে ওলেগের বন্দী শিবিরে থাকার অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

ওলেগ্ আড়চোখে পাভেলের বেড দেখে নিল। ওলেগ্ বুঝতে পারছিল না পাভেল এখনো কেন আহমদজানের সমর্থনে কিছু বলছে না। আসলে পাভেল নিজের বেডেই ছিল না।

"আর আমি কিনা ধরে নিয়েছিলাম যে তুমিও সৈনিক ছিলে!" ওলেগ্ আহমদজানকে বলল, তুমি কার সেনাদলে ছিলে বলো ত'? বেরিয়া'র বাহিনীতে ছিলে নাকি? [স্ট্যালিনের আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী লাভ্রেন্তি বেরিয়া। বেরিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে জবরদস্তি শ্রম শিবিরে পাঠিয়েছিলেন।]

"আমি কোন বেরিয়াকে চিনি না।" আহমদজান রেগে লাল। "ওরা সব ওপরতলার লোক। ওদের সঙ্গে আমার কাজ-কর্ম নয়। আমি কাজ করার শপথ নিই, কাজই করি। ওরা কাজ করতে বাধ্য করে···আমি কাজ করি···"

মধুর সমাপ্তি

মুষলধার বৃষ্টি দিয়ে দিনটা শুরু হয়েছিল। রাতেও বৃষ্টি। আর ঝড়ো বাতাস। শীত ক্রমশঃ বাড়ল। বৃহস্পতিবার সকালে বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাত। ওলেগের মত যারা বসন্তের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তারা যেন ভিজে ন্যাতার বাড়ি খেয়ে চুপসিয়ে গেল। বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ তুষারপাত থামল। তারপর হঠাৎ বৃষ্টিও থামল। ঝড়ের দাপট কমল। আবহাওয়া হ'ল থমথমে, ঠাণ্ডা আর বিষণ্ণ।

সূর্যাস্তের কাছাকাছি পশ্চিম আকাশ পরিষ্কার হয়ে এক ফালি সোনালী রোদ দেখা দিল।

শুক্রবার সকালে পাভেল ছাড়া পাওয়ার কথা। সেদিন আকাশে মেঘ দেখা গেল না। সকালের রোদ পথে জমে থাকা অল্প অল্প জল শুষে নিল।

সবার মনে হ'ল বসন্তারম্ভের নির্ভুল, অপরিবর্তনীয় সংকেত পাওয়া গিয়েছে। বর্ষা আর শরতে ফাটা শার্সির ফুটোয় যে কাগজ লাগানো হয়েছিল তা খুলে ফেলা হ'ল। ঘরের চালের কাছাকাছি যে জানলাগুলো ছিল তাও খুলে দিল। ফলে ঐ জানলাগুলো থেকে কিছু শুকনো পুটিং মেঝেয় খসে পড়ল। পরিচারিকাদের কাজ বাড়ল।

পাভেলের হাসপাতালের ভাঁড়ারে জমা দেওয়ার মত কোন জিনিষ ছিল না। ও হাসপাতালের পোষাক নেয় নি। সেজন্য দিনের যেকোন সময় হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার অসুবিধে নেই। প্রাতরাশের পরই ওর পরিবারের গাড়ী হাজির হ'ল।

কি অবাক কাণ্ড! লাভ্রিক্ গাড়ী চালাচ্ছে। ও গতকালই ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে।

স্কুলগুলোর ছুটিও গতকালই আরম্ভ হয়েছে। লাভ্রিকের অনেক পার্টিতে নেমন্তন্ন আছে। মাইকা পায়ে হেঁটে দূরে কোথাও বেড়াতে যাবে। ওরা দুজন ফুর্তিতে ডগমগ। কাপা শুধু ওদের দুজনকে নিয়ে এসেছে। কাপা লাভ্রিক্‌কে কথা দিয়েছে, পাভেলকে বাড়ীতে পেঁছিানোর পর ও বন্ধুদের গাড়ীতে নিয়ে বেড়াতে পারবে। লাভ্রিক্ বন্ধুদের দেখিয়ে দিতে চায় যে ও কারো সাহায্য ছাড়া, ইয়ুরিকেও বাদ দিয়ে, গাড়ী চালাতে পারে।

হাসপাতালের প্রক্রিয়া এবার বিপরীত মুখী হ'ল। এবার সবই আনন্দ-পূর্ণ। পাজামা পরা পাভেল সিঁড়ির নিচে নার্সের কামরায় ঢুকল। বেরিয়ে এল নিজের ধূসর রঙের স্যুট পরে। লাভ্রিক্ খুব ফুর্তিতে ছিল। নতুন, নীল স্যুট পরা লাভ্রিক্‌কে ভাবীযুক্ত সুপুরুষই লাগত যদি না ও হাসপাতালের

হল ঘরে মাইকা'র সঙ্গে অত ছেলেমানুষি করত। লাভ্রিক্ রিংয়ে বাঁধা গাড়ীর চাবিটা অনবরত নিজের আঙুলে ঘোরাচ্ছিল।

"গাড়ীর দরজাগুলো তালা দিয়েছিস?" মাইকা ওকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, সব তালা লাগানো আছে।"

"সবক'টা জানলা বন্ধ করেছিস?" "যা না, নিজে দেখে আয়।"

গাঢ় রঙের চুল দুলিয়ে মাইকা ছুটল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল, "হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।" পরক্ষণেই চোখ-মুখে ভয় ফুটিয়ে বলল, "বাক্সটা তালা লাগিয়েছিস?" "যা, দেখে আয়।"

মাইকা আবার ছুটল।

কিছু লোক হলুদ তরল ভর্তি জার হাতে নিয়ে পরীক্ষাগারের দিকে যাচ্ছিল। আরো কিছু লোক ছিল যাদের বর্ণনা করা যায় না; শ্রান্ত মানুষগুলো বেড খালি হওয়ার অপেক্ষায় বসেছিল। ওদের একজন বেঞ্চিতে শুয়ে পড়েছিল। পাভেল ওদের ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখল। ও সাহসিকতার প্রমাণ দিয়েছে, নিজেকে পরিস্থিতির চেয়ে মজবুত প্রতিপন্ন করেছে।

লাভ্রিক্ বাপের স্যুটকেস বয়ে নিয়ে চলল। বসন্তের উপযোগী কোট পরা, তামাটে রঙের চুলভরা মাথা কাপাকে ফুর্তির দরুন অনেক কমবয়সী দেখাচ্ছিল। ও নার্সকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে পাভেলের এক হাত ধরল। মাইকা অপর হাত ধরল। কাপা পাভেলকে বলল, "তুমি মাইকার নতুন ওড়না দেখেছ? আনকোরা নতুন। কি সুন্দর ডোরা কাটা।"

"পাশা! পাশা!" কেউ পেছন থেকে ডাকল। ওরা পেছন ফিরল। দেখা গেল স্যার্জিক্যাল ওয়ার্ডের বারান্দা দিয়ে চ্যালি এগিয়ে আসছে। ও একটুও ফ্যাকাশে হয়নি। বেশ ফুর্তিতেই আছে। শুধু হাসপাতালের পাজামা আর চটি পরে আছে বলে ওকে রোগী হিসেবে চেনা যায়।

পাভেল ওর করমর্দন করে ফুর্তি ভরা সুরে বলল, "দ্যাখো, কাপা, এই যে আমাদের হাসপাতাল রণাঙ্গনের প্রথম সারির বীর যোদ্ধা। এর পাকস্থলী কেটে বাদ দিয়েছে, তবু মুখে হাসি লেগে আছে।"

কাপার সঙ্গে পরিচয় করাতে চ্যালি নিজের দুই গোড়ালি ঠুকে সম্ভ্রম ভরে দাঁড়ালো আর এক দিকে মাথা হেলাল—আমোদ মিশ্রিত ফুর্তি প্রকাশ করার জন্য। "পাশা, তোমার টেলিফোন নম্বর দাও। টেলিফোন নম্বর," চ্যালি বলল।

পাভেল এমন ভাণ করল যেন দরজার কপাটে কোন কিছু ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাই চ্যালির প্রশ্ন শুনতে পায়নি। মানুষ হিসেবে চ্যালি খারাপ নয়। কিন্তু ও অন্য সমাজের মানুষ, ওর ধ্যান-ধারণাও আলাদা। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ইজ্জতদার হবে না। পাভেল ওকে কাটানোর ফন্দি খুঁজতে লাগল।

ওরা গাড়ী বারান্দার নিচে চলে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পাভেলদের

মোস্ক্ভিচ্-এ [ছোট আকারের জনপ্রিয় রুশ গাড়ী] চার্লির চোখ পড়ল। লাভ্রিক্ মোস্ক্ভিচের মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে, যাতে উঠেই রওনা হওয়া চলে। চ্যালি ভাল করে দেখল কিন্তু গাড়ীটা কার তা জানতে চাইল না। শুধু বলল, "কত দাম পড়েছে ?

"দেনো হাজার রুবলের কিছু কম।

"তবে টায়ার কটা অত পুরানো কেন ?"

"আসল কথা কি জানো, আমাদের বরাতই মন্দ...আজক লাকার শ্রমিক-গুলো কোন জিনিষ ঠিক মত বরলে ত..

"তোমার নতুন টায়ার চাই ?

"তুমি জুটিয়ে দিতে পারো ? খুব ভাল হয়। ম্যাক্সিম, খুব উপকার হবে।

"নিশ্চয় পারব। কোন সমস্যাই হবে না। তুমি ফ্রেক তোমার ফোন নম্বর লিখে দাও, ও পাভেলের বুকে একটা আঙুল দিয়ে খোঁচাল। "আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি পাবে। গ্যারান্টি দিচ্ছি।

এরপর চার্লিকে এড়ানোর ছুতো খোঁজা চলে না। পাভেল নিজের নোট বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে বাড়ী আর অফিসের ফোন নম্বর লিখে দিল। "বেশ, তাহলে কথা রইল। আমি তোমাকে ফোন করব," চ্যালি বলল।

মাইকা সামনের সীটে বসল। পাভেল আর কাপা পেছনে। "আমরা বন্ধু রয়ে যাব। চ্যালি বিদায় জানাতে বলল। গাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

"আমাদের সুদিন আসছে।" চ্যালি বদ্ধমুষ্টি লাল সেলাম সহ বলল

"আচ্ছা, এবার কি করতে হবে ?" লাভ্রিক মাইকার গাড়ী চালানোর জ্ঞান পরীক্ষা করতে বলল. "ইগ্নিশন-এর [গাড়ীর ইন্ধনে অগ্নি সংযোগ করা] চাবি ঘোরাব ?

"না, প্রথমে দেখে নিতে হবে গাড়ীর ইঞ্জিন কোন চালক গিয়ারের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় আছে কিনা। যুক্ত না থাকলে ইগ্নিশনের চাবি দিতে হবে"

গাড়ী এগিয়ে চলল। রাস্তায় অল্প অল্প জমে থাকা জল পেরিয়ে হাস-পাতালের অস্থি বিভাগের বাড়ীর কাছে পৌঁছে মোড় নিতে হল। সেখানে ধূসর ড্রেসিং গাউনের সঙ্গে বুট পায়ে, লম্বা, রোগাটে চেহারার এক রোগী রাস্তার মাঝখান দিয়ে অত্যন্ত গতিতে হাঁটছিল। ওকে দেখা মাত্র পাভেল বলল, "হর্ন বাজাও ! জোরে হর্ন দাও।"

লাভ্রিক হুস্ব কিন্তু জোর হর্ন বাজাল। রোগা লোকটা চট করে এক পাশে সরে, তাকাল। লাভ্রিক এ্যাক্সিলারেটার চাপল। গাড়ী এগিয়ে চলল। মাত্র দশ সেঃ মিঃ তফাৎ থাকার জন্য রোগা লোকটার গায়ে ধাক্কা লাগল না।

"আমি ওর নাম দিয়েছি 'হাড্ডি-চুষ'। অত্যন্ত বাজে ধরনের, হিংশুটে মানুষ। ওকে আগে দেখেছ না, কাপা ?"

"তুমি ঐ লোকটার ব্যবহারে অবাক হয়েছ বুঝি ?" কাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "কারো বরাত ফিরলে অমন হিংশুটে মানুষ অনেক দেখা যায়। ওরা অপরের সুখ সহ্য করতে পারে না।"

"ও একটা শ্রেণী-শত্রুও বটে," পাভেল বেজার মুখে বলল, "ঠিক এই পরিস্থিতি না হলে………"

"তাহলে ত' ওকে গাড়ী চাপা দেওয়াই ঠিক ছিল। তুমি হর্ন বাজাতে বললে কেন ?" লাভ্রিক হেসে পেছন ফিরে তাকাল।

"গাড়ী চালাতে চালাতে পেছনে তাকিও না।" কাপা ভয় পেয়ে ধমকাল।

সত্যিই গাড়ীটা পথ থেকে একটু সরে গিয়েছিল।

"আবার ফিরে তাকাচ্ছে।" হাসিতে উচ্ছল মাইকা বলল। "আমি তাকাতে পারি, পারি না, মা ?"

"ওর বান্ধবীদের গাড়ী করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করছি। তা না করলে লাভ্রিক ঠিক মত গাড়ী চালানো শিখবে না," কাপা বলল।

হাসপাতালের বাইরে এসে পড়তে কাপা জানলার কাঁচ নামিয়ে কিছু আবর্জনা ফেলল। "আর যেন এই হতচ্ছাড়া জায়গায় ফিরে আসতে না হয়। কেউ হাসপাতালের দিকে ফিরে তাকিও না।"

ওলেগ্ গাড়ীতে ধাবমান পাভেলদের উদ্দেশে প্রাণ ভরে গালি দিল।

ওলেগ্ ভেবে দেখল, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওকে ঠিক পরামর্শই দিয়েছে। ওর সকালে ছাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দুপুরে যখন আর কোন রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয় না তখন ওকে ছেড়ে দিলে তা হবে ওর পক্ষে অসুবিধাজনক। তখন হাসপাতালের বাইরে কোন রকম ব্যবস্থা করা যাবে না। ওকে কথা দিয়েছে, আগামীকাল ছেড়ে দেবে।

ভাল লাগার মত সুন্দর, রোদ ঝলমলে দিন। একটু করে তাপ বাড়ছে। সবকিছু তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে। উশ্-টেরেকে ওরা নিশ্চয় বাগান পরিচর্যা করছে, সেচের নালা সাফ করছে।

বেড়াতে বেড়াতে ওলেগ্ চিন্তার রাশ আলগা করে দিল।

কি সৌভাগ্য। গত শীতে প্রচণ্ড তুষারপাতে ও উশ্-টেরেক ছেড়ে মরতে চলেছিল, আর এই বসন্তের শিখরে ও সেই উশ্-টেরেকে ফিরবে। নিজের ছোট্ট বাগানে চারা গাছ রোপণ করতে পারবে। চারা গাছ লাগিয়ে তার বৃদ্ধি দেখতে ভারি চমৎকার লাগে। কিন্তু সব বাগানে নারী-পুরুষ মিলিত ভাবে কাজ করে, ওর বাগানে ও একা।

ওলেগ্ আরো একটু ঘুরে বেড়াল। মনে পড়ল, মিটা'র সঙ্গে দেখা করা দরকার। হাসপাতালে আসার পর মিটাই ওকে বলেছিলেন, বেড খালি নেই। তারপর বেশ কিছু সময় কেটে গিয়েছে। দুজনের দূরত্ব কমেছে।

মিটা সিঁড়ির নিচে জানলা বিহীন খুপরিতে রোগীদের রোগের ইতিহাস সম্বলিত কার্ডগুলো বারবার নতুন করে সাজাচ্ছিলেন। ঘরে বিজলি বাতি জ্বলছে। খোলা জায়গায় পায়চারির পর ওলেগের চোখে আর বুকে ঐ আলো অসহ্য লাগল।

একটু খাটো হয়ে ওলেগ্ নিচু দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। "মিটা, আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি? ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।"

মিটা মুখ তুললেন। ও'র মুখের সবই চোখাচোখা। কেমন যেন আনুপাতিক গরমিলও আছে। গত চল্লিশ বছরে কোন পুরুষ ঐ মুখে চুমু খেতে বা হাত বোলাতে এগোয়নি। যে কমনীয়তা স্বাভাবিক ভাবে ফুটতে পারত তা বিকশিত হওয়ার সুযোগই পেল না। মিটা এক ভারবাহী ঘোড়া হয়ে গেলেন।

"কি চান, বলুন?" মিটা বললেন। "এরা আমাকে আগামী কাল ছেড়ে দিচ্ছে।"

"ভারি খুশি হলাম!" মিটা আসলে হৃদয়বান মহিলা। কেবল প্রথম দর্শনে গোমড়া মুখো।

"এটাই সব নয়। আগামী সন্ধ্যেয় শহর ছেড়ে যাওয়ার আগে আগামীকাল সকালে আমার কিছু কাজ সারতে হবে। সমস্যা হ'ল ভাঁড়ার থেকে আমাদের পোষাক-গুলো এত দেরীতে ফেরত দেয় যে তার ফলে আমার কাজগুলো সারা হবে না। এই ব্যবস্থা করা যায় না———জিনিষগুলো ভাঁড়ার থেকে আজই আনিয়ে নিয়ে যদি কোথাও লুকিয়ে রাখেন, আমি তাহলে ভোর বেলায় পোষাক বদলিয়ে হাসপাতাল থেকে বিদায় নিতে পারব?"

"না, তা অসম্ভব। নিজামুদ্দিন জানতে পারলে…………" মিটা বললেন।

"উনি জানবেন না। আমি জানি ওটা নিয়ম বিরুদ্ধ। কিন্তু বাঁচতে হলে নিয়ম ভাঙতেই হয়।"

"কিন্তু আপনাকে যদি আগামীকাল না ছাড়ে?" "নিশ্চয় ছাড়বে। ভেরা গ্যাঙ্গার্ট তাই বলেছেন।"

"আমি তাঁরই মুখ থেকে শুনতে চাই," মিটা বললেন। "বেশ, আমি ডাঃ গ্যাঙ্গার্টকে তাই বলিগে।"

"আপনি খবরটা শুনেছেন নাকি?" "না। কোন্ খবর?"

"ওরা নাকি আমাদের সবাইকে এ বছরের শেষে মুক্তি দেবে? কোনও কথার খেলাপ হবে না!" গুজবে শোনা মুক্তির সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে মিটার অনাকর্ষক মুখ মণ্ডল সজীব হয়ে উঠল।

"আপনি 'আমাদের' বলতে কাকে বোঝাচ্ছেন? তার মানে কি শুধু আপনাদের মুক্তি দেবে?" [মিটাও নির্বাসন দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি। কিন্তু জার্মান বংশোদ্ভব বলে জাতি হিসেবে নির্বাসিত, ওলেগের মত ব্যক্তি হিসেবে নির্বাসিত নয়। অর্থাৎ দু'জনে দুটি পৃথক শ্রেণীর নির্বাসিত ব্যক্তি]

"না, আমি বলতে চেয়েছি আমাদের সঙ্গে আপনাদেরও মুক্তি দেবে। আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?" মিটা ওলেগের মতামত শোনার জন্য অাগ্রহান্বিত।

ওলেগ্ মুখ বিকৃতি করে মাথা চুলকাল। একটা চোখ বুজল। "ওটা হওয়া সম্ভব," ওলেগ্ বলল, "আমি বলতে চাই, ঐ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আসলে আমি এত বেশী আশার কথা শুনেছি যে ওসব আর কানে ঢুকতে চায় না।"

"কিন্তু এবার সব নিশ্চিত। ওরা বলেছে একটুও হেরফের হবে না।" মিটা এত বিশ্বাস করতে চান যে ওঁর মনে সন্দেহ এনে লাভ নেই।

ওলেগ্ দু'ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ ভাবল। কিছু কথা অবশ্যই ভেসে বেড়াচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের পুরানো বিচারপতিদের বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে সবকিছু অতি দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। এক মাসে এত ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। তবু ইতিহাসের গতি হৃদয় বা জীবনের গতির চেয়ে মন্থর। ওলেগ্ তাই কিছুতেই সন্দেহ ত্যাগ করতে পারেনি।

"ঈশ্বরের কৃপায় আপনার কথাই যদি সত্যি হয় তাহলে কি করবেন? এখানকার কাজ ছেড়ে দেবেন?"

"আমি জানি না," মিটা ক্ষীণ জবাব দিলেন। ওঁর বড়বড় আঙুলগুলো রোগীদের কার্ডের ওপর ছড়িয়ে আছে। উনি ওসব যথেষ্ট ঘাটাঘাটি করেছেন।

'আপনি সালস্ক্ থেকে এসেছেন, তাই নয়?' ওলেগ্ বলে। 'হ্যাঁ।"

"সালস্ক্-এর পরিস্থিতি কি এখানকার চেয়ে ভাল?" "কিন্তু সালস্ক্ মানে মুক্তি," মিটা ফিসফিস করে বললেন।

অথবা ওঁর লুকানো বাসনা, নিজের গাঁয়ে ফিরে মনের মত স্বামী খুঁজে নেবেন। কে জানে?

ওলেগ্ ভেরার খোঁজে চলল। প্রথমে খুঁজে পেল না। ওরা বলল, ভেরা রশ্মি-চিকিৎসা কামরায় আছে। তারপর জানা গেল, ও সার্জনদের সঙ্গে কাজ করছে। অবশেষে দেখা গেল ভেরা বারান্দা দিয়ে লেভ্ লিওনিডোভিচের সঙ্গে হেঁটে চলেছে। ওলেগ্ ভেরাকে ধরতে চলল।

'ডাঃ ভেরা কার্নিলিয়েভনা, আমার জন্য কয়েক মুহূর্ত ব্যয় করতে পারবেন?' ভেরাকে, শুধু ভেরাকে একলা, কিছু বলতে কি যে ভাল লাগে। ওলেগ্ লক্ষ্য করেছে, ভেরার সঙ্গে কথা বলতে হলে ওর কণ্ঠস্বর বদলিয়ে যায়।

ভেরা ফিরে তাকাল। ও যে কত ব্যস্ত তা ওর হাতের ভঙ্গী থেকে বোঝা যায়। তার সঙ্গে আছে দেহের ঈষৎ ঝুঁকে পড়া ভাব, মুখে কাজের উৎকণ্ঠা। ও তবু সবার প্রয়োজনের প্রতি সজাগ। ও বলল, "বলুন?"

ভেরা কিন্তু 'মিঃ কস্টোভালোটভ্' যোগ করল না। ও ওলেগের সম্পর্কে

কোন তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে হলে 'মিঃ কস্টোকালোটভ্' বলে, ওলেগের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হলে তা বলে না।

"একটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারে আপনাকে অনুরোধ করতে চাই। আপনি কি মিটাকে জানিয়ে দেবেন যে আমাকে নিশ্চয় আগামী কাল ছেড়ে দেওয়া হবে?"

"কেন, তা জানাতে হবে কেন?" "জানানো অত্যাবশ্যক। আগামী কাল সন্ধ্যায় আমাকে এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে, অর্থাৎ…"

"বেশ। লেভ, আপনি এগোন। একটু পরেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

লেভ লিওনিডোভিচ চললেন। সামনে একটু ঝোঁকা বড়সড় দেহটা দু'পাশে দুলে দুলে এগিয়ে চলল। হাত দুটো সামনের পকেটে ঢোকানো। পেছনে ফিতে বাঁধা ডাক্তারি কোটটা যেন চাপে ফেটে যাবে। "আমার অফিসে চলুন" ভেরা ওলেগকে বলল।

ভেরা আগে চলল। পেছনে ওলেগ। ভেরার দেহ লঘু। ওর হাত-পাও লঘু। ও ওলেগকে রশ্মি-চিকিৎসা কামরায় নিয়ে এল। এ কামরাতেই ওলেগ ডণ্টসোভার সঙ্গে লম্বা একটা তর্ক করেছিল। ভেরা অমসৃণ টেবিলটার পেছনে বসল। ওলেগকেও বসতে বলল। কিন্তু ওলেগ দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে আর কেউ নেই। তির্যক সোনালী রোদ এসে যন্ত্রপাতির নিকেল করা অংশে ঠিকরে পড়ছে। উজ্জ্বলতায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

"কিন্তু আমি যদি আগামীকাল তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার মত সময় বার করে উঠতে না পারি, তুমি তো জানো, এপিক্রিসিস্ না লিখে ছেড়ে দিতে পারি না।"

ভেরা নিয়ম-কানুন পালনের খাতিরে, না স্রেফ ওকে একটু উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে ঐ কথা বলল, ওলেগ বুঝতে পারল না। "এপি কি? কি বললে যেন?"

"এপিক্রিসিস্—অর্থাৎ তোমার চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এপিক্রিসিস্ প্রস্তুত হওয়ার আগে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।"

বেচারীর রোগা কাঁধ দুটোর ওপর কত যে কাজের বোঝা! কত লোক যে ওকে ডাকাডাকি করে আর ওর অপেক্ষায় বসে থাকে। ওলেগও ত ওকে নিজের সমস্যা নিয়ে বিরক্ত করছে। ওর এখন এপিক্রিসিস্ না লিখে উপায় নেই।

ভেরাকে ঘিরে কি যেন এক আভা। না, শুধু ওর স্নেহার্দ্র ভাব নয়। এ আভা এক স্বতন্ত্র সত্তা। "তা তুমি কি চাও? তুমি কি এপিক্রিসিস্ পাওয়া মাত্র চলে যেতে চাও?"

"আমি কি চাই তা ধর্তব্য নয়। কিছু বেশী সময় থাকতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ শহরে আমার রাত কাটানোর জায়গা নেই। আর, আমি আরেকবার রেল স্টেশনে রাত কাটাতে চাই না।"

"বটেই ত'। হোটেলেও তোমাকে থাকতে দেবে না," ভেরা মাথা হেলাল। ওর কপালে ভ্রূকুটি ফুটল। "এমন মুস্কিল, যে বৃদ্ধা পরিচারিকাটি নিজের ফ্ল্যাটে রোগীদের থাকতে দেয় সেও অসুস্থার দরুন ছুটি নিয়ে অনুপস্থিত আছে। এখন কি করা যায়?" ভেরা দাঁত দিয়ে ওপরের ঠোঁট কামড়িয়ে ধরল আর ওর সামনে রাখা কাগজে আঁকা দুটো ছোট ছোট বৃত্তে কলম বোলাতে লাগল। "আচ্ছা···আমার ফ্ল্যাটে থাকতে তোমার···অসুবিধে হবে?"

ভেরা কি বলল? ও কি সত্যিই ঐ কথা বলেছে? ওলেগ্ হয়ত ভুল শুনেছে। ওকে পুনরাবৃত্তি করতে বলবে নাকি?

ভেরার গাল দুটোয় রক্তিম আভা। ও এখানো ওলেগের চোখ এড়াতে চাইছিল। কিন্তু ও কথাটা সরল মনেই বলেছিল। যেন রোগীকে ডাক্তারের ফ্ল্যাটে রাত কাটাতে বলা কোন দৈনন্দিন সাধারণ ঘটনা। "আগামীকাল আমার পক্ষে একটু পৃথক ধরনের দিন হবে। সকালে হাসপাতালে মাত্র দু'ঘণ্টার কাজ আছে। তারপর সারা দিনই বাড়ীতে থাকব। আবার বিকেল চারটেয় বেরোব···অনায়াসে বান্ধবীদের বাড়ীতে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব···"

ভেরা ওর দিকে সোজাসুজি তাকাল। গাল দুটো রাঙা, কিন্তু নিষ্পাপ অকপটতায় চোখ দুটো উজ্জ্বল। ওলেগ্ ওর কথা ঠিক মত বুঝেছে? ও কি ঐ উপহার গ্রহণের উপযুক্ত?

ওলেগ্ স্রেফ বুঝতে পারেনি। কোন স্ত্রীলোক ঐ ধরনের কথা বললে তা কি বোঝা যায়? ঐ কথায় হয়ত ভূমিকম্প হয়ে যেতে পারে। না, ওলেগ্ আর ভাবল না। ভাববার সময় কোথায়?

উত্তরের প্রতীক্ষমানা ভেরার মধ্যে এক মহনীয় ভাব পরিস্ফুট। "অশেষ ধন্যবাদ" ওলেগ্ বলল, "ঐ ব্যবস্থা অবশ্যই অপূর্ব।" একশো বছর আগে নিজের শৈশবে ভব্য আচরণ বিধি সম্পর্কে ও যা কিছু শিখেছিল তা এত দিনে একেবারে বিস্মৃত। "খুবই চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু আমি তোমার স্বাচ্ছন্দ্য··· হরণ করতে চাই না। না, আমি তা করতে পারব না।"

"তোমার ওসব দুশ্চিন্তা করতে হবে না," ভেরা মিষ্টি হেসে বলল, "আর তোমার যদি দু-তিন দিন থাকতে হয় তবে আর কোন ব্যবস্থার কথা ভেবে দেখব। তোমার কি এ শহর ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে?"

"অবশ্যই খারাপ লাগছে··কিন্তু আরেকটা কথা আছে। আমি যদি থাকতে রাজী হই তবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার প্রমাণ পত্রে আগামী পরশুর তারিখ থাকতে হবে, নইলে কমেন্দাত্রা জানতে চাইবে আমি সময় পেয়েও কেন শহর ছেড়ে যাইনি। সন্তোষজনক জবাব না দিতে পারলে, জেলে পুরে দেবে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার খাতিরে সব রকম শঠতাই করা হবে। অর্থাৎ মিটাকে আজ বলব, তোমাকে যেন আগামীকাল ছাড়িয়ে দেয়, কিন্তু প্রমাণ পত্রে যেন আগামী পরশুর তারিখ দেওয়া হয়। আচ্ছা জটিল মানুষ তুমি!"

কিন্তু ভেরা ওর জটিলতায় আদৌ বিচলিত নয়। বরং ওর চোখ দুটো হাসছিল।

"জটিল আমি নই, ভেরা, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাটাই জটিল। আর সবার যেমন এক কপি প্রমাণপত্র পেলে কাজ হয় আমার তা চলবে না। প্রমাণ পত্রের সঙ্গে তার নকলও লাগবে।"

"কেন?" "আমাকে রেলে ভ্রমণের অনুমতি দানের জন্য কমেন্দান্তুরা প্রমাণ পত্রের নকলটা রেখে দিতে চাইবে। আসল প্রমাণ পত্র আমার কাছে রয়ে যাবে।"

(কমেন্দান্তুবাকে ঐ প্রমাণ পত্রের নকল না দেওয়ার জন্য ওলেগ সাধ্য মত চেষ্টা করবে। ও চেঁচামেচি করবে, দিব্যি গেলে বলবে, ও প্রমাণ পত্রের কোন নকল পায়নি। এত ঝামেলা করে প্রমাণ পত্র আর তার নকল জুটিয়ে, তা কমেন্দান্তুরার হাতে তুলে দিতে হবে কেন?)

"তাছাড়া রেল স্টেশনে দাখিল করবার জন্য তোমার আরো একটা নকল চাই তো?" ভেরা বলল। ও একটা কাগজে খসখস করে কিছু লিখল। 'এই নাও আমার ঠিকানা। পথ নির্দেশ বলে দেব?"

'আমি খুঁজে নিতে পারব।" (ভেরা কি সত্যিই আতিথ্য দানে আগ্রহী?)

"আর, এইবার······" ভেরা কয়েকটা চৌকো চৌকো কাগজের টুকরো ওর ঠিকানার সঙ্গে আটকিয়ে দিয়ে বলল, "······ডাঃ ডন্টসোভা এই ওষুধগুলো প্রেসক্রাইব করেছেন। তিন কপি আছে। তোমার সুবিধে মত অল্প-অল্প কনতে পারবে।"

প্রেসক্রিপশন আর প্রেসক্রিপশন! ভেরা এমন করে প্রেসক্রিপশনের কথা বলল যেন ওগুলো ওর ঠিকানার গুরুত্বহীন লেজুড় মাত্র। গত দু'মাসের চিকিৎসায় ও ঐ প্রসঙ্গ একবারও তোলেনি। এটা ওর চাতুরির পরিচায়ক।

ভেরা উঠল। প্রস্থানোদ্যত। ওর কাজ আছে। লেভ ওর জন্য অপেক্ষা করছেন······

ছড়িয়ে পড়া রোদের আলোয় দণ্ডায়মানা ভেরাকে দেখে হঠাৎ ওলেগের মনে হল ওকে এই প্রথম দেখছে। ক্ষীণতনু ভেরা আপন দীপ্তিতে ভাস্বর। অথচ প্রকৃত বন্ধুর মত বুঝদার। এমন বন্ধু যার সান্নিধ্য হারাতে খারাপ লাগে।

ওলেগের মন আনন্দে ভরে গেল। ভেরার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে ইচ্ছে হ'ল। "আমার ওপর এত দিন রাগ করে থাকলে কেন, ভেরা?"

আলোকস্নাত ভেরা ওর দিকে তাকাল। হাসল। বুদ্ধি দীপ্ত হাসি। "তুমি বলতে চাও, তুমি যে কোন অন্যায় করেছ এমন কথা তোমার মনে পড়ে না?" "না।"

"কিছু মনে পড়ে না?" "এমন কিছু মনে পড়ছে না, ভেরা।"

"মনে করার চেষ্টা করো।" "করেছি। তবু মনে পড়ছে না। অন্ততঃ কিছু আভাস দাও······"

"এবার আমার যেতে হবে··" ভেরার হাতে চাবি। ওর দরজায় চাবি দিয়ে যেতে হবে। ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ থেকে কি যে ভাল লেগেছে। যদি সারাদিন থাকা যেত!

বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া ভেরাকে পেছন থেকে ছোটখাটো দেখাচ্ছিল। ওলেগ্ ওর অপসৃয়মান মূর্তি'র দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

তারপরই ওলেগ্ আরেকবার বেড়াতে বেরোল। বসন্ত সবে এসেছে। যত পারো বুক ভরে তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নাও। ও লক্ষ্যহীন ভাবে ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে বেড়াল। যে বাগানে ও এক'মাস বন্দী ছিল তা ছেড়ে যেতে হবে ভেবে মন খারাপ লাগল। জাপানী এ্যাকাসিয়া'র ফুল ফুটবে, ওক্ গাছে যখন নতুন পাতা দেখা দেবে ওলেগ্ তখন এখানে থাকবে না।

কোন অজ্ঞাত কারণে ওর বমি ভাব লাগছিল না, দুর্বলও লাগছিল না। নিজের বাগানে কিছু মাটি কোপাতে পেলে মন্দ হত না। মন কি যেন চাইছিল, ও বুঝতে পারছিল না। ও লক্ষ্য করল, ওর তর্জনী আর মধ্যমাটা ওর অজ্ঞাতে মিশে গেল। ধূমপানের ইচ্ছে। কিন্তু ও ধূমপান বর্জন করেছে। না, ইচ্ছে হলেও সিদ্ধান্ত বদলানো যাবে না।

প্রাণ ভরে বেড়ানোর পর ওলেগ্ মিটা'র সঙ্গে দেখা করল। মিটা চমৎকার মানুষ। ওলেগের ঝোলা ভাঁড়ার থেকে আনিয়ে রাখল। জুবিয়ে রাখা হয়েছে। রাথবুনের চাবি সন্ধ্যায় ডিউটি করতে আসা বৃদ্ধা পরিচারিকার হেফাজতে থাকবে। দিনের কাজ শেষ হওয়ার আগে ওলেগের বহির্বিভাগে গিয়ে দ্বিতীয় প্রমাণপত্র সংগ্রহ করে নিতে হবে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া মানে অবধারিত মনে হচ্ছে। ওলেগ্ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। অবশ্যই এটা হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে শেষ ওঠা-নামা নয়। তবু শেষের কাছাকাছি।

সিঁড়ির মাথায় জোয়া'র সঙ্গে দেখা। "কি খবর" জোয়া একান্ত ভাবলেশহীন ভাবে প্রশ্ন করল।

জোয়ার আচরণে কষ্টে আয়ত্ত স্বাভাবিকতা নেই। ও সহজেই স্বাভাবিক। যেন ওদের দু'জনের মধ্যে কখনো কিছু ঘটেনি। আদরের ডাক নাম, হিন্দি ছায়াছবি 'আওয়ারা'র নাচ, অক্সিজেনের বেলুন, এসব যেন কখনই বাস্তবে ঘটেনি।

হয়ত জোয়াই ঠিক করেছে। ওসব বার বার মনে রেখে কি হবে? আদৌ কেন মনে রাখা? কেন মন খারাপ করা?

এক রাতে যখন জোয়া ডিউটিতে ছিল ওলেগ্ তখন ওর পেছন পেছন না ঘুরে স্রেফ ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। আরেক সন্ধ্যায় জোয়া ইন্জেকশনের সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে ওর বেডে এসেছে, যেন এটাই জোয়ার একমাত্র স্বাভাবিক কাজ। ওদের দু'জনের সম্পর্ক অক্সিজেন বেলুনটার মতই ভরপুর আর টানটান ছিল,

তারপর হঠাৎ একটু একটু করে কমে গিয়ে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু রয়ে গিয়েছে জোয়ার বন্দুত্বপূর্ণ অভিবাদন, "কি খবর ?"

ওলেগ্ চেয়ারের সামনের দিকে ঝুঁকে বসল। লম্বা হাত দুটো ঝুলতে থাকল। এক গোছা কালো চুলও কপালে ঝুলেছিল। ও বলল, "শ্বেত কণিকা গণনা—২,৮০০, গতকাল থেকে রশ্মি-চিকিৎসা বন্ধ আছে। আগামী কাল ছাড়া পাচ্ছি।"

"আগামী কাল ?" জোয়ার সোনালী চোখের পাতাগুলো পিট পিট করে উঠল। "খুব আনন্দের কথা। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো।"

"আমাকে অভিনন্দন জানানোর কি আছে ?"

"এই অকৃতজ্ঞ!" জোয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে, যখন এখানকার সিঁড়ির বাঁকে শুয়েছিলে ? তখন ত' এক সপ্তাহও বাঁচার ভাবোনি, ভেবেছিলে ?"

সেকথা সত্য। জোয়া সত্যিই চমৎকার মেয়ে। ফূর্তিবাজ, পরিশ্রমী এবং অকপট। ও মনের কথা খোলাখুলি বলে দেয়। ওরা যে দুজনে দুজনকে ঠকিয়েছে, এই অস্বস্তিকর চেতনা দূর হওয়ার পর, ওদের নতুন করে বন্ধু হয়ে যাওয়ার বাধা কোথায় ?

"সত্যিই ত'," ওলেগ হাসল। "তুমি তাহলে মানছ ?" জোয়াও হাসল। কিন্তু জোয়া দুজনার মধ্যে বিদ্যমান হিনবাসের প্রসঙ্গ তুলল না।

জোয়া পরেও তা মনে করার চেষ্টা করবে না। সপ্তাহে চার দিন হাসপাতালে ডিউটি করবে। পড়ার বইয়ে নাক গুঁজে থাকবে। একটু-আধটু [illegible] করবে। মাঝে মাঝে শহরে গিয়ে নাচে যোগ দেবে আর তারপর কোন পুরুষের সঙ্গে অন্ধকারে……

ওর যে মাত্র বাইশ বছর বয়স, ওর দেহের প্রতিটি কোষ আর প্রতিটি রক্তবিন্দু যে স্বাস্থ্যে ভরপুর, তা কি ওর দোষ ?

"তোমার মঙ্গল হোক," ওলেগ্ নিরাসক্ত গলায় বলল।

ওলেগ্ সবে রওনা হয়েছে এমন সময় হঠাৎ নিজের সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গীতে জোয়া ডাকল, "এই, শোনো!" ওলেগ্ ফিরল। "তোমার রাত কাটানোর জায়গা আছে ? আমার ঠিকানা লিখে নাও।"

ওর ঠিকানাও নিতে হবে ? ওলেগ্ হতবুদ্ধির মত তাকাল। "খুব সুবিধাজনক জায়গায় আমার ফ্ল্যাট। একেবারে ট্রলি-কার স্টপেজের কাছে। আমরা মাত্র দুজন থাকি, দিদিমা আর আমি। কিন্তু দুটো ঘর আছে।"

"অশেষ ধন্যবাদ," কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে ওলেগ্ কোন মতে বলল, "কিন্তু আমার মনে হয় না…আচ্ছা, পরিস্থিতি বুঝে স্থির করা যাবে…"

"হ্যাঁ, সব কি আগে থেকে জানা যায় ?" জোয়া হাসল।

তাইগা'র অরণ্যে তবু পথ চিনে চলা যায়, মেয়েদের মন চেনা যায় না। ওলেগ্ আর ক'পা এগোল। সিবগাটভের সঙ্গে দেখা। বেচারী সিঁড়ির

বাঁকে, আলো-বাতাসহীন ভ্যাপসা কোণে, শক্ত বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। বাইরে অত উজ্জ্বল রোদ থাকলেও তার প্রতিফলনের প্রতিফলনই শুধু ওর কাছে পোঁছচ্ছে। চালের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকা সিব্‌গাটভ্ দু'মাসে আরো রোগা হয়েছে।

ওলেগ্ ওর বেডে বসল। "শারফ, গুজব শুনছি নির্বাসিতদের নাকি মুক্তি দেওয়া হবে। 'বিশেষ' এবং 'প্রশাসনিক' দুই শ্রেণীর নির্বাসিতরাই মুক্তি পাবে।"

সিব্‌গাটভ্ মাথা ঘোরাল না। শুধু চোখ ঘোরাল। যেন ওলেগের বক্তব্য কোন মতে ওর কানে ঢুকেছে। "বুঝেছ, শারফ? তার মানে আমি মুক্তি পাব, তুমিও পাবে। আর হেরফের নয়।"

সিব্‌গাটভ্ যেন তাতেও বুঝল না। "তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? তোমার বাড়ী ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?"

সিব্‌গাটভ্ আবার চালের দিকে তাকাল। নিরাসক্ত ভাবে ঠোঁট দুটো খুলল। "আমার বিশেষ লাভ হবে না। আরো আগে হলে ভাল হত।"

ওলেগ্ ওর হাতে হাত রাখল। সিব্‌গাটভের সে হাতটা বুকের ওপর আড় করে রাখা। যেন শব।

নেলিয়া ওদের সামনে দিয়ে তড়িঘড়ি ওয়ার্ডে ঢুকল। "এখানে কোন ডিশ পড়ে আছে?" নেলিয়া হাঁকল। ও তারপর ওলেগ্‌কে দেখতে পেয়ে বলল, "এই যে ঝাঁকড়া চুল রোগী, দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিচ্ছেন না কেন? চটপট সারুন। আমার ডিশগুলো ধুতে নিয়ে যেতে হবে। শুধু আপনার জন্য আটকিয়ে থাকব কেন?"

কি আশ্চর্য! দুপুরের খাওয়ার সময় পেরিয়ে গিয়েছে অথচ ওলেগ্ তা লক্ষ্যও করেনি। ওর সব চিন্তা-ভাবনা ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। ও একটা কথা কিছুতেই বুঝতে না পেরে বলল, "ডিশ নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন, নেলিয়া?"

"কেন হবে না? আমি যে এখন খাদ্য পরিচারিকা। রোগীদের খাবার পৌছই," নেলিয়া সগর্বে বলল, "আমার কোটটা দেখুন না, সাফ-সুতর নয়?"

ওলেগ্ হাসপাতালের শেষ দুপুরের খাওয়া খেতে চলল। নিঃশব্দ, মানব চক্ষুর অন্তরালে, দুরভিসন্ধিপূর্ণ ভাবে রশ্মি-চিকিৎসা ওর ক্ষুধা বোধ জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে। তবু বন্দীর অলঙ্ঘ্য নিয়মানুযায়ী ওর প্লেটে ভুক্তাবশিষ্ট পড়ে থাকতে পারবে না।

"তাড়াতাড়ি সারুন। জল্দি।" নেলিয়া হাঁকল। ও শুধু নতুন কে টই গায়ে দেয়নি, নতুন ঢঙে চুল কোঁকড়া করেছে।

"তোমার ত' দিব্যি রূপ খুলেছে দেখছি।" বিস্মিত ওলেগ্ বলল।

"খুলবেই ত'। আমি আর তিনশো পঞ্চাশ রুবল মাস মাইনের মেঝেয় হামাগুড়ি দেওয়ার মত আহাম্মক নেই। ও একটা কাজ ছিল বটে! একটা ফুটো কোপেক্ও উপরি মিলত না……"

একটুখানি দুঃখ

সময় হয়ে এসেছে। আমার বিদায়ের সময় এসেছে। সমকালীন ব্যক্তি-দের চেয়ে দীর্ঘজীবী বৃদ্ধ যেমন বিষণ্ণ শূন্যতায় ভোগেন. ওলেগেরও তেমনি ঐ সন্ধ্যায় মনে হ'ল ওয়ার্ডে আর আমার স্থান হবে না। সেই পুরানো রোগীরা এমন করে সেই পুরানো প্রশ্নগুলো বারবার আউড়ে চলেছিল যেন প্রশ্নগুলো ইতিপূর্বে উচ্চারিত হয়নি ঃ "আমার কি সত্যিই ক্যানসার হয়েছে? এরা আমাকে সারাতে পারবে না, পারবে? আর কোন্ চিকিৎসায় কাজ হয়, বলতে পারেন?" তবু ওলেগের সব অচেনা লাগছিল।

সবার শেষে, দিনের শেষ দিকে, বিদায় নিল ভাদিম। তেজস্ক্রিয় সোনা এসে গিয়েছিল বলে ওকে রশ্মি চিকিৎসা ওয়ার্ডে বদলি করা হল।

ওলেগ্ বেডগুলোর সমীক্ষা করতে লাগল। অমুক বেডে আদিতে কোন্ রোগী ছিল, তাদের ক'জন মারা গিয়েছে ইত্যাদি। দেখা গেল খুব বেশী রোগী মারা যায়নি।

বাইরে যেমন আরামপ্রদ উষ্ণ, ওয়ার্ডে তেমনি বিশ্রী ভ্যাপসা। তবু ওলেগ্ আধ-খোলা জানলা ছেড়ে বেডে ফিরে চলল। বসন্তের বাতাস জানলার চৌকাঠ পেরিয়ে ওলেগের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। হাসপাতালের এক দিকের দেওয়াল ঘেঁষে ছোট ছোট গৃহস্থ বাড়ীর আঙিনা থেকে বসন্তের সজীব স্পন্দন ভেসে আসছিল। ঐ স্পন্দনের উৎসে কি ঘটছিল ওলেগ্ তা দেখতে না পেলেও তার শব্দ তরঙ্গ ছিল স্পষ্ট—দরজা বন্ধ হওয়া, শিশুর কান্না, মাতালের ধমকা-ধমকি, রেকর্ডে বেজে ওঠা সুর, তারপর সব আলো নিভে যাওয়ার পর ভরাট নারী কণ্ঠে বেদনার আর্তি না সুখের বন্যা তা কে বলবে ঃ—

······সুপুরুষ শ্রমিকের হাত দুটি ধরে

অপরূপা সুন্দরী নিয়ে এল ঘরে······

সব গানের একই বক্তব্য। সবার চিন্তাও তাই। কিন্তু ওলেগের ওতে ডুবলে চলবে না।

এ রাতে ওর শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হবে। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে হবে। তবু ঘুম এল না। এক গাদা অগোছাল চিন্তা, তার কিছু কাজের কিছু অকাজের, দৌড়াদৌড়ি লাগিয়ে দিল ঃ পাভেলের সঙ্গে শেষ না হওয়া তর্কাতর্কি ; শুলুবিনের যে কথা ওকে বলা হয়নি ; ভাদিমের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যে বিন্দুগুলোর ওপর জোর দেওয়া উচিত ছিল ; খুন হওয়া বিটলু-এর মাথা ঃ কাদমিন দম্পতির মুখ ; ওর মুখে শহরের হাজারো অভিজ্ঞতার কথা শুনতে তন্ময় এবং ওর অনুপস্থিতিতে ওদের গ্রামের যা কিছু খবর হয়েছে এবং ওঁরা রেডিওতে কি কি কনসার্ট বাদন শুনেছেন ইত্যাদি বলতে ব্যগ্র কাদমিনদের মুখ ইত্যাদি। ঐ ছোট্ট, নিচু কুটীরটাই যেন ওদের তিনজনের

জগত। আঠারো বছর বয়স্কা ইনা স্ট্রোয়েম-এর গুমোর আর ঔদাসীন্যে ভরা মুখও মনে পড়ল। ওলেগ্ আর আগ বাড়িয়ে ইনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারবে না। ভেরা আর জোয়ার ফ্ল্যাটে রাত্রিবাসের আমন্ত্রণও মনে এল। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা—ওলেগ্ তার কি ব্যাখ্যা করবে?

যে হিম-শীতল জগতে ওলেগের মন গড়ে উঠেছে সেখানে অপরিকল্পিত দয়ার স্থান নেই। ঐ বস্তুটির অস্তিত্বও ওলেগ্ ভুলে গিয়েছে। স্রেফ দয়ালু অন্তঃকরণই ভেরা আর জোয়ার ওকে রাত্রিবাসের আমন্ত্রণ জানানোর সম্ভাব্য কারণ মনে হয় না। তবে ওদের মনে কি আছে? ওরা কি আশা করে? ওলেগ্ উত্তর পেল না।

সিগারেটের জন্য আঙুল দুটো নিশপিশ করছিল। কয়েক বার এপাশ-ওপাশ করে ওলেগ্ উঠে পড়ল। বেড়াতে চলল।

সিঁড়ির বাঁকে আলো-আঁধারি। দরজার পাশেই সিব্‌গাটভ যথারীতি ওষুধ মেশানো দ্রবণের গামলায় বসে নিজের নিতম্ব সুরক্ষায় সচেষ্ট। ওর ধৈর্য থাকলেও, আশা নেই। অশা হীনতার পর্দা ওকে ঘিরে ধরেছে।

সিব্‌গাটভের দিকে পেছন করে, ডিউটি নার্সের টেবিলে এক খর্বকায়, সরু কাঁধ, সাদা কোট পরা স্ত্রীলোক টেবিল ল্যাম্পের কাছে নিচু হয়ে কিছু করছিল। ও নার্স নয়। আজ তুর্গুন-এর ডিউটি। তুর্গুন সম্ভবত ডাক্তারদের আলোচনা কক্ষে ঘুমোচ্ছে। স্ত্রীলোকটি অতিশয় শালীন চশমা পরা পরিচারিকা, এলিজ ভেতা আনাতোলিয়েভ্না। ও সন্ধ্যে বেলায় করণীয় কাজগুলো সেরে, পড়ছিল।

হাসপাতালে দু মাস থাকাকালীন ওলেগ্ লক্ষ্য করেছে যে এই চটপটে এবং বুদ্ধিমতী পরিচারিকাটি রোগীদের বেডের তলায় গুঁড়ি মেরে ঢুকে মেঝে সাফ করত। ও ওলেগোর বুট জোড়া লুকিয়ে এক পাশে সরিয়ে রেখে দিত। ওয়ার্ডের ভেতরে বাইরের জুতো নিয়ে আসার জন্য রাগারাগি করত না। ও মেঝেতো মুছতই, মেঝের ওপর দেওয়ালের অনেকটাই মুছত। পিকদানিগুলো মুছে ঝকঝকে করে দিত। রোগীদের লেবেল লাগানো জার বিতরণ করত। যে ভারী, নোংরা বা অসুবিধা জনক জিনিষগুলো নার্সরা ছুঁতো না, ও অক্লেশে সে সব বয়ে নিয়ে যেত।

ও যত বিনা আপত্তিতে কাজ সারত হাসপাতালের সবাই তত কম ওর সম্পর্কে খেয়াল রাখত। দু হাজার বছরের পুরানো প্রবাদ বাক্য বলে, চোখ থাকলেই দেখা যায় না।

কিন্তু কঠোর জীবন যাত্রা দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নতি ঘটায়। ক্যানসার ওয়ার্ডে এমন কিছু মানুষ ছিল যারা পরস্পরকে ঠিকই চিনেছিল। ঝকঝকে ইউনিফর্ম, কাঁধে বা বাহুতে পদ মর্যাদা সূচক পটি না থাকলেও চিনে নিতে অসুবিধে হয়নি। যেন ওদের কপালের উজ্জ্বল নিশানা অথবা হাত কিংবা পায়ে কোন দাগ দেখে চেনা যেত। (বাস্তবে, অবশ্য, অনেক লক্ষণই ছিল: কোন এক

প্রসঙ্গে উচ্চারিত দু'-একটি শব্দ ; ঐ শব্দটি উচ্চারণের ভঙ্গী ; কথার মাঝে দুঠোট মিলে আঁট হয়ে যাওয়া ; আর সবাই যখন প্রাণ খুলে হাসছে কিংবা গম্ভীর হয়ে আছে, তখন একটু মুচকি হাসি) উজবেক্ আর কারা-কাল্-পাক্‌রা অনায়াসে হাসপাতালে পরস্পরকে চিনতে পারত, আর তেমনি প্যারত তারা যারা এখনো কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে থেকেছে।

ওলেগ্ আর এলিজাভেতা অনেক আগেই পরস্পরকে চিনেছিল, আর দুজনে দু'জনকে সব সময় বোধগম্য ভাবে অভিবাদন করত। ওরা, অবশ্য, কখনো তেমন ভাবে কথা বলার সুযোগ পায়নি।

এলিজাভেতা যাতে চমকিয়ে না ওঠে সেজন্য ওলেগ্ চটির শব্দ তুলে হাটতে হাঁটতে ওয়ার্ডে বলে উপস্থিত হ'ল। "শুভ সন্ধ্যা, এলিজাভেতা আনাতোলিয়েভনা।"

এলিজাভেতা চশমা ছাড়া পড়ছিল। ও মাথা ঘোরাল। ওর মাথা ঘোরানো পৃথক ধরনের। কর্তব্য সম্পাদন করতে প্রস্তুত। "শুভ সন্ধ্যা," ও মর্যাদা সহ হাসল। বয়স্ক মহিলারা অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে ঐ রকম হেসে থাকেন।

ওরা সহজ ভাবে পরস্পরকে দেখল। যেন দু'জনে দু'জনকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু ওরা দু'জনে দু'জনকে কি না সাহায্য করতে পারে।

ওলেগ্ নিজের ঝাঁকড়া চুলওলা মাথা একটু নিচু করে ভাল করে এলিজাভেতার বইটা দেখল। "আরেকটা ফরাসী বই, তাই নয় ? কি বই এটা ?"

"এটা ক্লোদ্ ফেরর-এর লেখা একটা বই।"

"ফরাসী ভাষার বইগুলো কোথা থেকে জোগাড় করেন ?"

"এ শহরে বিদেশী ভাষার বইয়ের একটা গ্রন্থাগার আছে। তাছাড়া এক বৃদ্ধা এই বইগুলো ধার দেন।"

ওলেগ ত্যারছা নজরে বইটা দেখল, যেন কোন কুকুর পড়ে থাকা পাখীকে শুঁকে দেখছে। "শুধু ফরাসী বই পড়েন কেন ?"

চোখ আর ঠোঁট ঘিরে রেখার জাল থেকে এলিজাভেতার বয়স কষ্ট ভোগের ব্যাপ্তি আর বিচক্ষণতা প্রকট হয়। "এ বইগুলোয় অত দুঃখ হয় না, তাই পড়ি," এলিজাভেতা বলল। ও জোরে কথা বলে না। প্রতিটি শব্দ নরম ভাবে উচ্চারণ করে।

"দুখে অত ভয় কেন ?" ওলেগ্ বলল। ওর দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে দেখে এলিজাভেতা একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

"আমার ধারণা, গত দু'শো বছর ধরে আমরা রুশরা প্যারীর জন্য আহা-উহু করছি। আর কত কাল তা চলবে বলতে পারেন ? এত আহা-উহুতেও আমাদের কান ফাটল না।" ওলেগ বিরক্তি প্রকাশ করল। "আমাদেরই রুশদের প্যারীর প্রতিটি অলিগলি, কাফে মুখস্থ থাকতে হবে। শুধু নিজের বিরক্তি দেখাতে আমি কোন দিনই প্যারী যাব না !"

"কোন দিন না?" এলিজাভেতা হেসে উঠল। ওলেগও। "আপনি বরং নির্বাসনে যাবেন, কি বলেন?" ওরা আবার এক সঙ্গে হেসে উঠল।

"আমি ঠিকই বলছি," ওলেগ্ গজ্‌গজ্ করল, "আমাদের নেতারা যত তুচ্ছ কথা অনবরত কিচির-মিচির করে চলেছে, অকারণ রাগ আর উত্তর প্রত্যুত্তরে ফেটে পড়ছে। এখন ওদের দু'এক ধাপ টেনে নামিয়ে জিজ্ঞেস করার সময় এসেছে, 'বন্ধুগণ, কঠোর শ্রম দন্ড বস্তুটি চেখে দেখবেন নাকি? তরি-তরকারি বিহীন ন্যাড়া কালো রুটির আস্বাদ গ্রহণ করবেন নাকি?"

"এটা অনুচিত। আমি বলতে চাই, ওঁরা যেহেতু এ যাবৎ কালো রুটি এড়াতে পেরেছেন ওঁরা তার যোগ্যও বটে।"

"তা হতে পারে। হয়ত আমি স্রেফ হিংসুটে। তবু আমি মনে করি ওদের বেশ ক'ধাপ টেনে নামানো দরকার।"

ওলেগ্ চেয়ারে বসে উশখুশ করছিল। যেন ওর লম্বা দেহটা ওর পক্ষে অতি গুরুভার। ও হঠাৎ কোন ভনিতা ছাড়াই সহজে, সোজা প্রশ্ন করল "আপনি কি .... স্বামীর জন্য না নিজের জন্য?"

এলিজাভেতাও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি জবাব দিল, যেন ওকে ওর ডিউটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। "আমাদের গোটা পরিবারের জন্য। তবে কে কার জন্য সাজা পেয়েছে, তা জানি না।"

"আপনার পরিবারের সবাই কি এখনো এক সঙ্গে আছে?"

"না। আমার মেয়ে নির্বাসনেই মারা গিয়েছে। যুদ্ধের পর আমরা এই শহরে চলে এসেছি। তারপর আমার স্বামীকে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করা হ'ল ওকে শিবিরে নিয়ে গেল।"

"আপনি এখন একাই থাকেন?"

"না। আমার একটা ছেলে আছে। আট বছর বয়স।"

ওলেগ্ এলিজাভেতাকে দেখল। মুখ বেদনা-কম্পিত নয়। কেনই বা বেদনা-থরথর হবে? এ ত' নেহাৎ দৈনন্দিন কাজের কথাবার্তা। "আপনার স্বামীকে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করল কখন, ১৯৪৯-এ?" "হ্যা।"

"আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম। তারপর কোন্ শিবিরে চালান করল?"
"তাইশেৎ স্টেশন শিবিরে।"

ওলেগ্ মাথা হেলাল। "আমি চিনতে পেরেছি। ওটাকে 'হ্রদ শিবির'ও বলা হয়। লেনা নদীর ধরে শিবির। কিন্তু ওর ঠিকানা তাইশেৎ স্টেশন।"

"আপনিও কি ঐ শিবিরে ছিলেন?" এলিজাভেতা আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না।

"না। আমি শুধু ঐ শিবিরের কথা শুনেছি। বন্দীদের মধ্যে কখনো কখনো দেখা হয়ে যায় কিনা।"

"আমার স্বামীর পদবী দুজার্বস্কি। আপনার কি ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে? কখনো হয়নি?"

এলিজাভেতার তবু আশা। হয়ত ওলেগোর ওর স্বামীর সঙ্গে কোথাও দেখা হয়েছে·········একটু চেষ্টা করলেই মনে পড়বে·········পদবী দুজারস্কি ········· ওলেগ্ শব্দ করে ঠোঁট চাটল। না, দেখা হয়নি। সবার সঙ্গে সবার দেখা হয় না।

"ওকে বছরে মাত্র দু'টো চিঠি লিখতে দেয়," এলিজাভেতা অভিযোগ করল। ওলেগ্ এবারও মাথা হেলাল। এ ত' পুরানো কাহিনী।

"গত বছর মাত্র একটা চিঠি পেয়েছি, মে মাসে। তারপর আর পাইনি ·········" এলিজাভেতা মেয়েছেলে। একটা মাত্র আশার সূত্র হলেও ও তাই অবলম্বন করে আছে

"ওথেকে, অবশ্য, কিছুই বোঝা যায় না," ওলেগ্ বোঝানোর চেষ্টা করল, "প্রতি বন্দীকে যদি বছরে দু'টো চিঠি লিখতে দেওয়া হয় তাহলে মোট কতগুলো চিঠি হয় ভাবুন ত'? চিঠি পরীক্ষকরা দারুন আলসে। স্পাস্ক্ শিবিরে গ্রীষ্মকালে চিঠি পরীক্ষা দপ্তরের ফায়ারপ্লেস পরিষ্কার করতে গিয়ে এক বন্দী শ'দুয়েক ডাকে না পাঠানো চিঠি পেয়েছিল। পরীক্ষকরা চিঠি-গুলো পোড়াতে ভুলে গিয়েছিল।"

ওলেগ্ বাস্তব পরিস্থিতি যথা সম্ভব সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করল। ঐ অবস্থা এত বেশী দিন ধরে চলছে যে এলিজাভেতার এত দিনে ওতে অভ্যস্ত হওয়ার কথা। এলিজাভেতা তবু উন্মত্ত, সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

সবারই শেষে সবকিছুতে বিস্মিত ভাব চলে যাওয়ার কথা। তবু কেউ কেউ অবাক হয়।

"আপনার ছেলেটি কি নির্বাসনে জন্মেছিল?" এলিজাভেতা মাথা হেলাল।

"এখন আপনার নিজের সামান্য মাইনেয় ছেলেকে মানুষ করতে হচ্ছে; অথচ আপনাকে কেউ ভাল কাজও দেবে না। সব জায়গায় আপনার অতীত খুঁড়ে দেখবে, তাই ত'? কোথায় থাকেন, কোন বস্তিতে?"

প্রশ্নের আকারে হলেও ওলেগের প্রশ্নে কোন কৌতূহলের বালাই ছিল না। ওগুলো এত বাস্তব যে তা উচ্চারণ করতেও বিরক্তি আসে। চিরস্থায়ী হাস-পাতালের কাপড়-চোপড় কাচা, মেঝে মোছা আর অবিশ্রাম জল ফোটানোয় ক্ষত-বিক্ষত এলিজাভেতার ছোট ছোট হাত দুটো ধারগুলো জীর্ণ হয়ে আসা বিদেশী কাগজে সুশ্রী ঢঙে, ছোট ছোট হরফে ছাপা, আর মোলায়েম মলাটে মোড়া শোভন দর্শন ফরাসী বইয়ের ওপর রাখা।

"বস্তিতে থাকাই যদি আমার এক মাত্র সমস্যা হত!" এলেজাভেতা বলল, "আরো বড় অসুবিধে হ'ল, আমার ছেলেটা বড় হচ্ছে। ও বেশ বুদ্ধিমান, সবকিছু জানতে চায়। ওকে কি করে মানুষ করব বলতে পারেন? সব সত্যি কথার ঝাঁপি খুলে দেব? সে সত্য এত গুরুভার যে তার চাপে যেকোন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ চাপা পড়ে যাবে। বয়স্ক মানুষের পাঁজর ভেঙে যাবে। না,

সত্য গোপন করে জীবনের সঙ্গে আপোষ ঘটাব ? তা কি ঠিক হবে ? ওর বাপ তাতে কি বলবে ? তাতেও কি একটুও সফল হব ? আর যাহোক, ছেলেটার নিজেরই ত' চোখ আছে। ও সেই চোখ দিয়ে দেখতে পায়।"

"সত্যের ঝাঁপি উন্মুক্ত করে দিন!" ওলেগ্ টেবিল চাপড়াল। ও যেন কত ছেলে মানুষ করেছে, এবং সে কাজে ওর কোথাও সামান্য ভুল হয়নি।

এলিজাভেতা দু'হাতে মাথার টুপির ওপর দিয়ে রগ চেপে ধরল। দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা। ওর মনের গভীরে নাড়া লেগেছে।

"বাপ ছাড়া ছেলেকে মানুষ করার যে কত অসুবিধে," এলিজাভেতা বলল, "শিশুর সব সময় একটা অবলম্বন প্রয়োজন হয়। তার কাছে পথ নির্দেশ পায়, তাই নয় ? আমার ছেলের সে অবলম্বন কোথায় ? আমি অনবরত কিছু না কিছু ভুল করি, এমন কিছু করি যা করা অনুচিত…"

ওলেগ্ জবাব দিল না। এ ধরনের অভিযোগ শোনা ওর প্রথম নয়। কিন্তু তবু ও তার যৌক্তিকতা খুঁজে পেল না।

"তাই আমি ফরাসী উপন্যাস পড়ি। সব সময় নয়, কেবল রাতে ডিউটির সময় পড়ি ; ফরাসীরা আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুপ করে থাকে কিনা, কিংবা ওদের বইয়ের বাইরের জগত আমাদেরই মত নিষ্ঠুর কিনা বলতে পারব না। আমি জগৎ সম্পর্কে অনবহিত হয়ে বইয়ে শান্তি খুঁজি।"

"নেশা ধরানো ওষুধের মত ?"

"বরং আশীর্বাদের মত," এলিজাভেতা মাথা ঘোরাল। সাদা টুপি পরা এলিজাভেতাকে সন্তনীর মত লাগছিল। "আমাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এমন কোন বই আমি জানি না, যা পড়ে আমি বিরক্তি বোধ করব না। কিছু লেখক ত' পাঠককে নিরেট আহাম্মক ধরে নেয়। কিছু লেখক, অবশ্য, সত্যি কথাই লেখেন, এবং তাঁরা তাঁদের কীর্তিতে রীতিমত গর্বিত। কোন্ মহাকবি ১৮০০ সালে কোন্ অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন, কিংবা কোন্ মহাকবি তাঁর কাব্যের অমুক পৃষ্ঠায় কোন্ মহিলা সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করেছেন, এই ধরনের বিষয়ে আমাদের লেখকরা গভীর তত্ত্বানুসন্ধান করে থাকেন। ঐসব গবেষণা হয়ত সহজসাধ্যও নয়। কিন্তু ঐ গবেষণাগুলি নিঃসন্দেহে নিরাপদ। হ্যাঁ, একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট। ও'রা নিরাপদ গবেষণা বেছে নিয়ে আমাদের করেছেন অবহেলা, অর্থাৎ আজও জীবন্ত এবং দুর্দশা পীড়িত আমাদের।"

যৌবনে হয়ত এলিজাভেতার নাম ছিল লিলি। তখন ওর দু'নাকের গোড়ায় চশমার দাগ ছিল না। ঐ বয়সে ও হয়ত চোখ মটকিয়ে হেসেছে, খিলখিলিয়ে হেসেছেও। সে জীবনে লাইলাক ফুল আর লেসের অভাব ছিল না; হয়ত প্রতীকবাদী কাব্যেরও কিছু যোগান ছিল। তখন অবশ্যই কোন বেদে গণৎকার ওর হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেনি যে রুশ সাধারণতন্ত্রভুক্ত কোন এশীয় দেশে ওর ধোবানী আর চাকরাণীর কাজ করে জীবন কাটাতে হবে।

"আমাদের জীবনের দুঃখময় নাটকগুলোর তুলনায় বিয়োগান্ত সাহিত্য-গুলো নিতান্তই হাস্যকর," এলিজাভেতা বলল। "আইডা অন্ততঃ তার প্রিয়তমর সঙ্গে মরণে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। আর আমরা ত' আমাদের স্বামীর কি হচ্ছে তা জানতেও চাই না। যদি আমি 'হুদ শিবির'-এ যাওয়ার চেষ্টা করতাম···"

"যাবেন না। কোন লাভ হবে না।"

"স্কুলের ছাত্রর আন্না কারেনিনা'র অসুখী, বিয়োগান্ত, ধ্বংসোন্মুখ এবং আরো কত নাম-না-জানা দুঃখময় জীবন নিয়ে রচনা লেখে। কিন্তু আন্না কি সত্যিই অসুখী? আন্না কাম চেয়েছে, কামের মূল্য চুকিয়েছে—ওকে ত' সুখীই বলা চলে। ও ছিল এক স্বাধীন এবং গর্বিত নারী। কিন্তু যে বাড়ীতে আপনার জন্ম, যে বাড়ীতে আপনি বাস করেন, সেখানে যদি স্বাভাবিক শান্তির সময় একগাদা গ্রেটকোট আর টুপি পরা মানুষ ঢুকে পড়ে আপনার পরিবারের সবাইকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শুধু ঐ বাড়ী নয় শহর ছেড়ে যেতে হুকুম করে, আর পরিবারের সবার দুর্বল হাতক'টা যে সামান্য কিছু বইতে পারে শুধু সেইটুকু নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়, সে পরিস্থিতিকে কি বলবেন?"

যতটুকু অশ্রুপাত সম্ভবপর এলিজাভেতার চোখ অনেক তা করেছে। এখন আর এক বিন্দুও অশ্রু পড়ল না। ঐ শুকনো চোখে শুধু আসা সম্ভব তীক্ষ্ন অগ্নি শিখা। জগতের প্রতি ওর শেষ ধিক্কার!

"আপনি তখন মরীয়া হয়ে পথের লোকজনকে ডেকে ডেকে আপনার জিনিষপত্র কিনতে বলবেন, অর্থাৎ জিনিষপত্রের বিনিময়ে রুটি কেনার জন্য সামান্য কয়েক কোপেক্ ছুঁড়ে দিতে অনুনয় করবেন। এবার হাজির হবে লাজ-লজ্জার বালাইহীন কালো বাজারীরা; ওরা সব জানে, শুধু জানে না যে ওদের ওপরও এক দিন বাজ ভেঙে পড়বে। আর ঠিক আগের মুহূর্তে হয়ত আপনার মেয়েটি চুলে রিবন বেঁধে পিয়ানোয় মোজার্ট-এর সুর বাজাতে বসেছিল; সে বেচারী চোখ ভরা কান্না নিয়ে অসহায় ছোটাছুটি করতে লাগল। অতএব আমি কেন আন্না কারেনিনা পড়তে যাব? আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাই কি যথেষ্ট নয়? লোকে আমাদের কথা কবে পড়বে? আরো একশো বছরেও কি তা হবে?"

এলিজাভেতা প্রায় চিৎকার করছিল। কিন্তু অনেক বছরের অভ্যস্ত ভীতি চিৎকার করতে দিল না। ও কাঁদতেও পারে না। ওর চিৎকার শুনল শুধু ওলেগ্। আর হয়ত রাসায়নিক দ্রবণের গামলায় উপবিষ্ট সিব্‌গাটভ্।

এলিজাভেতার কাহিনী তেমন সাল-তারিখ সমৃদ্ধ নয়। তবু তা ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করার এতটুকু অসুবিধে নেই। ওলেগ্ বলল, "১৯৩৫-এর লেনিনগ্রাদ মনে পড়ে?" "কি করে বুঝলেন আমি লেনিনগ্রাদের মানুষ?"

"লেনিনগ্রাদের কোনখানে থাকতেন?" "ফুরস্তাদস্কায়া স্ট্রীটে,

এলিজাভেতা কথাটা উচ্চারণ করতে যেন একটু তৃপ্তি পেল। "আপনি কোথায় থাকতেন?"

"জাখুরিয়েভ্স্কায়াতে থাকতাম। আপনাদের রাস্তার গায়েই।" "হ্যাঁ, ঠিক তাই···আপনি তখন কত বড়?"

"চোদ্দ বছর।" "তখনকার কিছু আপনার মনে পড়ে?"

"সামান্যই মনে আছে।" "আপনার ভাল মনে নেই—বলেন কি? সে যেন এক ভূমিকম্প হ'ল। সব বাড়ী-ঘরের দরজা হাট করে খোলা। যে যা পারল নিয়ে পালাল। প্রশ্ন করার কেউ ছিল না। ওরা শহরের এক চতুর্থাংশকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল। আপনার মনে পড়ছে না?"

"হ্যাঁ, মনে আছে," ওলেগ্ বলল, "তার চেয়ে লজ্জার কথা হল, ঐ সময় অতবড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটার দিকে কেউ তাকালই না। লেনিনগ্রাদ জনশূন্য করার যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তার কথা ওরা স্কুলে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিল বটে।"

এলিজাভেতা রাশ টানটান করে রাখা ঘোড়ার মত মাথা এদিক-ওদিক ফেরাল। "সবাই লেনিনগ্রাদ অবরোধের (হিটলারের বাহিনী দ্বারা) কথা বলে থাকে। কবিতাও লেখা হয়। কর্তৃপক্ষ তা উৎসাহিত করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এমন ভাব দেখায় যেন ঐ অবরোধের আগে লেনিনগ্রাদে তেমন কোন ঘটনাই ঘটেনি।"

ওলেগের আরো কিছু মনে পড়ল। সে রাতে সিবগাটভ্ যথারীতি রাসায়নিক দ্রবণের গামলায় বসেছিল। এলিজাভেতা এখন যে চেয়ারে বসে, সেখানে বসেছিল জোয়া। এই রকমই টেবিল ল্যাম্প জ্বলছিল। তখনো ওরা দু'জন লেনিনগ্রাদ অবরোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছিল। আর কি নিয়ে বা গল্প করত? আর অবরোধ-পূর্ব ঘটনাবলী আলোচনা······

এক হাতের তেলোর ওপর আড়ভাবে মাথা রাখা ওলেগ্ সখেদে এলিজাভেতার দিকে তাকাল। "সত্যিই লজ্জাকর," ও শান্ত স্বরে বলল, "কিন্তু আমরাই বা মুখ বুজে ছিলাম কেন? আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সবশেষে যখন আমাদের নিজের ওপর আঘাত এল তখনো কেন চুপ করে রইলাম? ওটাই কি আমাদের আসল স্বভাব?"

নিজের দুঃখ-দুর্দশাকে আনুপাতিক হিসেবের চেয়ে বেশী বড় করে দেখার জন্য হঠাৎ ওলেগের লজ্জা হ'ল। নারী পুরুষের কাছে কি চায়? কি তার ন্যূনতম চাহিদা? ওলেগ্ এ যাবৎ ভেবেছে মানব জীবন ঐ প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভরশীল, এবং রুশ দেশ ঐ প্রশ্নটি থেকে পৃথকভাবে কোন দুঃখ সহ্য করেনি, কোন সুখও উপভোগ করেনি। নতুন উপলব্ধির ফলে ওলেগ্ লজ্জা পেল বটে, শান্তিও পেল। এলিজাভেতার দুঃখ ওর দুঃখ ধুয়ে মুছে নিয়েছে।

"ঐ ঘটনার সামান্য ক'বছর আগে," এলিজাভেতার মনে পড়ল, "ওরা লেনিনগ্রাদের সব ক'টা অভিজাত পরিবারের মানুষকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল।

তা, বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ হবে বৈকি। তখনো কি আমাদের হুঁশ হয়েছিল? প্রাক্তন অভিজাত বলতে ছিল কারা?—যত বুড়ো, শিশু আর অসহায় মানুষের দল। আমরা এসব জেনেও স্রেফ তাকিয়ে দেখেছি, ওদের জন্য কিছু করিনি। তখনো আমাদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়েনি যে।"

"আপনারা ওদের পিয়ানোগুলো কিনে নিয়েছিলেন?" "হয়ত কিনে-ছিলাম···হ্যাঁ, কিনেছিলাম।"

ওলেগ্ এলিজাভেতাকে ভাল করে দেখল। এলিজাভেতার বয়স এখনো পঞ্চাশ হয়নি। তবু যে কেউ ওকে বৃদ্ধা বলবে। ওর মাথার টুপির ফাঁক দিয়ে এক গোছা বৃদ্ধার মত মসৃন চুল ঝুলছে, যা কিছুতেই কোঁকড়ানো যাবে না।

"আপনাকে কেন নির্বাসন দিয়েছিল? কোন্ অভিযোগে?" ওলেগ্ বলল।

"ওদের অভিযোগের কথা ভাবতে বয়ে গেছে। 'সমাজ-ক্ষতিকর', কিংবা 'সমাজ-বিপজ্জনক', এই ধরনের কয়েকটা সুবিধাজনক শব্দ সমাবেশ ঘটালেই ত' কাজ হত। ওসব বিশেষ হুকুম অনুযায়ী করা হত। দারুণ সহজ ব্যাপার। কোন বিচারের বালাই নেই।"

"আপনার স্বামী, তিনি কি করতেন?"

"বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতেন না। লেনিনগ্রাদ ফিলহারমনিক-এ বাঁশী বাজাতেন। একটু বেশী মদ পেটে গেলে খুব কথা বলতেন।"

ওলেগের নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। এলিজাভেতার মতই অকাল-বৃদ্ধা, আচরণে যথাযথ এবং সম্ভ্রান্ত, আর স্বামী হারিয়ে একই রকম অসহায়।

ওলেগ্ এই শহরের বাসিন্দা হলে ওর ছেলেকে ঠিক পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে এলিজাভেতাকে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু, হায়, ওরা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ কীটাণু মাত্র।

"এক পরিবারকে আমরা চিনতাম," এলিজাভেতা বলল। বেচারী এত কাল কথা বলতে পারেনি, এবার সুযোগ পেয়ে ওর সব কথা উজাড় করে দেবে। "······এক পরিবারকে চিনতাম। ওদের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল। দুজনই সাবালক, এবং কমসোমল-এর [কমিউনিস্ট যুব লীগ] সক্রিয় সদস্য। হঠাৎ এক দিন শোনা গেল ঐ পরিবারের সবাইকে নিবাসনে পাঠানো হবে। ভাইবোন কমসোমল আঞ্চলিক দপ্তরে দেখা করে বলল, 'আমাদের বাঁচাও!' ওরা জবাব দিল, 'নিশ্চয় তোমাদের বাঁচাব। কিন্তু বাঁচতে হলে এই কাগজের টুকরোটায় এই কথাগুলো লিখে সই করে দাও: আজকের তারিখ থেকে আমি অমুক বাপ-মায়ের ছেলে বা মেয়ে হিসেবে পরিচিত হতে চাই না। আমার বাপ-মা সমাজ-হানিকর ব্যক্তি, অতএব তাদের এতদ্বারা বর্জন করছি। আমি অঙ্গীকার করছি ভবিষ্যতে ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গে কোন প্রকার, এমন কি পত্রাদিরও, সম্পর্ক রাখব না'।"

ওলেগের মাথা সামনে ঝুঁকে পড়ল। ওর হাড়ওলা কাঁধদুটো জেগে উঠল। "অনেক লোকই ঐ ধরনের কাগজপত্রে সই করেছে……" ওলেগ বলল।

"তা বটে, কিন্তু ঐ ভাই-বোন বলল, 'আমরা এ ব্যাপারে একটু ভেবে দেখতে চাই'। ওরা বাড়ী ফিরে ওদের কমসোমল-এর কার্ড উনুনে পুড়িয়ে দিয়ে নির্বাসনে যাওয়ার জন্য গোছ গাছ করল।"

সিবগাটভ নড়ে উঠল। ও নিজের বেড ধরে দ্রবণের গামলা থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। এলিজাভেতা তড়িঘড়ি চলল। দ্রবণের গামলা পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

ওলেগও উঠল। বেডে ফেরার আগে ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল।

নিচের তলার বারান্দা দিয়ে যেতে গিয়ে ডিওমকার ঘর পড়ল। ঐ ঘরে ডিওমকা ছাড়া একটি অপারেশন হওয়া রোগী ছিল। সে সোমবার মারা গিয়েছে। তার জায়গায় অপারেশনের পর শুলুবিনকে রাখা হয়েছে।

ঘরের দরজা সাধারণতঃ আঁট করে বন্ধ রাখা থাকে। কিন্তু তখন ভেজানো ছিল। অন্ধকার। অন্ধকারে কষ্টে নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। নার্স হয় ঘুমোচ্ছে নয় অন্য ঘরের রোগীদের দেখাশোনা করতে গিয়েছে। ওলেগ দরজা আরেকটু খুলে ভেতরে ঢুকল।

ডিওমকা গাঢ় ঘুমে ডুবে আছে। শুলুবিন কষ্টে নিঃশ্বাস নিতে নিতে গোঙাচ্ছে।

ওলেগ একটা কপাট ভাল করে খুলল। বারান্দার আলো ভেতরে এল। ওলেগ এগিয়ে গেল। "আলেক্সি ফিলিপোভিচ……" ও ডাকল।

কষ্টে শ্বাস নেওয়া থামল। "আলেক্সি ফিলিপোভিচ……আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?"

"কি?" শুলুবিন শ্বাস টেনে বলল।

"আপনার কষ্ট হচ্ছে? ওষুধ খাবেন? ……বাতি জেলে দেব?"

"কে?" ভয় পাওয়া শুলুবিন শ্বাস ফেলে কাশতে লাগল। কাশতে কষ্ট হল। ফলে গোঙানিও এল।

"আমি ওলেগ…ওলেগ কস্টোগলোটভ।" ও শুলুবিনের বেডে ঝুঁকে পড়ল। বালিশের ওপর শুলুবিনের বড় আকারের মাথা দেখা যাচ্ছিল। "আপনার জন্য কি করতে হবে বলুন……নার্সকে ডেকে দেব?"

"কি-ছু-না," শুলুবিন কোন মতে বলল। ও আর কাশল না। গোঙালও না। ওলেগ ওকে আরো ভাল করে দেখতে পেল। বালিশের ওপর কয়েকটা চুলের গোছাও দেখতে পেল।

"আমার সবকিছুর মৃত্যু হবে না,' শুলুবিন ফিসফিস করে বলল, "আমার সবকিছুর মৃত্যু হবে না।" [পুশকিনের কবিতার উদ্ধৃতি]

লোকটা নির্ঘাৎ প্রলাপ বকছে। ওলেগ অন্ধকারে হাতড়িয়ে কম্বলের

ওপর পড়ে থাকা শুলুবিনের একটা গরম হাত পেল। ও সেই হাতে আলতো চাপ দিল। "আলেক্সি ফিলিপোভিচ, আপনাকে বাঁচতেই হবে। হাল ছাড়বেন না, আলেক্সি ফিলিপোভিচ।"

"একটা টুকরো, তাই না? ……একটি কণিকা মাত্র হলেও তা বিদ্যমান," শুলুবিন ফিসফিস করল।

ওলেগের হঠাৎ মনে হ'ল শুলুবিন মোটেই প্রলাপ বকছে না, বরং ওকে অপারেশনের আগের কথোপকথন স্মরণ করাচ্ছে। শুলুবিন তখন বলেছিল, "জানেন, আমি মাঝে মাঝে পরিষ্কার অনুভব করি যে আমার ভেতরে শুধু আমিই নেই। আরো কিছু আছে যা মহান এবং অক্ষয়……বিশ্ব চেতনার এক কণিকা মাত্র। আপনিও তাই অনুভব করেন না?"

সৃষ্টির প্রথম দিন

ভোর বেলায় সবাই ঘুমোচ্ছিল। ওলেগ্ নিঃশব্দে উঠল, বিছানা গোছগাছ করল, হাসপাতালের নিয়ম মাফিক কম্বল ভাঁজ করে রাখল, আর বুট পায়ে পা টিপে ওয়ার্ড থেকে বেরোল।

খোলা পাঠ্য বইয়ের ওপর দু'হাত এবং দু'হাতের ওপর কালো চুলে ঠাসা মাথা রেখে তুর্গুন ডিউটি নার্সের টেবিলে ঘুমোচ্ছিল।

নিচতলার বৃদ্ধ পরিচারিকা বাথরুমের দরজা খুলে দিল। ওলেগ্ হাসপাতালের পোষাক ছেড়ে নিজের পোষাক পরল। দু'মাস ভাঁড়ারে রাখার ফলে নিজের পোষাকও অদ্ভুত লাগল। নিজের পোষাক বলতে ওর ছিল পুরানো প্যান্ট, তার সঙ্গে ফৌজ থেকে পাওয়া ঘোড়ায় চড়ার ব্রিচেস্, তুলো আর পশম মেশানো জামা আর গ্রেটকোট। ওলেগ্ শিবিরে থাকাকালীনও ঐ পোষাকগুলো শিবিরের ভাঁড়ারে থাকত বলে তেমন জীর্ণ হয়নি। ওর শীত কালের টুপিটা অসামরিক ধরনের, উশ্-টেরেকে কেনা, কিন্তু মাথার চেয়ে ছোট মাপের। দিনটা গরমই হবে মনে হ'ল। ওলেগ্ টুপি পরল না। তাছাড়া ঐ টুপি পরে কাকতাড়ুয়ার মত দেখানোর ভয়ও ছিল। ও প্যান্টের ওপর বেল্ট আঁটল, গ্রেটকোটের ওপর নয়। পথচারীরা ওকে দেখলে মনে করত সবে ফৌজের চাকরি থেকে ছুটি পাওয়া কোন সৈন্য, কিংবা পাহারাদারীর কাজ থেকে ফেরার সৈন্য। চামড়ার পুরানো থলেতে টুপিটা ঢোকাল। থলের এখানে ওখানে তেলের দাগ লাগা, গোলার আঘাতে ক্ষত হওয়া আর পুড়ে যাওয়া দুটো জায়গা সেলাই করে দেওয়া। ঐ থলেটাই রণাঙ্গনে ওর কাছে ছিল এবং কারাগারে কয়েদ অবস্থায় ও পিসির মাধ্যমে

থলেটাকে কারাগারে আনিয়ে নিয়েছিল। ও ঠিক করেছিল কোন ভাল জিনিষ নিয়ে বন্দী চালান শিবিরে যাবে না।

হাসপাতালের পোষাক ছেড়ে নিজের পোষাক পরে, তা হতশ্রী হয়ে গেলেও, বেশ ফূর্তি এল। মনে হ'ল যেন স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে।

ওলেগ তাড়াতাড়ি হাসপাতাল ছেড়ে যেতে চাইছিল, পাছে নতুন কোন অসুবিধা পথ আটকিয়ে দাঁড়ায়। বৃদ্ধা পরিচারিকা হাতল ঘুরিয়ে সদর খুলে দিল।

ওলেগ গাড়ী বারান্দার নিচে এসে চুপ করে দাঁড়াল। বিশেষ চঞ্চলতা হীন তাজা বাতাস। ও বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। নতুন জগৎ, সবে সবুজ হয়ে আসছে। দূরে কোথাও সূর্য উঠছে। আকাশ গোলাপী হয়ে গিয়েছে। ওলেগ মাথা তুলল। আকাশ জুড়ে বেলুন আকৃতি সছিদ্র মেঘ। মেঘগুলো কত শতাব্দীর সযত্ন কারিগরির ফল তা কে জানে। কিন্তু ওরা ছত্রভঙ্গ হওয়ার আগে শহরেব অল্প ক'জন মানুষ, যারা ওলেগের মত ঐ মুহূর্তে মাথা পেছনে হেলিয়ে তাকিয়েছে, তারাই দেখতে পাবে।

জালির মত হয়ে ছড়িয়ে পড়া ফেনায়মান মেঘের মধ্যে তখনো দৃশ্যমান বুড়ো চাঁদটা জাহাজের মত পার হয়ে গেল।

সৃজনের প্রভাত। বিশ্ব নতুন করে সৃষ্ট হয়েছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে। তা হ'ল, বিধাতা এই নতুন বিশ্ব ওলেগকে উপহার দিয়ে বলবেন, "এই নতুন বিশ্বে প্রাণ ভরে বাঁচো।"

কিন্তু আকাশে যে ঝকঝকে চাঁদটা দেখা যাচ্ছে সে ত' আর যুবক নেই। ঐ চাঁদ প্রেমিক যুগলকে হাসি আশীর্বাদ দিতে পারে না।

তবু ওলেগের মুখ সহানুভূতিতে উদ্ভাসিত। ওর মনে বসন্ত ঊষার পরশ লেগেছে। ঐ অকৃপণ সুখের পরশ থেকে বৃদ্ধ আর অসুস্থরাও বঞ্চিত নয়। মানুষ না পেয়ে ওলেগ আকাশ আর গাছগুলোকে সহাস্য অভিবাদন জানাল। ও হাসপাতালের চেনা পথ ধরে এগিয়ে চলল। দেখা হ'ল শুধু এক বৃদ্ধ ঝাড়ুদারেব সঙ্গে।

ওলেগ একবার পেছন ফিরে ক্যানসার ওয়ার্ডের দিকে তাকাল। পিরামিড আকৃতির লম্বা লম্বা পপলারের ছায়ায় অর্ধেক আড়াল, উজ্জ্বল-ধূসর ইটের পর ইট সাজিয়ে তৈরী বিরাট বাড়ীটা সত্তর বছরে একটুও জীর্ণ হয়নি।

ওলেগ চলতে চলতে হাসপাতালের গাছগুলোকে বিদায় জানাল। মেপল গাছগুলোয় এর মধ্যে কুঁড়ি নেমেছে। জংলি কুল গাছে প্রথম ফুল এসেছে। সাদা সাদা ফুলগুলোয় পাতার সবুজ আভা লেগেছে। কিন্তু কোন খোবানি গাছেই ফুল ধরেনি। ওলেগ শুনেছিল এখনই নাকি ফুল আসার সময়। পুরানো শহরে ফুল ধরা খোবানি গাছ মিলতে পারে।

সৃজনের প্রথম প্রভাত। এমন সকালে কে বা যুক্তিসঙ্গত কাজ চাইবে?

ওলেগ্ সব পরিকল্পনা বাতিল করে ভোর থাকতে পুরানো শহরে পৌঁছনোর পাগলামি ধরল। খোবানির ফুল দেখতে হবে।

ও হাসপাতালের ভয় পাওয়ানো গেটে পেঁাছল। জানুয়ারির এক বৃষ্টি ভেজা দিনে ভিজে সপসপে, আশাহীন ওলেগ্ ঐ গেট পেরিয়েই হাসপাতালে এসেছিল। মারা যাওয়া ছাড়া আর কোন সম্ভাবনাই তখন মনে আসেনি। ঐ গেট পেরোলেই অর্দ্ধেক-শূন্য চত্বর, যেখানে ট্রলি-গাড়ীগুলো মোড় ঘোরে।

ওলেগ্ গেট পেরোল। যেন জেলের গেট পেরোল।

গত জানুয়ারিতে হাসপাতালে আসার পথে ভিড় ঠাসা, ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে চলা ট্রলি বাসের ঝাঁকুনিতে ওলেগ্ যেন মরতে বসেছিল। অথচ এখন ট্রলি বাসের জানলার পাশে বসে ওর ঐ ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ আর গাড়ীর দোলানি বেশ ভালই লাগল। ট্রলিতে চড়া যেন এক ধরনের জীবন, এক প্রকার মুক্তি।

ট্রলি এক নদী পেরনোর জন্য পোলে উঠল। পোলের অনেক নিচে দুর্বল পা উইলো গাছগুলো নুয়ে পড়েছে। ওদের ইতিমধ্যে সবুজ হওয়া ডালগুলো নিশ্বাস ভরে খরস্রোতা বাদামী জলরাশিতে নুয়ে পড়েছে।

রাস্তার পাশের গাছগুলো সবুজ হয়ে এলেও পাতায় এত সমৃদ্ধ হয়নি যে বাড়ীগুলো ঢাকা পড়বে। পাথরের তৈরি মজবুত একতলা বাড়ীগুলো ত্বরা হীন মানুষ ত্বরা হীন ভাবে তৈরি করেছে। ঐ বাড়ীগুলোতে যারা বাস করে তারা কত ভাগ্যবান—ওলেগের ঈর্ষা হ'ল। জানলা দিয়ে শহরের এক অতি সুন্দর অংশ দেখা যাচ্ছিল। অতি প্রশস্ত পথ। পথের মাঝ বরাবর ফুলের সারি। ফুটপাথগুলো চওড়া। কিন্তু গোলাপী সকালে কোন্ শহর না গোলাপী দেখায়?

ক্রমে শহরের অন্য চেহারা দেখা গেল। পথের মাঝ বরাবর ফুলের সারি শেষ হয়ে রাস্তার দুই পাশ যেন মিলে যেতে চায়। তাড়াহুড়া করে তৈরি করা বাড়ীর সারি দেখা গেল। ওদের না আছে মজবুত হওয়ার গর্ব না সুন্দর হওয়ার চেষ্টা। বোধ হয় যুদ্ধের ঠিক আগে তৈরি। ওলেগ্ রাস্তাটার নাম পড়ল। নামটা চেনা লাগল। হঠাৎ মনে পড়ল, ঐ রাস্তায় জোয়ার বাড়ী।

ও নিজের হাতে কাগজ কেটে বানানো নোট বইটা পকেট থেকে বের করল। জোয়ার বাড়ীর নম্বরও পেল। ট্রলির গতি খুব কমতে, জানলা থেকে উঁকি দিয়ে ও বাড়ীটাই চিনতে পারল। নানা আকারের জানলাওলা দোতলা বাড়ী যার গেট হয় পাকাপাকি ভাবে খোলা নয় ভেঙে গিয়েছে। মূল বাড়ীটা ছাড়া উঠোনে আরো ক'টা বাড়ীও আছে।

ওলেগ্ এখানে নেমে যেতে পারে। অন্ততঃ কাছাকাছি কোথাও নামতে পারে। ও এ শহরে আশ্রয়হীন নয়। ও আমন্ত্রণ পেয়েছে। একটি মেয়ের আমন্ত্রণ।

ওলেগ্ সীট থেকে নড়ল না। গাড়ীর দোলানি আর ঘড়ঘড়ানি উপভোগ

করতে করতে বসে রইল। যাত্রীর ভিড় হয়নি। ওলেগের বিপরীতে চশমা পরা এক বৃদ্ধ উজ্‌বেক্‌ বসে। সাধারণ উজ্‌বেক্‌ নয়, হাবভাবে প্রাচীন বৈদগ্ধের ছাপ।

কণ্ডাকটর বৃদ্ধকে টিকিট দিল। বৃদ্ধ টিকিটটা গোল করে পাকিয়ে কানে ঢুকিয়ে দিল। গাড়ী চলতে থাকল, আর উজবেকের কান থেকে গোলাপী টিকিটটা উঁচু হয়ে রইল। এটা নিতান্তই এক সাধারণ ঘটনা, তবু তাতে পুরানো শহরে ঢোকার মুখে ওলেগের অনেক বেশী হাল্কা আর সহজ লাগল।

আরো সরু সরু পথ। ছোট ছোট বাড়ীগুলো কাঁধ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। পরে আর কোন বাড়ীর জানলা দেখা গেল না। পথের ধার থেকে উঁচু উঁচু মাটির দেওয়াল উঠে গিয়েছে। কয়েকটা বাড়ীর চাল দেওয়ালের চেয়ে উঁচু। সে বাড়ীগুলোর পেছন দিক জানলা বিহীন, কাদা দিয়ে লেপা-পোঁছা। কোন কোন দেওয়ালে গেট কিংবা সুড়ঙ্গ করা আছে, কিন্তু সেগুলো এত বেঁটে যে মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। ট্রলি থেকে সোজা ফুটপাথে নামতে হয়। ফুটপাথ মাত্র কয়েক পা চওড়া। ট্রলি বাসের দাপটে যেন গোটা পথটা কাঁপে।

এটাই পুরানো শহর, যেখানে ওলেগ্‌ থাকতে চায়। কিন্তু এখানকার নাংরা পথে গাছপালা নেই, ফুলন্ত খোবানি গাছের কথাই ওঠে না।

ট্রলিতে বসে রাস্তা দেখতে আর ভাল লাগল না। ওলেগ্‌ নেমে পড়ল।

আগের মতই দৃশ্যাবলী। শুধু তফাৎ ওলেগ্‌ এখন হাঁটছে। ট্রলির ঘড়ঘড়ানি শোনা না গেলেও লোহার ওপর লোহা ঠোকার শব্দ শোনা গেল। না, কোন ভুল নেই, ওলেগ্‌ নিশ্চিত ঐ শব্দ শুনেছে। একটু পরেই তুলোর অস্তর লাগানো কালো, লম্বা কোট গায়ে, কোটের ওপর গোলাপী রঙের কোমর বন্ধ লাগানো আর কালো-সাদা রঙের কাপড়ের টুপি মাথায় এক উজ্‌বেক্‌কে দেখা গেল। উজ্‌বেক্‌ পথের মাঝখানে উটকো হয়ে বসে ট্রলির লাইনে এক নিড়ানিকে হাতুড়ি পিটে গোল করার চেষ্টা করছিল।

ওলেগ্‌ দাঁড়িয়ে পড়ল। আণবিক যুগ এসেছে বটে। উশ্‌-টেরেকের কথা নয় বাদ দেওয়া গেল, এই ধরনের একটা শহরেও ধাতুর এত অভাব যে নেহাইয়ের বিকল্প হিসেবে ট্রলির লাইনকে কাজে লাগাতে হয়। ওলেগ্‌ কৌতূহল সহ দেখতে চাইল লোকটা পরের গাড়ী এসে পৌঁছনোর আগে কাজ সারতে পারে কিনা। কিন্তু ওর এতটুকু তাড়া নেই। ও খুব মন দিয়ে হাতুড়ি মেরে চলল। ট্রলির হর্ন শোনা যেতে ও কয়েক পা পেছিয়ে দাঁড়াল। ট্রলি চলে গেলে আবার বসে পড়ল।

ওলেগ্‌ সপ্রশংস দৃষ্টিতে উজ্‌বেকের ধৈর্যশীল পিঠ আর গোলাপী কোমর-বন্ধ দেখছিল। ওর কোমরবন্ধটা ত' নীল আকাশের প্রাক্তন গোলাপী ভাব

পুরোপুরি নিঙড়ে নিয়েছে। উজ্‌বেকের সঙ্গে আলাপ করা হ'ল না। তবু ওলেগ্‌ এক শ্রমিক ভাই হিসেবে ওকে ভাল না বেসে পারল না।

বসন্তের সকালে হাতুড়ি পিটে নিড়ানিকে কাঙ্খিত আকার দেওয়া—এ যে জীবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এক বাস্তব প্রচেষ্টা, তাই নয়? চমৎকার!

ওলেগ্‌ ধীর গতিতে এগিয়ে চলল। ও ভাবছিল, বাড়ীগুলোর জানলা খোলে না কেন। বাড়ীগুলোর ভেতরে কি হচ্ছে জানতে ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু কোন গেটই খোলা নেই। কোন অজুহাত বিনা কোন বাড়িতে ঢুকতে যাওয়া ত' এক বিশ্রী ব্যাপার।

হঠাৎ ওলেগ্‌ লক্ষ্য করল এক দেওয়াল চিরে যাতায়াতের ছোট্ট পথে আলো দেখা যাচ্ছে। ও নীচু হয়ে স্যাঁতসেঁতে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা উঠোনে পেঁছিল।

উঠোনে তখনো লোকজনের সাড়া পড়েনি, কিন্তু বোঝা যায় যে ওখানে মানুষ বাস করে। একটা গাছের তলায় একটা বেঞ্চি রাখা। কিছু খেলনা ছড়িয়ে পড়ে আছে। বেশ আধুনিক ধরনের খেলনা। জল সরবরাহের জন্য একটা পাম্প, আর মুখ-হাত ধোয়ার একটা বেসিন ও আছে। অনেকগুলো জানলা দেখা যায়, সবকটারই মুখ উঠোনের দিকে, রাস্তার দিকে নয়।

ওলেগ্‌ ঐ উঠোন থেকে বেরিয়ে এসে কিছু দূরে আরেকটা উঠোনে ঢুকল। উঠোনে ঢোকার জন্য একই রকম সুড়ঙ্গ পথ। সবকিছু আগের উঠানের মত, কিন্তু এখানে এক উজ্‌বেক্‌ যুবতী তার ছেলেপিলের ওপর নজর রাখছিল। যুবতীর পরনে লাইলাক রঙের শাল। বিনুনি করা চুল কোমর অব্দি ঝুলছে। ও ওলেগ্‌কে দেখেও দেখল না। ওলেগ্‌ চলে গেল।

দুটো উঠোনের একটাও রুশ ধরনের নয়। রুশ গ্রাম এবং শহরের বাড়ীগুলোয় বসবাসের ঘরের জানলার মুখ রাস্তার দিকে থাকে। জানলায় রাখা ফুলের টব কিংবা পর্দার আড়াল থেকে গেরস্ত বধূরা লুকিয়ে থাকা সৈনিকের মত পথের লোকজন দেখতে পায়; কে কোন বাড়ীতে গেল, কেন গেল, জানতে পারে। কিন্তু প্রাচ্যের মনোভাব অন্য রকম: তুমি কি করছ আমি জানতে চাই না, তুমিও আমার অন্দর মহলে উঁকি মেরো না।

প্রাক্তন বন্দী ওলেগ্‌, যাকে বছরের পর বছর বন্দী শিবিরে সন্ধানী আলো, তল্লাশি আর নিরীক্ষণের সামনে সব সময় নগ্ন হতে হয়েছে, তার আর কোন্‌ ধরনের জীবন এর চেয়ে ভাল লাগতে পারে?

পুরানো শহর ওলেগের একটু একটু ভাল লাগছিল।

পুরানো শহরে পা দিয়ে ওলেগ্‌ দুটো বাড়ীর ফাঁকে একটা চায়ের দোকান দেখেছিল। দোকানী তখন সবে দোকান সাজাচ্ছে। ও এবার আরেকটা চায়ের দোকান দেখতে পেল। রাস্তা থেকে একটু উঁচু চাতালের ওপর দোকানটা। ওলেগ্‌ এগিয়ে গেল। লাল এবং নীল রঙের কাপড়ের টুপি মাথায় অনেক লোক বসেছিল। রঙীন এমব্রয়ডারি করা সাদা পাগড়ী

মাথায় এক বৃদ্ধও ছিল। কিন্তু কোন স্ত্রীলোক ছিল না। চায়ের দোকানে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ না হলেও ওরা ঠিক বাঞ্ছিত নয়।

ওলেগ্ ভাবল, আজ নতুন জীবনের প্রথম দিন। যাকিছু নতুন তাকে নতুন করে বুঝতে হবে। মেয়েদের থেকে পৃথক ভাবে একত্রিত এই লোকগুলির সমাবেশের কি এই অর্থ যে জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশে নারী নিষ্প্রয়োজন ?

ওলেগ্ চায়ের দোকানের রেলিঙে বসল। ওখান থেকে ভাল করে রাস্তা দেখা যায়। পথঘাট সজীব হয়ে উঠছে। কিন্তু সাধারণতঃ শহরে যে ধরনের তাড়া দেখা যায় কারো তেমন তাড়া নেই। চায়ের দোকানে বসা লোকগুলোর শান্তি যেন কিছুতেই বিঘ্নিত হবে না।

যেন ফৌজী ওলেগ্ বা বন্দী ওলেগ্ তার মেয়াদ পূর্ণ করে ফেলেছে, এবং সমাজের কাছে তার দেনা শোধ করে দিয়েছে; আর রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে গত জানুয়ারিতে মারা গিয়েছে। তার জায়গায় এক নতুন, দু'টি অশক্ত পায়ে টলটলায়মান ওলেগ্ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, ফৌজের ভাষায় 'এত সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন যে তার ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়'। তবু ওলেগ্ একটা গোটা জীবন উপভোগ করার সৌভাগ্য নিয়ে আসেনি বটে, কিন্তু জীবনের এক বাড়তি টুকরো ফাউ পেয়েছে,—যেন বন্দী শিবিরে রুটির সঙ্গে পাইন গাছের লগ দিয়ে আরেকটা রুটির টুকরো গেঁথে বরাদ্দ ওজন ঠিক করে দেওয়া। মূল র‍্যাশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েও টুকরোটা আলাদা।

বাড়তি জীবনের টুকরোটা পেয়ে ওলেগ্ ভেবেছিল এই জীবনটা পৃথক ভাবে ব্যয় করবে। অতীত জীবনের মত ভুল করবে না।

কিন্তু ও এর মধ্যে একটা ভুল করে বসে আছে। চা নির্বাচন করতে গিয়ে। ও পরিচিত, সাধারণ কালো চা নিবাচন না করে নতুন স্বাদের খোঁজে 'কোক্' বা সবুজ চা চেয়েছিল। কোকের তেজ নেই। ওর চাঙ্গা লাগল না। চায়ের গন্ধই নেই। শুধু একগাদা পাতা। ও খেতে পারল না।

সূর্য উঠছে। তাপ বাড়ছিল। ওর কিছু খেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু দোকানে আছে শুধু দু'রকমের চা, তাও চিনি ছাড়া।

আশপাশের লোকজনের মত ত্বরাহীন, পরিবর্তন হীন জীবনই ভাল। ওলেগ্ খাবারের সন্ধানে উঠল না। চেয়ারে আরাম করে বসল।

পথ থেকে অনেক উঁচু চায়ের দোকানের বারান্দা থেকে পাশের বাড়ীর দেওয়াল ঘেরা উঠোন দেখা যায়। উঠোনে গোলাপী রঙের বেলুনের মত কি যেন দুলছে। ছ'ফুট বেড়-ওলা বেলুন ? ওলেগ্ অত বড় আকারে অত গোলাপী বেলুন এর আগে কখনো দেখেনি। খোবানি গাছে নয় ত' ?

ভাল করে লক্ষ না করেই তেড়ে যাওয়া ওলেগের শিক্ষা-বিরুদ্ধ

আচরণ। ও চায়ের দোকানের রেলিঙের ধারে গিয়ে গোলাপী রহস্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

গোলাপী রহস্যটা যেন এক উপহার। ওর সৃষ্টির দিনে পাওয়া উপহার।

রুশ দেশের উত্তরাঞ্চলের গৃহস্থ পরিবারের একটা ঘরে এক ধরনের গাছকে মোমবাতি সাজিয়ে 'আগুন গাছ' নাম দেয়। এ যেন তেমনি এক আগুন গাছ। মাটির দেওয়াল ঘেরা উঠোনে একটাই মাত্র গাছ। নতুন ফুলে ভরা, উন্মুক্ত আকাশে তাকানো খোবানি গাছ। ঐ গাছের নিচে ঐ পরিবারের লোকজন দিনে বাস করে। ঠিক যেন একটা ঘর। শিশুরা গাছের তলায় হামাগুড়ি দিচ্ছে। সবুজ নক্সা কাটা কালো ওড়নায় মাথা ঢেকে একটি স্ত্রীলোক গাছের গোড়া নিড়ানি দিয়ে খোঁচাচ্ছিল।

পুরো গাছটাই গোলাপী। ছোট ছোট মোম বাতির মত কুঁড়ি। ফোটবার মুখে কুঁড়িগুলোর রঙ হয় গোলাপী। ফোটার পর পাপড়িগুলো আপেল কিংবা চেরিফুলের মত ধপধপে সাদা হয়। এখন অবিশ্বাস্য নরম গোলাপী ভাব। ওলেগ্ অনেক দিন এ স্মৃতি মনে রেখে দেবে, কাদামিনদের কাছে গল্প করবে।

ওলেগ্ ভেবেছিল আজ অন্ততঃ একটা রহস্য আবিষ্কার করবে। একটা ও দেখল। নব প্রসূত জগতে ওর জন্য আরো কিছু উপহার রাখা আছে।

এতক্ষণে চাঁদ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ওলেগ্ দোকান থেকে বেরোল। ওর অনাবরিত মাথায় রোদের তাপ লাগল। ও পাঁউরুটির খোঁজে চলল। কিছু পাঁউরুটি খেয়ে, অন্য কোথাও যাবে। অসামরিক পোষাক পরেছে বলে মনে খুশি খুশি ভাব। বমি ভাব লাগছিল না। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল না।

কিছুটা হাঁটার পর রাস্তার কিনার থেকে একটু পেছিয়ে দাঁড়ানো একটা দোকান চোখে পড়ল। দোকানের ঝাঁপ খোলা। ঝাঁপের নিচ থেকে নীলচে-ধূসর ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। ওলেগ্ মাথা নুয়ে ঝাঁপের নিচে ঢুকল।

দোকানের সামনে লম্বা লোহার গ্রিলের বেড়া। ভেতরে এক দিকে গনগনে কয়লার আগুন জ্বলছে, তার কাছাকাছি সাদা ছাইভর্তি। গ্রিলের ওপর আর ঠিক আগুনের ওপর এ্যালুমিনিয়মের শিকে মাংস ঝুলছে।

ওলেগ্ আন্দাজে বুঝল, ওগুলো শিক-কাবাব। ওর নতুন বিশ্বের আরেক বিস্ময়। জেলে শিক-কাবাব সম্পর্কে ও অনেক আলোচনা শুনেছে, কিন্তু চৌত্রিশ বছরের জীবনে কখনো দেখেনি। ও কখনো ককেশাস্ অঞ্চলে যায়নি কিংবা কোন রেস্তোরাঁয় খায়নি। প্রাক-যুদ্ধ আমলে ক্যান্টিনগুলোয় ত' যবের ঝোলে বাঁধা কপি সেদ্ধ ছাড়া কিছুই পাওয়া যেত না।

ধোঁয়া আর মাংসের মিশ্র গন্ধ ভরা কি মনকাড়া সুবাস শিক-কাবাবের।

শিকে ঝলন্ত মাংসগুলো পুড়ে খাক্ হয়ে যায়নি, এমন কি গাঢ় বাদামীও হয়নি। মাংসের রঙ হয়েছে গোলাপী-ধূসর, অর্থাৎ সুসিদ্ধ। মোটাসোটা চেহারা, গোল মুখ দোকনদার ধীরে সুস্থে শিকগুলো আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছিল।

ওলেগ্ জিজ্ঞেস করল, "কত করে?" দোকানী স্বপ্ন জড়ানো স্বরে জবাব দিল 'তিন।"

তিন মানে? তিন কোপেক্ ত' দারুণ কম দাম, আর তিন রুবল অত্যন্ত বেশী। হয়ত দোকানী বলতে চেয়েছে তিনটে শিকের দাম এক রুবল। শিবির থেকে বেরনোর পর থেকে জিনিষপত্রের দাম বোঝা ওলেগের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"তিন রুবলে ক'টা পাওয়া যাবে?" মনে মনে হিসেব কষতে কষতে ওলেগ্ জানতে চাইল। দোকানী এত কুঁড়ে যে তার কথা বলতেও কষ্ট হয়। ও একটা শিক তুলে ওলেগ্‌কে দেখিয়ে আবার আগুনের ওপর রেখে দিল। ওর এমন ভাব, ও যেন কোন বাচ্চা ছেলের সঙ্গে কথা বলছে।

এক শিক মাংসের দাম তিন রুবল? ওলেগ্ মাথা নাড়ল। অতদাম ওর ধারণার অতীত। ওর রোজ পাঁচ রুবলের বেশী খরচ করার উপায় নেই। কিন্তু কাবাব খেতে দারুণ ইচ্ছে করছিল। ওর চোখ প্রতিটি শিকেয় ওপর ঘুরে ঘুরে বাছাই করতে লাগল। প্রতিটি শিকেরই বিশেষ আকর্ষণ আছে।

রাস্তায় লরি দাঁড করিয়ে তিনজন ড্রাইভার দোকানের কাকাকাছি অপেক্ষা করছিল। একটি স্ত্রীলোক দোকানে এল। দোকানী উজবেক্ ভাষায় তাকে কিছু বলল। স্ত্রীলোকটি বেজার হয়ে ফিরে গেল। হঠাৎ দোকানী সবক'টা শিককে একটা বড় প্লেটে সাজাতে লাগল। ও কিছু টুকরো করা পেঁয়াজ আর এক বোতল থেকে কিছু তরল পদার্থ ঐ মাংসে ঢেলে দিল। ওলেগ্ বুঝল লরি ড্রাইভাররা সবকটা শিকই নিচ্ছে। ওরা প্রত্যেকে পাঁচটা করে পাবে।

রুশ দেশের সর্বত্র বিদ্যমান দ্বিস্তর দরদাম আর মজুরির এ আরেকটা নিদর্শন মাত্র। দ্বিতীয় স্তরটা ওলেগের কল্পনার অতীত। লরি ড্রাইভাররা শুধু মাত্র জলখাবার হিসেবে শিক-কাবাব খাচ্ছে, দুপরের খাওয়া হিসেবে নয়। আর তার জন্য প্রত্যেকে খরচ করছে পনেরো রুবল। মাইনের টাকায় ঐ হারে শিক-কাবাব খাওয়া যায় না।

"সব বিক্রি হয়ে গেল," দোকানী ওলেগ্‌কে বলল।

"সব গেল?" হতাশ ওলেগ্ বলল। কেন বা ও ইতস্ততঃ করতে গেছিল? আর কি কখনো শিক-কাবাব খাওয়ার সুযোগ মিলবে?

"আজ মাংস সরবরাহ করেনি," দোকানী জিনিষপত্র গোছাতে গোছাতে বলল। ও ঝাঁপ বন্ধ করার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

"ও ভাই, আমাকে একটা শিক দেবে?" ওলেগ্ ড্রাইভারদের বলল, "একটা মাত্র শিক হলেই হবে।"

ওদের একজন, অত্যন্ত রোদে পোড়া দেহ আর শনের রঙ চুলওলা এক যুবক বলল, "ঠিক আছে, একটা নিন।"

ওরা তখনো দাম চোকায়নি। ওলেগ্ নিজের বুক-পকেটের ঢাকা থেকে সেফ্‌টি পিন খুলে একটা নোট বের করে দাম দিল। দোকানী নোটটা স্রেফ কাউণ্টার থেকে নিয়ে দেরাজে ঢুকিয়ে দিল, যেন টেবিল থেকে খাবারের টুকরো সাফ করে ফেলছে। নোটটা ভাল করে দেখলও না।

কিন্তু ওলেগ্ ততক্ষণে শিক-কাবাবের মালিক হয়ে গিয়েছে। ধরে রয় ও টাতে নিজের চামড়ার থলেটা রেখে ও দুহাতে শিকটাকে ধরল। গুণে দেখল, মোট পাঁচ টুকরো মাংস আছে। ষষ্ঠটা আধ টুকরো মাত্র। ও দাঁত দিয়ে ধীরে ধীরে একটু একটু মাংস খুলিয়ে খেতে লাগল, যেমন কুকুর নিজের খাদ্য এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে খায়। মানুষের যে ইচ্ছে সহজে পূরণ হয় না তাই আবার কত অনায়াসে পূরণ হয়ে যায়। বছরের পর বছর ধরে ওলেগ্ একটা গোটা পাঁউরুটিকেই বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু ভেবে এসেছে। কিছু ক্ষণ আগে প্রাতরাশ হিসেবে ও পাঁউরুটিই কিনতে চলেছিল। তারপর কাবাবের নীলচে-ধূসর ধোঁয়া আর শূলপক্ক মাংসের গন্ধ নাকে গেল, ড্রাইভারা ওকে একটা শিক কিনতেও দিল, আর সেই কাবাব চিবোতে চিবোতেই পাঁউ-রুটিতে ঘেন্না ধরে গেল।

ড্রাইভারেরা শিক-কাবাব খেয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিল। চলে গেল। ওলেগ্ প্রতিটি টুকরো তারিয়ে খেতে লাগল। নরম সুস্বাদু মাংস প্রতি গ্রাসে ওর মুখ সুঘ্রাণ আর রসে ভরে দিল। প্রতি গ্রাসে কি আদিম আনন্দাস্বাদন, যা এত শতাব্দী পেরিয়েও ফিকে হয়নি। যত খাওয়া যায় ততই তৃপ্তি। হঠাৎ জোয়ার কথা মনে এল। না, জোয়ার বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে হলেও ও জোয়ার বাড়ী যাবে না। মাংসের শেষ টুকরোটা চিবোতে চিবোতে মনে পড়ল ট্রলিতে এখানে আসার সময় ওর জোয়ার বাড়ীর স্টপে নামতে ইচ্ছে করেনি। চেনা পথ ধরে ট্রলি শহরের কেন্দ্রে ফিরে চলল। বেশ যাত্রীর ভিড়। ওলেগ্ জোয়ার স্টপ চিনতে পারল। আরো দুটো স্টপ পেরিয়ে গেল। কোন্ স্টপে নামলে সবচেয়ে ভাল হবে ওলেগ্ তা স্থির করতে পারছিল না। হঠাৎ একটি স্ত্রীলোক ট্রলির জানলা গলিয়ে খবরকাগজ বিক্রি করতে চাইল। ওলেগ্ ছেলেবেলার পর কাউকে রাস্তায় খবরকাগজ বিক্রি করতে দেখেনি। ও শেষ দেখেছিল যখন মায়াকভ্‌স্কির [ভ্লাদিমির মায়াকভ্‌স্কি, বিখ্যাত রুশ কবি এবং বলশেভিক বিপ্লবের সমর্থক, ১৯৩০ এ আত্মহত্যা করেন] নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যার খবর ছাপানো কাগজ নিয়ে ছোট ছোট ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করছিল। কিন্তু এ যে বয়স্কা রুশ স্ত্রীলোক। ওর কোন তাড়া নেই, ধীরে সুস্থে খুচরো পয়সা গুণে গ্রাহকদের ফেরৎ দিচ্ছে। ওলেগ্ ট্রলি থেকে নেমে ওর বিক্রি দেখল। ভালই বিক্রি। প্রতি ট্রলিতে কিছু কিছু কাগজ কাটছে।

"পুলিশ আপনাকে তাড়া করে না?" ওলেগ্ বলল।

"ওরা এখনো আমার খোঁজ পায়নি," কাগজওলী জবাব দিল।

ওলেগ্ অনেক দিনের মধ্যে আয়নায় নিজের চেহারা দেখেনি, ফলে নিজেকে কেমন দেখতে তা ভুলে গিয়েছিল। কোন পুলিশের সেপাই ওদের দেখলে স্ত্রীলোকটির কথা না ভেবে আগে ওলেগেরই কাগজপত্র দেখতে চাইত।

রাস্তার বড় ঘড়িতে সকাল ন'টা বাজে। কিন্তু এর মধ্যে এত গরম পড়েছে যে ওলেগ্ গ্রেটকোটের ওপরের বোতম ক'টা খুলে দিল। অনেকে ওকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল। ওর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ও ধীরে সুস্থে রাস্তার রোদ লাগা দিক ধরে এগিয়ে চলল। চোখ ঈষৎ কুঞ্চিত করে।

আজ ওর বরাতে আরো আরো অনেক আনন্দ লাভ বাকি আছে। বসন্তের রোদ ঝলমল এ সকালেও বেঁচে থাকবে ভাবেনি। নব জীবন লাভের এ আনন্দের শরিক হওয়ার মত আশপাশে কেউ না থাকলেও—বস্তুতঃ আশপাশের মানুষরা ওর নব জীবন লাভের কথা জানেই না—সূর্যটা ত জানে। ও সূর্যের দিকে চেয়ে হাসল। আরেক বসন্ত দেখা যদি বরাতে না হয় এ বসন্তটাই ত' ওর পক্ষে এক অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ। ও সে আশীর্বাদ পেয়ে কৃতজ্ঞ।

কোন পথচারী ওলেগ্‌কে দেখে বিশেষ প্রীত মনে হ'ল না, কিন্তু ও সবাইকে দেখে আনন্দিত। ও ওদের সবার কাছে, রাস্তার সবকিছুর কাছে ফিরে আসতে পেরে আনন্দিত। এই নবাবিষ্কৃত বিশ্বে ওর কিছুই অনাকর্ষক, অপ্রিয় বা অসুন্দর লাগল না। ওর জীবনের কোন মাস বা বছরকেই আজকের এই পরম তাৎপর্য পূর্ণ দিনটির সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

কাগজের কাপে আইসক্রিম বিক্রি করছিল। ওলেগ্ শেষ কবে ঐ রকম ছোট ছোট কাপে আইসক্রিম বিক্রি হতে দেখেছে মনে পড়ে না। আরো দেড় রুবল খসল। ওর রঙ জ্বলা, গুলির আঘাতে ফুটো হওয়া চামড়ার থলে কাঁধে ঝুলতে লাগল। ও কাঠের চামচ দিয়ে জমাট বাঁধা আইসক্রিমের পরত মুখে ঢোকাতে থাকল।

আরো ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ওলেগ্ ছায়ায় এক ফটোর দোকানের সামনে এসে পৌঁছল। লোহার রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ও দোকানের জানলায় সাজানো সুন্দর ভঙ্গীর ফটোগুলোকে অনেকক্ষণ দেখল। বিশেষতঃ মেয়েদের ফটোগুলো, ওরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। সবক'টি মেয়ে নিশ্চয় সেরা সাজে ফটো তুলতে এসেছিল। ফটোগ্রাফার ওদের মুখ এদিক ওদিক ফিরিয়ে, অনেকবার আলোর পরিমাণ ঠিক করে, অনেকবার ছবি নিয়েছে। সেই ছবিগুলির মধ্যে সেরা ক'টিকে বেছে কিছু তুলি বুলিয়েছে। জানলায় শোভিত ছবিগুলি অত কারিগরির ফসল। ওলেগ্ তা জানে। তবু বিশ্বাস করতে ভাল লাগল যে জীবন সত্যিই ঐ সুন্দরীদের দ্বারা গঠিত! ও লজ্জা ভুলে চেয়ে চেয়ে দেখল। যে বছরগুলো ও খুইয়েছে, যে বছরগুলো

ওর বাঁচা হবে না, ও যাকিছু এ পর্যন্ত পায়নি, ছবিগুলো যেন সে সব পূরণ করে দেবে।

আইসক্রিম ফুরিয়ে গেল। কাপটা ফেলে দিলেই হয়। কাপটা এত সুন্দর, পরিষ্কার-পরিছন্ন যে জল খাওয়ার কাজে লাগতে পারে। ওলেগ চামড়ার থলেয় রেখে দিল। চামচটাও রেখে দিল।

আরেকটু এগোতে একটা ওষুধের দোকান দেখা গেল। ভারি সুন্দর দোকান। ওলেগ্ সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল।

সমকোণ আকারে সাজানো এক একটা সাফ-সুতর কাউন্টার। সারা দিন ধরে দেখলেও ক্লান্তি আসে না। আলমারিতে সাজানো জিনিষপত্র ওর শিবির-শিক্ষিত চোখে রহস্যময় লাগল। বিগত জীবনে ও ওসব দেখেনি, যাকিছু দেখেছে তার নামও মনে নেই। নিকেল প্লেটিং করা আলমারিতে রাখা নানা আকারের কাঁচ আর প্লাস্টিকের শিশি-বোতলের দিকে ও আদিম মানুষের মত চেয়ে রইল। ছোট ছোট বনৌষধির প্যাকেটও ছিল, প্যাকেটে তাদের গুণাবলী লেখা। ওলেগ্ বনৌষধিতে বিশ্বাসী। কিন্তু ওযে বনৌষধি চায় তা কোথায় ?

এর পর ট্যাবলেটের দীর্ঘ সারি। এত রকমের ট্যাবলেট আর কত যে তাদের নতুন নতুন নাম। ওষুধের দোকান ওর সামনে এক সম্পূর্ণ নতুন জাতের দুয়ার খুলে ধরেছে, যে জগৎ দেখে দেখেও ফুরোবে না। ওলেগ্ এ কাউন্টার ও কাউন্টার ঘুরে একটা থার্মোমিটার, কিছু সোডা আর কিছু ম্যাঙ্গানেট চাইল। কাদমিনরা ওকে ঐ জিনিষগুলো নিয়ে যেতে বলেছেন। থার্মোমিটার আর সোডা নেই। ওলেগ্ ম্যাঙ্গানেটের জন্য তিন কোপেক দাম জমা দিতে ক্যাশিয়ারের কাছে চলল। এর পর ডিসপেন-সারিতে কুড়ি মিনিট লাইন দিতে হল। ও নিজের থলেটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখেছিল। তবু কেমন যেন দম বন্ধ ভাব হল। ওষুধ খেতে হবে নাকি ? ভেরা ওকে গতকাল যে তিনটে প্রেসক্রিপশন দিয়েছিল তার একটা ছোট্ট জানলা দিয়ে গলিয়ে দিল। ও আশা করেছিল ঐ ওষুধগুলো পাওয়া যাবে না, ওর ওষুধ খাওয়ার ঝামেলাও পোয়াতে হবে না। কিন্তু ওদের কাছে ওষুধ ছিল। ওরা হিসেব কষে, ওকে আটান্ন রুবল আর কয়েক কোপেকের একটা বিল দিল।

ওলেগ্ এত স্বস্তি পেল যে জানলা ছেড়ে যেতে গিয়ে ও হেসেই ফেলল। জীবনের কোন ক্ষেত্রে যে আটান্ন সংখ্যাটা [ওলেগ্ প্রথমে সোভিয়েত দণ্ডবিধির আটান্ন ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত হয়েছিল] ওর সঙ্গ ছাড়ছে না, ও তাতে একটুও অবাক হল না। কিন্তু তিনটে প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য ১৭৫ রুবল গুণে দিতে হবে, এটা অত্যন্ত বেশী ঠেক। ওর সারা মাসের খাওয়ার খরচও অত পড়ে না। প্রেসক্রিপশনগুলো কুটিকুটি করে ছিঁড়ে

ফেলে দিতে ইচ্ছে হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ভেরা প্রশ্ন করতে পারে। না, রেখে দেওয়াই ভাল।

আয়নার মত ঝকঝকে ওষুধের দোকানটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু বেলা হয়ে গিয়েছিল। দিন ওকে ডাকছিল। আনন্দের দিন। এখনো নিঃশেষ না হওয়া আনন্দ।

ওলেগ্ ধীরে সুস্থে হেঁটে চলল। এ দোকান ও দোকানের জানলা দেখতে থাকল। যে জানলা দেখে সেখান থেকে নড়তে চায় না। যেন সবকিছুতে অপ্রত্যাশিত চমকের দেখা পাবে।

সামনেই একটা ডাকঘর। ডাকঘরের জানলায় বিজ্ঞাপন ঝোলানো, 'আমাদের ফটো-টেলিগ্রাফ ব্যবহার করুন!' কি আশ্চর্য! বছর দশেক আগে বিজ্ঞান কাহিনীতে যা লিখত তাই জনসাধারণকে উপহার দেওয়া হচ্ছে। ওলেগ্ ভেতরে গেল। ফটো-টেলিগ্রাফ পাঠানো যাবে এমন তিরিশটা শহরের তালিকা টাঙানো। ওলেগ্ ভাবতে লাগল কাকে এবং কোথায় টেলিগ্রাম পাঠাবে। কিন্তু জগতের এক-ষষ্ঠভাগ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অতগুলো বড় শহরের এমন একটা লোকের কথাও মনে এল না যে ওর হাতের খেলা দেখে আনন্দিত হবে।

বিশদ ভাবে জানার জন্য জানলায় গেল। কত বড় চিঠি ফটো-টেলিগ্রাম হিসেবে পাঠানো যাবে, জানতে চাইল। একটা ফর্মও চাইল।

'যন্ত্রটা ভেঙে গেছে' জানলায় বসা স্ত্রীলোকটি বলল, 'এখন কাজ হয় না।'

কাজ হয় না! চমৎকার! এটাই এ দেশের রীতি। বাঁচা গেল।

ওলেগ্ আরও খানিকটা এগোল। দেওয়ালে কয়েকটা বিজ্ঞাপন সাঁটা আছে। সার্কাস আর সিনেমার। সবই দুপুরে শো। ওলেগ্ দুপুরটা নষ্ট করতে অনিচ্ছুক, ওর আরো অনেক কিছু দেখা বাকি আছে। সময়ের প্রাচুর্য থাকলে সার্কাস দেখলে মন্দ হত না। শিশুর মত। ওলেগ্ ত এক নবজাতক বটেই।

ভেরার সঙ্গে দেখা করার সময় এগিয়ে আসছিল। অবশ্য, যদি ভেরার সঙ্গে আদৌ দেখা করতে যাওয়া হয় তবেই……

কেনই বা যাবে না? ভেরা ওর বান্ধবী। ওর আমন্ত্রণও অকপট। সে আমন্ত্রণ জানাতে ভেরা এতটুকু বিব্রত বোধ করেনি। ভেরাই এ শহরে একমাত্র মানুষ যার সঙ্গে মনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে না যাওয়ার কি কারণ?

ভেরার সঙ্গে দেখা করতে ও সবচেয়ে বেশী চেয়েছে। ওটাই ওর গোপনতম বাসনা। শহর দেখতে বেরনোর আগেই ভেরার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু নানা সংকোচ পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল: খুব বেশী তাড়াতাড়ি হয়ে

যাবে না ? ও হয়ত এখনো কাজ থেকে ফেরেইনি, কিংবা এখনো ঘরদোর গোছ-গাছ করে উঠতে পারেনি। থাক, একটু পরেই যাওয়া যাবে……

প্রতি রাস্তার মোড়ে ওলেগ্ থমকে দাঁড়িয়েছে আর ভেবেছে : কি করে রাস্তা ভুল করা এড়ানো যায় ? কোন্ পথে গেলে সবচেয়ে ভাল হবে ? তবু ও কাউকে জিজ্ঞেস না করে খেয়াল-খুশি মত পথ নির্বাচন করছে।

ঘুরতে ঘুরতে এক মদের দোকানের সামনে হাজির। থরে থরে বোতল সাজানো আধুনিক দোকান নয়, পুরানো ধরনের দোকান। ভেতরে আধো-আঁধারি, আধো-ভ্যাপসা, অদ্ভুত টকো আবহাওয়া। দোকানি পিপে থেকে সোজা গ্লাসে মদ ঢেলে বেচছে। এক গ্লাস সস্তা পানীয়ের দাম মাত্র দু রুবল। শিক-কাবাবের পর এ যে বেজায় সস্তা! ওলেগ্ পকেট থেকে একটা দশ রুবলের নোট বের করে দিল।

সাধারণ স্বাদের পানীয়। কিন্তু ওর মস্তিষ্ক তখন এত দুর্বল যে অত হাল্কা মদের গ্লাস শেষ হতে মাথা ঘুরে গেল। ও দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল। সকাল থেকে যে জীবন ভাল লেগেছিল তা আরো ভাল লাগল। এত সহজ আর সুখকর যে ও আর কিছুতেই বিচলিত হবে না। কারণ যা কিছু খারাপ তার অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে এবং ও সেসব পেছনে ফেলে এসেছে। এখন ওর সঙ্গী শুধু যাকিছু ভাল।

নিশ্চয় বরাতে আজ আরো আনন্দ বরাদ্দ আছে। আরেকটা পানশালার দেখা মিলতে পারে। সেখানে আরেক গ্লাস পান করা যাবে।

কিন্তু পানশালার দেখা মিলল না তার বদলে দেখা গেল ফুটপাথে দারুণ লোকের ভিড়, যার ফলে পথচারী রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছে। হয়ত কোন দুর্ঘটনা। না, তা নয়। লোকগুলোর সামনে চওড়া সিঁড়ির ধাপ উঠে গিয়ে কয়েকটা বড় বড় দরজা দেখা যায়। ওরা স্রেফ অপেক্ষা করছে। ওলেগ্ গলা বাড়িয়ে পড়ল : কেন্দ্রীয় বিভাগীয় বিপণি।

নিশ্চয় তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিক্রি হবে। কিন্তু কি বিক্রি হবে ? ওলেগ্ একটি লোককে জিজ্ঞেস করল, তারপর একটি স্ত্রীলোককে, আরো একটি স্ত্রীলোককে, কিন্তু কেউই সঠিক জানে না। কেউ সোজাসুজি উত্তরও দিল না। সবাই কেবল বলে, শীগগিরই দোকান খুলবে। তা যদি হয় মন্দ কি…… … ওলেগ্‌ও ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মিনিট কয়েক পরে দুটি লোক চওড়া চওড়া দরজাগুলো খুলে দিল। লোক দুটি নরম ভঙ্গীতে প্রথম সারির ক্রেতাদের সংযত করার চেষ্টা করেই দু পা পেছিয়ে দাঁড়াল, যেন ওরা অশ্বারোহীদের আক্রমণ এড়াতে চায়। প্রথম সারিতে শুধু অপেক্ষমান যুবক-যুবতীর দল। ওরা টগবগিয়ে সিঁড়ি টপকিয়ে দরজা দিয়ে সোজা দোতলায় ক্ষিপ্র গতিতে উঠে গেল, যা হঠাৎ আগুন লাগলে বাড়ীটা থেকে পালানোর বেলায় প্রযোজ্য। বাদবাকিরাও তেড়ে গেল। বয়স আর শক্তি অনুযায়ী সিঁড়ি দিয়ে ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল।

মূল স্রোত তত্ক্ষণে দোতলায় পেঁাছে গিয়েছে। শাখা-প্রশাখার ঢেউয়ে একতলা উদ্বেল। ঐ আগ্রাসী ভিড় ঠেলে ভদ্র ভাবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠাই দঃসাধ্য। হতশ্রী আর কালো হয়ে যাওয়া ওলেগ্ কাঁধে ঝোলা নিয়ে ওপরে উঠছিল। লোকগুলো ওকে দেখে মন্তব্য করল, "হতচ্ছাড়া ফৌজী!"

দোতলায় উঠে ভিড় তিনমুখে ভাগ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পালিশ করা কাঠের মেঝেয় সাবধানে চলতে হচ্ছিল। ওলেগ্ কোন্ মুখে যাবে। ও বেশী ভিড় যেদিকে সেদিকে ভিড়ল। ওদের মনে আস্থা সবচেয়ে বেশী।

দেখা গেল ওলেগ্ বোনা পোষাক বিভাগের সামনে ক্রমবর্দ্ধমান লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। ফিকে-নীল ইউনিফর্ম পরা কর্মচারীরা অনায়াসে গল্প করছে আর হাই তুলছে, স্পষ্টতঃ ক্রেতার ভিড়ের কথা কিছুই জানে না। ওদের কাছে এটা স্রেফ আরেকটা একঘেয়েমি ধরানো দিন।

একটু দম নেওয়ার পর ওলেগ্ দেখল ও মেয়েদের কার্ডিগান আর সোয়েটারের জন্য লাইন দিয়েছে। মনে মনে একটা কুৎসিত গালাগাল দিয়ে ও লাইন থেকে সরে গেল।

ক্রেতার আর দুটো স্রোত কোন্ দিকে গেল? সব কাউন্টারেই ক্রেতার চলাচল আর ঠাসাঠাসি। এক জায়গায় ভিড় অন্য সব জায়গার থেকে বেশী। ওরা নীল রঙের সস্তা স্যুপ প্লেটের জন্য লাইন দিয়েছে। ক্রেতাদের জন্য অনেকগুলো প্লেটের বাক্স খুলেছে। উশ্-টেরেকে স্যুপ প্লেট নেই। কাদমিনদেরও নেই। এক ডজন স্যুপ প্লেট নিয়ে যেতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু উশ-টেরেক পেঁছনোর অনেক আগেই যে প্লেটগুলো ভেঙে যাবে।

ওলেগ্ উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে একতলা আর দোতলার কাউন্টারগুলোয় ঘুরে দেখতে লাগল। ফোটোগ্রাফি বিভাগে দাঁড়াল। ক্যামেরাগুলো, যা যুদ্ধের আগে এক রকম পাওয়াই যেত না, এখন সেলফে উপচিয়ে পড়ছে। ফটোগ্রাফির অন্য সরঞ্জামও আছে। ক্যামেরার আকর্ষণ যেমন তীব্র তেমনি তার জন্য অর্থ প্রয়োজন। ওলেগের ঐ আরেকটা পূর্ণ না হওয়া ছেলেবেলার শখ।

পুরুষদের বর্ষাতিগুলোও খুব পছন্দ হ'ল। ওর ইচ্ছে ছিল যুদ্ধের পর একটা অসামরিক বর্ষাতি কিনবে। ওতে পুরুষের রূপ খোলে। কিন্তু বর্ষাতির দাম ৩৫০ রুবল। ওর এক মাসের মাইনে। ওলেগ্ এগিয়ে এল।

কিছুই কেনা হ'ল না। ব্যাগে টাকার অভাব নেই, অথচ প্রয়োজন বোধটাই চলে গিয়েছে। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। ইতিমধ্যে মদের নেশা ফিকে হয়ে বেশ ফূর্তি লাগছিল।

কৃত্রিম সুতোর শার্ট বিক্রি হচ্ছিল। ওলেগ্ কৃত্রিম সুতো কথাটার সঙ্গে পরিচিত। কৃত্রিম সুতোর পোষাক এসেছে শুনলেই উশ্-টেরেকের গিন্নিরা আঞ্চলিক বিপণিতে ছোটে। ওলেগ্ শার্টগুলো নেড়েচেড়ে দেখল।

পছন্দও হ'ল। সবুজের ওপর সাদা স্ট্রাইপ্ দেওয়া একটা শার্ট কিনতে ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু দাম যে ষাট রুবল। ওর ক্ষমতার বাইরে।

ও যখন শার্ট দেখছিল তখন মিহি ওভার কোট গায়ে একটি লোক কাউন্টারে এল। লোকটি কৃত্রিম সুতোর শার্ট চায় না, সিল্কের শার্ট চায়। লোকটি ভদ্রভাবে একটি কর্মচারীকে বলল, "আচ্ছা, আপনাদের কাছে ৪০ সাইজ আর কলার সাইজ ১৬ মাপের সিল্কের শার্ট আছে?"

ওলেগ্ আঁতকে উঠল। যেন ওর দেহের দু'দিকেই কেউ উকো ঘষে দিয়েছে। ও চমকিয়ে ফিরে তাকাল। পরিপাটি দাড়িগোঁফ কামানো মুখ, গায়ের চামড়ার কোথাও কোন খুঁত নেই, মাথায় সুন্দর একটা ফেল্ট হ্যাট, সাদা শার্টের ওপর টাই ঝুলছে। লোকটিকে দেখে ওলেগ্ যেন কানের ওপর বিরাট এক চড় খেল। হয়ত সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়বে।

এটা কি রকম? কিছু মানুষ রণাঙ্গণের ট্রেঞ্চেও পচে মরবে; কিছু মানুষের শব স্থায়ী-তুষার ভর্তি অগভীর গণ-কবরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে; কিছু মানুষকে প্রথম, দ্বিতীয়, এমন কি তৃতীয় বারও বন্দী শিবিরে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে, যারা বন্দী বইবার গাড়ীতে এ স্টেশন ও স্টেশন ধাক্কা খেতে খেতে শিবিরে পেঁছে কোদাল আর গাঁইতি হাতে ক্রীতদাসের মত প্রাণপাত পরিশ্রম করে বড় জোর তাপ্পি-মারা একটা তুলোর আস্তর লাগানো জ্যাকেট কিনতে পাবে——আর কেউ ছিমছাম সাজে সজ্জিত হয়ে শুধু নিজের জামার সাইজই জানবে না, কলারের সাইজও তার জানা থাকবে!

কলারেব সাইজের কথাই ওলেগ্‌কে হতভম্ব করে দিল। প্রত্যেক কলারের সাইজের এক একটা বিশেষ নম্বর থাকতে পারে এ ওর কল্পনার অতীত। আহত আর্তনাদ চেপে রেখে ও কাউন্টার থেকে সরে এল। কলারের সাইজ—হুঃ! ও রকম পরিশীলিত জীবন কোন্ উপকারে আসবে, শুনি? কলারের সাইজ মনে রাখতে গিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা ভুলে যাবে না? ···ওলেগের দুর্বল লাগল।

গেরস্তালি জিনিষপত্রের বিভাগে গিয়ে ওলেগের মনে পড়ল, এলেনা আলেক্সান্দ্রোভ্না'র একটা হাল্কা গোছের বাষ্পীয় ইস্ত্রিরর শখ ছিল। এলেনা, অবশ্য, ওলেগ্‌কে ঐ ইস্ত্রি কিনে নিয়ে যেতে বলেননি। ওলেগ্ ধারণা করেছিল অন্য গেরস্তালি জিনিষপত্রের মত ইস্তিরিটাও পাওয়া যাবে না। তাহলে ওর বিবেকও হাল্কা হত, পিঠের বোঝাও বাড়ত না। কিন্তু কাউণ্টারের মেয়ে কর্মচারীটি ঠিক ঐ ধরনের একটা ইস্তিরি দেখাল।

"এ ইস্তিরিটা কি সত্যিই হাল্কা ওজনের?" ওলেগ্ হাত দিয়ে যাচাই করে সন্দেহ প্রকাশ করল।

"আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন?" মেয়েটি ঠোঁট উল্টে বলল। ওর চাউনিতে কি যেন এক দার্শনিক ভাব। ও যেন কোন এক দূর লোকের

চিন্তায় মগ্ন। কাউন্টারের খদ্দেররা যেন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, এ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছায়া মাত্র।

"আমি একথা বলতে চাইনি যে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। কিন্তু আপনি ভুল করে থাকতে পারেন," ওলেগ্ বলল।

মেয়েটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাস্তব জগতে নেমে আসতে বাধ্য হ'ল। একটি বাস্তব পদার্থকে সরানোর দুঃসহ পরিশ্রম স্বীকার করে ও আরেকটা ইস্তিরি হাজির করল। তারপর আর কোন কিছু ভাষায় ব্যাখ্যা করার শক্তি ওর রইল না। ও আবার ভাসতে ভাসতে দার্শনিক জগতে ফিরে গেল।

সত্য জানার জন্য তুলনাই শ্রেয়ঃ। নতুন ইস্তিরিটি অন্ততঃ এক কিলো হাল্কা। এখন নিছক ভদ্রতার খাতিরেই ইস্তিরিটা কিনতে হয়। মেয়েটি ইস্তিরি নিয়ে এসে বেশ শ্রান্ত; তবু ওর অশক্ত আঙুলগুলো দিয়ে একটা বিল লিখতে হ'ল, অবসন্ন ঠোঁট দিয়ে উচ্চারণ করতে হল 'কণ্ট্রোল'—অর্থাৎ বিলটা নিয়ে যেখানে টাকা জমার রসিদ আর মাল মিলিয়ে দেখা হয়, সেই নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে যান। ওলেগ্ 'কণ্ট্রোল' কথাটার তাৎপর্য একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। এরা আবার কোন যাচাই-টাচাই করবে না ত'? সভ্য জগতে ফিরে আসাই এক ঝকমারি।

বিক্রি হওয়া মাল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা মেয়েটির নয়। ওর চরণ যুগল ত' ধরাতল ছুঁতেই চায় না। ওর স্বপ্নিল ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য ওলেগের নিজেকে অপরাধী মনে হ'ল।

ওলেগ্ ইস্তিরিটা চামড়ার থলেয় পুরল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে ওজনের ভার পড়ল। মোটা ওভারকোট পরে থাকার জন্য এর আগেই অত্যন্ত গরম আর দম আটকানো লাগছিল। তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরতে পারলে বাঁচে।

ঘরের চাল থেকে মেঝে অব্দি লম্বা একটা আয়না দেখতে পেল। অনেক ক্ষণ ধরে আয়নায় নিজের চেহারা দেখা যে শোভন আচরণ নয়, ওলেগ্ তা জানে। কিন্তু সারা উশ্-টেরেকে আয়নাই নেই। তাছাড়া গত দশ বছরে ওলেগ্ এত বড় আয়না দেখেনি। লোকে যা ভাবে ভাবুক, ওলেগ্ প্রাণ ভরে আয়না দেখতে লাগল। প্রথমে দূর থেকে। তারপর কাছ থেকে, আরো কাছ থেকে।

ও যে নিজেকে ফৌজী সিপাহী ভাবে কোথাও তার নাম-গন্ধ নেই। ওর ওভারকোট আর বুটকে কোন মতে স্বরূপে চেনা যায়। কাঁধ দুটো অনেক কাল আগেই ঝুলে পড়েছে। দেহের ঋজু ভাব নেই। ও টুপি বা বেল্ট পরেনি বলে ওকে ফৌজী ত' মনে হয়ই না বরং মনে হয় জেল ফেরার বন্দী কিংবা কেনাকাটা করতে আসা গেঁয়ো মানুষ। ফৌজীদের মধ্যে যে ডাকাবুকো ভাব থাকে ওর সে ভাব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, অবহেলিত।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ভুলই হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত ও নিজেকে এক নির্ভীক, ফৌজী ব্যক্তিত্ব ভাবতে পারত, যে পথচারীদের দিকে

রুপা ভরে এবং মেয়েদের দিকে নিঃসঙ্কোচে তাকাতে সক্ষম। হতচ্ছাড়া চামড়ার থলেটা অনেক কাল আগেই ফৌজী চেহারা খুইয়ে ভিখারির ঝোলা হয়ে গিয়েছে। পথের ধারে বসে পড়ে এক হাত বাড়িয়ে রাখলে পথচারীরা দু-এক কোপেক্ করে ছুঁড়ে দিত।

না, এবার এগোতে হয়···কিন্তু এই চেহারা নিয়ে ভেরার সঙ্গে দেখা করতে যাবে কোন মুখে?

একটু এগোতে উপহার সামগ্রী বিভাগ পড়ল। নকল জড়োয়া গয়নাও ছিল। মেয়েরা কিচির-মিচির করতে করতে পছন্দ করছিল, পরে দেখছিল আর বাতিল করছিল। চোয়ালে লম্বা কাটা দাগওলা আধা-ভিখারী আর আধা-ফৌজী ওলেগ্ ওদের মাঝখানে হাজির হয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চেয়ে রইল।

কাউণ্টারের মেয়ে কর্মীটি মুচকি হাসল। এ লোকটি তার দেহাতী প্রিয়তমার জন্য কি কিনতে চায়? ও ওলেগের ওপর চোখ রাখতে থাকল, পাছে ওলেগ্ কিছু সরিয়ে ফেলে।

কিন্তু ওলেগ্ না কিছু দেখাতে বলল না নিজে কিছু পছন্দ করল। ও স্রেফ উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে তাকিয়ে রইল।

দামী পাথর আর ধাতুর সম্ভার ঐ বিভাগে। কিছু প্লাস্টিক ও ছিল। পুরোটাই ঝকঝকে কাঁচে ঢাকা। ওলেগ্ ঐ বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে, যেন অবরুদ্ধ পথের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এক ষাঁড়। ওলেগের মাথা ঐ অবরোধ ভেদ করতে অপারগ।

তারপর ওর মনে হ'ল···মনে হ'ল কোন মেয়ের জন্য কোন সুন্দর জিনিষ কিনতে পার', তার বুকে সেই উপহার পিন দিয়ে আটকিয়ে দেওয়া কিংবা গলায় পরিয়ে দেওয়া কত সুখকর অনুভূতি। এত কাল ও এ অনুভূতি সম্পর্কে অনবহিত, অচেতন ছিল। কিন্তু চেতনা একবার জাগ্রত হওয়ার পর তা এত তীব্র হ'ল যে তারপর কোন উপহার ছাড়া ও ভেরার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে না।

ভেরাকে তেমন কিছু দেওয়ার মত সম্পর্কই নেই। ওলেগের সে সাহসই নেই। ও তেমন কিছুই দিতে পারে না। দামী উপহারগুলো দেখার কোন মানে নেই। আর সস্তা উপহারের ও কি বা জানে? ঐ ব্রুচ্‌গুলো···না. ওগুলো একেবারে খেলো। বরং নক্সাকাটা পেন্ডাণ্টগুলো, বিশেষতঃ কাঁচের স্ফটিক বসানো, ছ'কোণা পেন্ডাণ্টটা আরো ভাল নয়?

কিন্তু ঐ পেন্ডাণ্টটাও কি একটু খেলো আর নিম্ন রুচির মনে হচ্ছে না? ······হয়ত ভেরার মত রুচিবান মেয়ে ও জিনিষ ঘেন্নায় ছুঁয়েও দেখবে না··· ওসব গয়নার চল হয়ত, অনেক কাল আগেই উঠে গিয়েছে···ভেরার কোন্‌টা অপছন্দ তা কি করে জানা যাবে?

তাছাড়া, ও ভেরাকে উপহারটা দেবেই বা কি বলে? রাত কাটাতে এসে

ওকে উপহার দিলে যে লজ্জারুণ ভেরা একটা কথাও বলতে পারবে না।

সংকোচ আর দ্বিধা ওর চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন করে দিল। এ পৃথিবী বড় বেশী জটিলতায় ভরা। মেয়েদের ফ্যাশন সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে হবে, জড়োয়া গয়না পছন্দ করার যোগ্যতা থাকতে হবে, আয়নায় নিজের ভব্য চেহারা ফুটিয়ে তুলতে হবে, জামার কলারের সাইজও জানা থাকতে হবে……আর ভেরা এই পৃথিবীতে বাস ত' করেই, এর সবকিছু জানে এবং এ পৃথিবীতে এতটুকু অস্বস্তি বোধ করে না।

ওলেগের ভারি বিব্রত আর মনমরা লাগল। আবার, ভেরার সঙ্গে দেখা করতে হলে এখনই যেতে হয়। এখনই!

কিন্তু……ও পারবে না। ওর……সে মনের জোর নেই। ও…… ভীত। বিভাগীয় বিপণিটাই ওদের দু'জনকে আলাদা করে দিয়েছে……

ওলেগ্ টলমল করতে করতে ঐ অভিশপ্ত মন্দির থেকে বেরিয়ে এল যে মন্দিরে বাজারের উপাস্য দেবতার ভক্তদের অনুগামী ওলেগ্ অত স্থূল বাসনা নিয়ে সাগ্রহে ঢুকেছিল। দেহ এবং মন অবসন্ন। যেন ও হাজার হাজার রুবল খরচ করে সব বিভাগ থেকে কিছু কিছু কিনেছে, ওরা তা প্যাক করে দিয়েছে, আর ওলেগ্ সেই প্যাকিং বাক্সের পর্বত বয়ে নিয়ে চলেছে।

অথচ বোঝা বলতে ছিল শুধু একটা ইস্ত্রির।

খুব ক্লান্ত লাগছিল। মনে হচ্ছিল একের পর এক অর্থহীন জিনিষ কেনায় ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট করেছে। আনকোরা নতুন, সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতিবহ সেই নিষ্পাপ, গোলাপী সকাল কোথায় গেল? আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পিঁজে পালখের আকার নেওয়া নরম মেঘের দল যার মধ্যে চাঁদের ডিঙি বয়ে যায়?

এই সকালেও ওর যে নিষ্কলুষ আত্মা ছিল তা কোথায় পদদলিত হল? বিভাগীয় বিপণিতে……না তার আগেই ও তা মদের সঙ্গে পান করে ফেলেছে। না, তারও আগে শিক-কাবাবের সঙ্গে খেয়ে ফেলেছে। ফুটন্ত খোবানি গাছ দেখার পরই ভেরার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া উচিত ছিল……

ওলেগের বিরক্তি এল। একগাদা দোকানের সাজানো জানলা আর বিজ্ঞাপনের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে ত' বটেই, ক্রম বর্দ্ধমান আনন্দে ডগমগ কিংবা দুশ্চিন্তায় নুয়ে পড়া মানুষের ভিড় ঠেলে পথ চলতে হচ্ছিল বলেও বটে। কোন নদীর ধারে ছায়ায় শুয়ে পড়তে পারলে ভাল হত; শুধু শুয়ে থাকলেই অনেক পরিশুদ্ধ হওয়া যেত। সারা শহরে যাওয়ার মত জায়গা বলতে বাকি আছে শুধু চিড়িয়াখানা। ডিওম্‌কাও চিড়িয়াখানা দেখতে বলেছিল।

বন্য প্রাণী জগৎ অনেক বেশী সহানুভূতিশীল। ওর মানসিক স্তরের অনেক কাছাকাছি।

ওর আরো অবসন্ন লাগছিল ওভারকোটের জন্য। ওভারকোটটা যেমন

ভারী তেমনি গরম। অথচ ওকে আলাদা করে বওয়াও যায় না। ওলেগ্ লোকজনকে চিড়িয়াখানার পথ জিজ্ঞেস করল। বেশ ক'টা চওড়া চওড়া, শান্ত পথ পেরোতে হ'ল। গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ পথ। দোকান-পাট, ফটো, বিজ্ঞাপন, থিয়েটার, মদের দোকান, এসব কিছুই ঐ পথ ক'টায় নেই। দূরে কোথাও ট্রলির ঘড়ঘড় শোনা যাচ্ছিল। এ পথগুলোয় ছিমছাম, শান্ত রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশ। গাছের ছায়াতেও শীত লাগে না। ছোট-ছোট মেয়েরা পথের ধারে খেলছিল আর ছোটাছুটি করছিল। গৃহস্থবা বাড়ীর সামনের বাগানে নতুন চারা গাছ পুঁতছিল কিংবা চারা গাছের গায়ে বাঁশের ঠেকো লাগাচ্ছিল।

চিড়িয়াখানার গেটের কাছে তো রীতিমত শিশুদের রাজত্ব। তাই সেদিন [illegible] স্কুল ছুটির দিন।

চিড়িয়াখানায় ঢুকে ওলেগ্ প্রথমে দেখতে পেল পাকানো শিংওয়ালা পাঁঠা। ওর আস্তানার চার দিকে উঁচু পাথরের ঢালু বেড়া. তারপর একটা খাদ। ঠিক খাদের কিনারে সব [illegible], চারটে মজবুত পায়ে ভর করে অদ্ভুত সুন্দর শিং [illegible] উঁচু করে গর্বিত পাঁঠাটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর শিং দুটো যেন হাতীর দাঁত থেকে তৈরি। ওর দাড়ি নেই। কিন্তু হাঁটু ছোঁয়া, অপর্যাপ্ত কেশের রাশি। কেশগুলো যেন জলপরীর চুলের মত সুন্দর। পাঁঠাটার হাবভাব এত আভিজাত্য মণ্ডিত যে অত চুল থেকেও ওকে মেয়েলি বা সঙের মত দেখাচ্ছিল না।

মসৃণ পাথরের খাদের কিনারে ও কখন পা বদল করে দেখার আশায় যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের হতাশ হতেই হবে। ও অনেকক্ষণ ধরে এক মূর্তির মত নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল, যেন পাথরের বেড়ার এক অংশ। তেমন বাতাস ছিল না বলে ওর চুলগুলোও নড়ছিল না। ফলে ও জীবন্ত কিনা সন্দেহ হচ্ছিল।

ওলেগ্ যে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে দেখল পাঁঠাটা তার মধ্যে একটুও নড়ল না। ওলেগ্ মনে মনে তারিফ করে এগিয়ে গেল। জীবনের দুরূহ পথ অতিক্রম করতে মানুষের ও ঐ রকম অবিচল ভাব থাকা দরকার।

ওলেগ্ চিড়িয়াখানার মধ্যে আরেকটা পথের মুখে এসে পড়ল। একটা খাঁচাকে ঘিরে প্রাণ-চঞ্চল মানুষের জটলা। অধিকাংশই শিশুর দল। খাঁচার মধ্যে কি যেন এক প্রাণী অনবরত এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে বারবার একই জায়গায় ফিরে আসছে। অবিকল লোক কাহিনীর মত এক কাঠবিড়ালি আর চক্রের খেলা চলছে। এত দিনে সেকেলে হয়ে যাওয়া লোককাহিনীটা বাস্তবে দেখা যাবে ভাবা যায় না। কিন্তু এখানে একটা কাঠবিড়ালি সেই খেলাই খেলছিল। খাঁচার ভেতরে ওপর দিকে শুকনো ডালপালা মেলে দেওয়া একটা গাছও আছে। কিন্তু কেউ শয়তানি করে গাছের কাছাকাছি একটা দু'মুখ খোলা ড্রাম রেখে দিয়েছে। ড্রামের নিচের দিকে কয়েকটা পাত আড়াআড়ি করে লাগানোর ফলে একটা কখনো শেষ না হওয়া সিঁড়ির

বিভ্রান্তি মনে আসে। কাঠবিড়ালিটা গাছের উপস্থিতি ভুলে অনবরত ঐ সিঁড়ির ধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে মরছে, যদিও কেউ ওকে ঐ ড্রামে ঢুকতে বাধ্য করেনি কিংবা খাবার দিয়ে প্রলুব্ধ করেনি। ও মেতেছে অবিশ্রাম ছোটাছুটির আকর্ষণে। হয়ত প্রথমে কৌতূহল বশে ঐ সিঁড়ি পরখ করেছিল, ওটা যে কত মন মাতানো এবং নিষ্ঠুর খেলা হতে পারে সে বিষয়ে অনবহিত। এতক্ষণে সেই প্রথম অভিজ্ঞতার হাজার বার পুনরাবৃত্তি ঘটেও ওর জ্ঞানোদয় হয়নি।

ড্রামটা দ্রুতগতি ঘুরপাক খাচ্ছিল। ধোঁয়াটে-লাল লেজ তুলে ধূসর-লাল দেহ টানটান করে হাড় বের করা কাঠবিড়ালিটা পাগলের মত ছোটাছুটি করছিল। অত দ্রুতগতি দোলার ফলে ড্রামের নিচের দিকে আড়াআড়ি করে রাখা পাতগুলো যেন খুলে বেরিয়ে আসে আর কি। বেচারী দেহের প্রতিটি বিন্দু শক্তি দিয়ে ছুটছিল। যে কোন মুহূর্তে ওর ছোট্ট বুকটা যেন ফেটে যাবে। তবু ও কিছুতেই সামনের পা দু'টো ওপরে তুলতে পারছিল না।

ওলেগ্ ওখানে পৌঁছনোর আগে থেকেই অনেক লোক দাঁড়িয়ে কাঠবিড়ালির খেলা দেখছিল। ও যে কয়েক মিনিট দাঁড়াল তাতে খেলার কোন পরিবর্তন ঘটল না। বাইরে থেকে কেউ ঐ ড্রামের ঘূর্ণন বন্ধ করে বেচারীকে উদ্ধার করার প্রশ্ন ওঠে না। ওকে থামতে বললে ওর তা বোঝবার ক্ষমতাও নেই। ঐ মারাত্মক খেলা থামানোর পথ একটাই, তা ওর মৃত্যু। ওলেগ্ তা দেখতে অনিচ্ছুক। অতএব ওখান থেকে সরে গেল।

ঢোকার পথের দু'দিকে জীবনযাত্রার দুই পৃথক পদ্ধতি দিয়ে চিড়িয়াখানা যুবা-বৃদ্ধকে সমান সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

ওলেগ্ রুপোলী, সোনালী আর লাল-নীল পালখ মেশানো ফিজান্ট্ পাখীর খাঁচা পেরিয়ে গেল। ময়ূরের অবর্ণনীয় সুন্দর আসমানী রঙের গলা আর গজ খানেক চওড়া, লাল-গোলাপী কিনারওলা পেখম দেখে বিস্ময়ে চোখ ফেরে না। নির্বাসন আর হাসপাতালের এক রঙা জীবনের পর এ যে রঙের ভোজ।

তেমন গরম লাগছিল না। অত খোলামেলা চিড়িয়াখানায় গাছের ছায়ার অভাব নেই। হাঁটতে হাঁটতেই ওলেগের ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছিল। আন্দালুসীয় মুর্গী, তুর্কী আর খল্মোগোরি হাঁসের খাঁচা পথে পড়ল। একটু উঁচু টিলার ওপর সারস, বাজপাখী আর শকুনের বাসা। আরেকটু এগিয়ে, চিড়িয়াখানার সবচেয়ে উঁচু জায়গায়, একটা টিলার ওপর তাঁবুর মত বাসা। সাদা-মাথা শকুনের বাসা। নিচে বিজ্ঞপ্তি দেখে চেনা যায়, নইলে ঈগলের বাসা বলে ভুল হয়। অত উঁচুতে বাসা হলেও ওদের বাসার চাল তেমন উঁচু নয়। সেজন্য মনমরা পাখীগুলোর ডানা ছড়াতে অসুবিধে হয়। বেচারাদের কোথাও উড়ে বেড়ানোর নেই। অথচ নিজের জায়গায় বসে সুখে ডানা ঝাপটাতেও পারে না।

দুর্ভোগ ভোগা শকুনগুলোকে দেখে ওলেগ্ নিজের কাঁধ দু'টো নাচাল,

যেন ও ডানা ছড়াবে। (আসলে হয়ত ও এতক্ষণে ইঁদুরির ওজন টের পাচ্ছিল)

ওলেগ্ যা কিছু দেখে তারই মন মত ব্যাখ্যা গড়ে নেয়। একটা খাঁচায় বিজ্ঞপ্তি লটকানো আছে: 'সাদা পেঁচারা বন্দী অবস্থায় বাঁচে না।' কর্তৃপক্ষ তাহলে একথা জানে! তবু ত' পেঁচাদের খাঁচায় বন্দী করে রাখে! বন্দী অবস্থায় যে পেঁচা বেঁচে থাকে সে কত নিকৃষ্ট ধরনের?

আরেক বিজ্ঞপ্তিতে লেখা: 'সজারুরা নিশাচর।' বাস্তবে কিন্তু, সজারুদের রাত সাড়ে ন'টায় খাঁচায় পুরে রেখে ভোর চারটেয় ছেড়ে দেওয়া হয়।

আবার বিজ্ঞপ্তি: 'ব্যাজার [ইঁদুর জাতীয় সর্বভুক প্রাণী] গভীর এবং জটিল গর্তে বাস করে'। হ্যাঁ, ঠিক আমাদের মত। নইলে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে কি করে? ব্যাজারের মুখটা ডোরাকাটা। শয়তান বুড়োর মুখের মত।

ওলেগের সবকিছুতে এত বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী যে ওর পক্ষে চিড়িয়াখানায় আসাই ঠিক হয়নি, যেমন ঠিক হয়নি বিভাগীয় বিপণিতে যাওয়া। ওদিকে দিনের বেশীটা কেটে গেলেও প্রতিশ্রুত অপূর্ব আনন্দের তখনো দেখা নেই।

ওলেগ্ ভাল্লুকের খাঁচায় এসে দাঁড়াল। কালো ভাল্লুকটার গলায় সাদা রঙের বেড়, যেন টাই পরেছে। ও খাঁচার শিক আর জালের ওপর দিয়ে মুখ বের করে দাঁড়িয়েছিল। ও হঠাৎ লাফিয়ে উঠে খাঁচার দাঁড়ে ঝুলতে লাগল। ওর টাইটা আর টাইয়ের মত দেখাচ্ছিল না, বরং খৃষ্টীয় যাজকের গলায় ঝুলন্ত চেনের সঙ্গে লাগানো ক্রুশের মত লাগছিল। বেচারী আর কি করে নিজের হতাশা ব্যক্ত করবে?

পাশের খাঁচায় ওর বান্ধবী শাবকদের নিয়ে বসেছিল। আরেক খাঁচায় এক ধূসর রঙের ভাল্লুক বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল। ও অস্থিরভাবে মাটিতে পা আছড়িয়ে আছড়িয়ে খাঁচায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। খাঁচাটা ওর দেহের তিনগুণের বেশী বড় নয়। হেঁটে বেড়ানো দূরে থাক ওর পক্ষে কোন মতে এপাশ-ওপাশ করা সম্ভব।

সুতরাং ভাল্লুকদের নিজের মাপকাঠিতে এ ধরনের বসবাস শাস্তি বৈকি। কিন্তু শিশুদের ঐ দেখেই আনন্দ। ওরা পরস্পর বলাবলি করছিল, "এই, ভাল্লুকটাকে ঢিল ছোঁড়, ও লজেন্স মনে করবে।"

ওলেগ্ লক্ষ্য করেনি যে শিশুরা ওকে লক্ষ্য করছে। ওদের কাছে ওলেগ্ একটা জন্তু, যাকে বিনা পয়সায় দেখা যায়। ওলেগ্ নিজের মূর্তি দেখতে পাচ্ছিল না।

পথটা নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। ওখানে মেরুর ভাল্লুক আছে। এক জোড়া ভাল্লুক। ওদের খাঁচার মধ্যে দিয়ে কয়েকটা সেচের নালা বয়ে গিয়েছে। আরাম পাওয়ার জন্য ওরা প্রায়ই নালার বরফ-গলা জলে লাফিয়ে পড়ে, আর পরক্ষণেই শান বাঁধানো বিশ্রামের জায়গায় লাফিয়ে উঠে হাত-পা

দিয়ে গায়ের জল ঝেড়ে ফেলে। ওদের নালার পাশে শান বাঁধানো জায়গাটায় ঘোরাঘুরির শেষ নেই।

আচ্ছা, গরম কালে যখন তাপমাত্রা ৪০° সেঃ গ্রেঃ হয় তখন মেরুর ভাল্লুকদের কি অবস্থা হয়? কি আবার হবে, অন্য দেশের মানুষ মেরু অঞ্চলে পৌঁছলে যা হয় তাই হবে।

খাঁচায় বন্দী জন্তুদের বিষয়ে সবচেয়ে অদ্ভুত কথা হ'ল ওলেগের যদি সে ক্ষমতা থাকত তবুও ওলেগ্ ওদের মুক্তি দিতে দ্বিধা করত। কারণ স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা মুক্তির স্বাদ ভুলেছে। হঠাৎ মুক্তি পেলে ওদের ক্ষতি বই লাভ হবে না।

পথে হাতীর দেখা মিলল। ওর স্থানাভাব অতি করুণ। ভারতীয় গাভী আর সোনালী খরগোসের খাঁচা পেরিয়ে আবার টিলায় উঠতে হ'ল। এবার বাঁদরের বাসা।

যুবা-বৃদ্ধ বাঁদরদের খাওয়াচ্ছিল আর বাঁদরের খেলা দেখে মজা পাচ্ছিল। বাঁদরগুলোর গা প্রায় লোমহীন, যেন ক্লিপ দিয়ে ছাঁটা। আদিম সুখ-দুঃখে নিমজ্জিত, তক্তার ওপর বসে থাকা বাঁদরদের দেখে ওলেগের প্রাক্তন পরিচিত ব্যক্তিদের কথা মনে পড়ে গেল। এখনো তাদের অনেকে জেলে বা আর কোথাও রয়েছে। অনেকের সঙ্গে বাঁদরগুলোর সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট।

ফোলা-ফোলা চোখ, একাকী এক শিম্পাঞ্জি দু'হাঁটুর ফাঁকে দু'হাত ঝুলিয়ে কি যেন ভাবছিল। ওকে দেখে শুলুবিনের কথা মনে পড়ল। শুলুবিন অবিকল ঐ রকম করে প্রায়ই বসে থাকে। এমন উজ্জ্বল, উষ্ণ দিনে শুলুবিন হয়ত জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে পড়ে কাতরাচ্ছে।

বাঁদরের খাঁচা তেমন মজার লাগল না। ওলেগ্ এগিয়ে চলেছিল, হঠাৎ দেখল আরেকটা বাঁদরের খাঁচার সামনে বিজ্ঞপ্তি লটকানো, এবং লোকে তা পড়ছে। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। শূন্য খাঁচার সামনে চিরাচরিত বিজ্ঞপ্তি, 'ম্যাকাক্ রেসাস্' (বাঁদরের প্রাণীবিদ্যাগত নাম)। তার নিচে তাড়ঘাড়িতে লেখা আরেকটা বিজ্ঞপ্তি পেরেক ঠুকে লাগানো: 'এই খাঁচায় যে ক্ষুদ্রকায় বাঁদরটি বাস করত সে এক দর্শকের বিবেচনাহীন নিষ্ঠুরতার ফলে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। দুষ্ট ব্যক্তিটি ওর চোখে তামাক ছুঁড়ে দিয়েছিল।'

ওলেগ্ হতবাক। এর আগে পর্যন্ত ও দুষ্টুমি মেনে নেওয়া মন নিয়ে অনেক খাঁচা দেখেছে, মুচকি হেসেছে। ওর মনে হ'ল যেন কেউ ওর নিজের চোখে তামাক ছুঁড়ে দিয়েছে। ওর সারা চিড়িয়াখানাময় দাপাদাপি করে, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, "কেন তামাক ছুঁড়বে? কেন? কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ যত!"

কি শিশুর মত সরল ভাষায় বিজ্ঞপ্তিটা লিখেছে! বদলোকটা নিশ্চয় নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে। অথচ তাকে 'মানবতা বিরোধী' বা 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল' অভিহিত করা হ'ল না; সে শুধু 'দুষ্ট'। দুষ্টু

শিশুর ত' প্রতিরোধ ক্ষমতা বিহীন জন্তুদের ঐ রকম ক্ষতি করে না।

বিজ্ঞপ্তিটা অত পড়েও শিশু আর বুড়োর দলের বারবার শূন্য খাঁচাটায় উঁকি দেওয়া থামে না। ওলেগ্ ওর গোলা-গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, রঙ জ্বলে যাওয়া চামড়ার থলে বয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল। ঐ থলের মধ্যে ইস্তিরি পোরা। এবার সরীসৃপের রাজত্বে।

বালুময় প্রান্তরে, নুড়ি পাথরে হেলান দিয়ে পেল্লায় পেল্লায় কুমীর পরস্পর গা জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। ওদের চলাফেরার স্বাধীনতা তেমন বিঘ্নিত হয়েছে কি?

একটা চীনে মেছো-কুমীর ঢালাই লোহার মত কালো, থ্যাবড়া মুখ বের করে শুয়ে আছে। থাবাগুলো ওপর দিকে ওল্টানো। এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা আছে, ও গরম কালে রোজ মাংস খায় না।

অত্যন্ত সুগঠিত ব্যবস্থাপনা না থাকলে কি প্রাণীদের অত বিভিন্ন ধরণের খাদ্য জোগানো সম্ভব?

এক গাছে এক বড সড অজগর ঐ গাছের ডাল বনে গিয়েছে। অজগরটা সম্পূর্ণ অনড় ও শুধু মাঝে মাঝে জিভ বের করছিল। এক জারের নীচে একটা ছোট বিষাক্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে পডে আছে। কয়েকটা চন্দ্রবোড়া সাপও আছে।

ওলেগের মাথায় তখনো অন্ধ হয়ে যাওয়া বাঁদরটার কথা ঘুরছিল। ওর আর সরীসৃপ দেখতে ভাল লাগল না।

ওলেগ্ মাংসাশী পশুদের খাঁচায় এসে পড়েছিল। এখানকার জানোয়ারদের একে অপরকে টেক্কা দেওয়া অপূর্ব রঙের বাহার। শীতের দেশের বনবিড়াল, তুষার নেকড়ে, ছাই-বাদামী পুমা আর বাদামীর ওপর কালো ছোপ লাগা জাগুয়ার। ওরাও স্বাধীনতা খুইয়ে বন্দী। তবু বন্দী শিবিরের গুণ্ডাদের সম্পর্কে ওলেগের যা মনোভাব ওদের সম্পর্কেও তাই। বদমাইশদের চিনতে কোথাও কারো অসুবিধে হয় না। এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা আছে, জাগুয়ারটা রোজ ১৪০ কিলো মাংস খায়। ওলেগের শিবিরের বন্দীরা যে এক সপ্তাহে অত মাংস পেত না! শিবিরের 'বিশ্বস্ত' বন্দীদের কথা মনে পড়ল। 'বিশ্বস্ত'রা আস্তাবলে কাজ বেছে নিত। যাতে ঘোড়ার দানা চুরি করে খেয়ে প্রাণ ধারণ করা যায়।

আরেকটু এগিয়ে বাঘের খাঁচা। বাঘের গোঁফ-দাড়ি সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে। ওর ক্রুর স্বভাব গোঁফ দাড়িতেই বেশী প্রকাশ পায়। চোখদু'টো পিঙ্গল······ওলেগের মনে অপ্রাসঙ্গিক চিন্তার উদয় হ'ল। ও অগ্নিবর্ষী চোখে বাঘটার দিকে তাকাল।

শিবিরে ওলেগের এক পুরানো রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সে এক সময় তুরুখানস্ক-এ [১৯১৭ সালের বিপ্লবের আগে স্ট্যালিন ঐখানে

নির্বাসিত হয়েছিলেন] নির্বাসিত হয়েছিল। সেই ওলেগ্‌কে বলেছিল বাঘের চোখ মসৃণ কালো হয় না, পিঙ্গল হয়।

ঘৃণায় জর্জর ওলেগ্‌ আর বাঘের খাঁচা থেকে নড়তে পারে না।

ওর অসুস্থ বোধ হ'ল। ওর আর চিড়িয়াখানায় থাকতে ইচ্ছে করল না। সিংহ দেখতেও মন চাইল না। পালাতে ইচ্ছে করল। ও বেরোনোর পথ খুঁজতে লাগল। গেটটা কোন দিকে ?

একটা জেব্রা ছুটে চলে গেল। ওলেগ্‌ থামল না।

তারপর হঠাৎ · ···একটা বিস্ময় দেখে ও থমকে দাঁড়াল। অত মাংসাশী স্থূলতার পর আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতা রূপী নীলগাই। ফিকে বাদামী রঙের হরিণীর কাছাকাছি দেখতে নীলগাই। হাল্কা পা-গুলো। অত্যন্ত সজাগ, কিন্তু একটুও ভীত নয়। ও জালের পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস ভরা, বড়বড়, নরম চোখে ওলেগ্‌কে দেখছিল। যেন ওর চোখে মৃদু ভর্ৎসনা : "আধবেলা পেরোনোর আগে আমায় দেখতে আসতে পারলে না ? কেন ?

এ যেন সম্মোহন বিদ্যা। ওর আত্মা ওলেগের আত্মাকে ডেকে কথা কইতে চাইছিল। ও স্পষ্টতঃ ওলেগের জন্যই দাঁড়িয়েছিল। ওলেগ্‌ একটু এগোতেই ওর ক্ষমা সুন্দর চোখ দুটো বলল, "আসবে না ? আমি যে তোমারই প্রতীক্ষারত···"

ঠিকই ত' ওলেগ্‌ আর কখন যাবে ? ও কি কখনই যাবে না ?

ওলেগ্‌ নিজের মনকে মোচড় দিয়ে বেরোনোর পথ ধরল।

সে হয়ত এখনো ওলেগের পথ চেয়ে আছে।

······ আর, শেষ দিন

ওর সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে ওলেগের মনে উগ্র লোভ বা উদগ্র কামের উদ্রেক হ'ল না ! ওলেগের একমাত্র আনন্দ পূর্ণ আত্ম সমর্পণে। তার চেয়ে বড় সুখ ওলেগ্‌ কল্পনাও করতে পারে না। অত সহজ-সরল, প্রায় জান্তব প্রক্রিয়া অবলম্বন কি সম্ভবপর ? তার বদলে ওলেগের একান্ত ভব্য, প্রায় মাফ চাওয়া গোছের, কিছু কথা বলতে হবে। জবাবে ভেরাও তাই করবে। এই ব্যাপারে এত জটিল প্রক্রিয়াই হাজার বছর ধরে চলে আসছে !

গতকাল ওকে যেমন দেখেছিল ভেরা অবিকল তেমনি ওলেগের মানশ্চক্ষে ফুটে উঠল। এই কথা বলতে গিয়ে ওর গাল দুটো তেমনি রাঙা হয়ে উঠেছে : "আচ্ছা আমার ফ্ল্যাটে থাকতে তোমার···অসুবিধে হবে ?" ওর সঙ্গে দেখা হলে ভেরার গালে সেই লজ্জায় রক্তিম ভাব অবশ্যই আবার ফুটবে, কিন্তু ওলেগ্‌ ওকে বিব্রত করতে চায় না। ওলেগ্‌ বরং হাল্কা হাসি দিয়ে ওর লজ্জা দূর করে দেবে। ওলেগ্‌ তাই প্রথম যে কথা ক'টা বলবে তাই ভাবতে

লাগল—কোন ভব্য এবং হাল্কা কথা যাতে পরিস্থিতির আড়ষ্টতা কেটে যায়। ওলেগ্ অবশ্য, নিজের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। কিন্তু সে ডাক্তার যে যুবতী। আর ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে এসে তারই বাড়ীতে রাত কাটানো, কেমন কথা? না, ওলেগ্ কোন প্রাথমিক কথা সম্পর্কে ভাববে না। ভেরা দরজা খোলার পর ও স্রেফ বলবে "ভেগা, আমি এসেছি!" ওকে ভেগা বলে ডাকতেই হবে। নইলে চলবে না।

হাসপাতালের ওয়ার্ডে নয়, ডাক্তারদের রোগী দেখার ঘরে নয়, ভেরারই বাড়ীতে ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটানো, কিছু কথা বলা এক সীমাহীন আনন্দের ব্যাপার হবে। ওলেগ্ হয়ত কিছু ভুল-ভ্রান্তি করবে, উল্টো কথাই বলে বসবে। আর যাহোক, ও সভ্য সমাজের রীতিনীতিতে অভ্যস্ত নয়; ওর পক্ষে এ মার্জনীয় আচরণ। ওর চোখ দুটো কিন্তু বলতে থাকবে: "আমার দোষ-ত্রুটিই শুধু দেখবে? আমি যে তোমাকে ছাড়া আর পারি না!"

কি করে যে এত সময় নষ্ট হয়ে গেল। অনেক আগেই ও কেন ভেরার কাছে গেল না? তাই উচিত ছিল। এখন ত' জোর কদমে হাঁটতে হচ্ছে। সব সঙ্কোচ বর্জন করে। শুধু ভয়, ভেরার সঙ্গে দেখা হবে না। আধবেলা শহরময় ঘুরে বেড়িয়ে এখন পথঘাট চেনা।

যদি দু'জনে গরমিল না হয়, যদি দু'জনে কাছাকাছি বসে কথাবার্তা বলা যায়, আর কথাবার্তার মাঝখানে যদি ওর হাতে হাত রাখা যায়, ওকে জড়িয়ে ধরে ওর চোখের গভীর চোখে রাখা যায়, ঐটুকুই কি যথেষ্ট হবে না? আর তার চেয়েও বেশি যদি কিছু—না, ঐটুকুই যথেষ্ট।

ভেরার বেলায় ঐটুকু যথেষ্ট হবে না। কিন্তু ভেরা [illegible] নলগাইসের মত চোখ ভেরা [illegible]। ভেরা... ভেরার হাতে হাত রাখার সম্ভাবনায় ওলেগ্ রোমাঞ্চিত হল। বুকটা শক্ত হয়ে এল। তারপর কি কি ঘটবে এই চিন্তায় ও ডুবে গেল। যেটুকু হবে ভেবেছে তাই যথেষ্ট, তাই নয়?

ভেরার [illegible] যত কাছাকাছি আসে ততই উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সে এক ভীতি, সুখকর ভীতি। ঐ ভীতিতেও কত সুখ।

ওলেগ্ জোর পায়ে হাঁটতে থাকল। দোকানপাট, দোকানের জানলা, ট্রলিবাস, লোকজন, এসব কিছুই ওলেগ্ দেখছিল না। ওর লক্ষ্য রাস্তার নাম। একটা রাস্তার মোড় এল। মোড়ের মাথায় এক বুড়ী ফুল বেচছিল। নীল নীল ফুলের ছোট ছোট স্তবক। বুড়ীকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

বারবার লাঙল চালিয়ে ওলট-পালট করে দেওয়া, সেচ দেওয়ার পর বাড়তি জল বের করে নেওয়া, সব শেষে সুব্যবস্থিত ওর স্মৃতির গভীর কোণে এক আবছা ধারণা লুকিয়েছিল যে, কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে হলে ফুল হাতে নিয়ে যেতে হয়। ও এই প্রথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। তাপ্পি লাগানো, ভারী, জরাজীর্ণ চামড়ার থলে কাঁধে নিয়ে ও দিব্যি হেঁটে চলেছিল। থেমে পড়ার মত সামান্যতম সংশয়ও মনে দেখা দেয়নি। হঠাৎ ফুলে চোখ পড়ল।

লোকে ফুল কিনছিল। ওলেগ্ ভুরু কুঁচকিয়ে কি যেন মনে করার চেষ্টা করল। একটা আবছা স্মৃতি মনে ভেসে এল, যেন গভীর এবং কালো জলাশয় থেকে উদ্ধার করা কোন শব। ঠিক, ঠিক ঠিক! এক বিস্মৃত অতীতে, প্রায় ওর অস্তিত্ববিহীন যৌবনের জগতে মেয়েদের ফুল দেওয়ার রীতি ছিল বটে।

"এগুলো এগুলো কোন্ ফুল?" ওলেগ্ লজ্জা চেপে প্রশ্ন করল।

"এগুলো ভায়োলেট, আর কোন্ ফুল," ফুলওলী অপমানিত স্বরে বলল, "এক গোছার দাম এক রুবল।"

ভায়েলেট? এ কি সেই ফুল যার কাব্যে অত উল্লেখ? ওর চেনা ভায়োলেটের স্মৃতি একটু অন্য ধরনের। ভায়োলেটের ডাঁটা আরো দীঘল, লাজ-নম্র, আর ঘটির মত দেখতে ফুল হওয়ার কথা। হয়ত ওর স্মৃতির ভুল, কিংবা স্থানীয় ভায়োলেট ঐ ধরনেরই হয়। ভায়োলেট ছাড়া আর কোন ফুল ফুলওলীর কাছে নেই। মনে হ'ল, ফুল ছাড়া ভেরার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া অসম্ভব লজ্জার ব্যাপার হবে। ফুলের কথা না ভেবে এতটা পথ ও কি করে অনায়াসে পেরিয়ে এল ভেবে ওলেগের অবাক লাগল।

কিন্তু, ক'টা কিনবে, একটা? একটা কিছুই নয়। দু'টোও যেন কিপ্টেমি। হঠাৎ বন্দী শিবিরের চালাকির একটা ঝলক মনে দৌড়ে গেল চার রুবলে পাঁচ স্তবক দিতে বললে কেমন হয়? কিন্তু অত দরদাম ওর স্বাভাবিক আচরণ নয়। ওকথা বলা হ'ল না। ও চুপ করে দু'রুবল এগিয়ে দিল।

স্তবক দু'টোয় গন্ধ থাকলেও, সে যেন ওর যৌবনের চেনা, কাব্যের ভায়োলেটের সুবাস নয়। ওলেগ্ অবশ্য, শুঁকতে শুঁকতে তোড়া হাতে নিয়ে চলতে পারে। কিন্তু অসুস্থ, ফৌজ। চাকরি থেকে রেহাই পাওয়া, মাথায় টুপিহীন, চামড়ার এক তাপ্পি দেওয়া থলে কাঁধে একটা লোক ভায়োলেট ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে চলেছে—অদ্ভুত দেখাবে না? বরং ওভারকোটের আস্তিনের মধ্যে ফুলগুলো লুকিয়ে নেওয়া ভাল।

ভেরার বাড়ী। হ্যঁা, এইত'! ও বলেছিল, সামনেই উঠোন। ওলেগ্ উঠোনে পড়ে বাঁয়ে বাঁকল। (বুকের এদিক-ওদিক কি যেন ঠেলাঠেলি করতে লাগল)

একটা লম্বা বারান্দা, তার ওপর ঢালু হয়ে নেমে আসা চাল। চালের নিচে লোহার জালিকাটা মাচান। মাচানে ভাড়াটেরা কম্বল, বালিশ, তোষক শুকোতে দিয়েছে। বারান্দার এক থাম থেকে আরেক থাম অব্দি লম্বা দড়িতে কাপড়-চোপড় শুকোচ্ছে।

জায়গাটা মোটের ওপর ভেরার অনুপযুক্ত। আজেবাজে জিনিষে ভেতরে ঢোকবার পথ আটাকানো। অত্যন্ত অগোছাল। এসব পেরিয়ে, ঐ শুকোতে দেওয়া কাপড়-চোপড়ের লাইনের পর ভেরার ফ্ল্যাট। ভেরার আপন জগৎ।

শুকোতে দেওয়া কয়েকটা চাদরের তলা দিয়ে গিয়ে ওলেগ্ দরজাটা খুঁজে পেল। অন্য দরজাগুলোর মতই সাধারণ দরজা। দরজার উজ্জ্বল বাদামী রঙ

জায়গায় জায়গায় খসে পড়ছে। দরজার সঙ্গে একটা সবুজ রঙের ডাক-বাক্স লাগানো।

ওলেগ্ ওভারকোটের আস্তিন থেকে ভায়োলেটগুলো বের করল। চুল ঠিক করার চেষ্টা করল। ওর বেশ উদ্বিগ্ন আর উত্তেজিত লাগছিল। ভালও লাগছিল। ডাক্তারের কোট বিহীন ভেরাকে ঘরোয়া পরিবেশে কেমন দেখাবে?

ও শুধু ভারী বুট পায়ে চিড়িয়াখানা থেকে অল্প কিছু পথ হেঁটে আসেনি। চোদ্দ বছর ধরে ও দেশের কত যে দূর দূরান্তর কতবার ঘুরে বেড়িয়েছে তার লেখাজোখা নেই। অবশেষে ফৌজ থেকে ছাড়া পেয়ে ও ঠিক সেই দরজায় উপস্থিত যেখানে একজন চোদ্দ বছর ধরে ওর পথ চেয়ে বসে আছে।

ও তর্জনী দিয়ে কোন মতে দরজাটা ছুঁল। ঠিক মত কড়া নাড়ার সময় কোথায়? এর মধ্যে দরজা খুলতে লাগল। (ভেরা আগেই জানলা দিয়ে ওকে দেখেছে নাকি?) দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল চেপ্টে দেওয়া নাক, পশুর মত মুখ, লম্বা চেহারার এক যুবক। সে এক উজ্জ্বল-লাল মোটর সাইকেল ঠেলে বেরিয়ে এল। সোজাসুজি ওলেগের দিকে এগিয়ে আসা মোটর সাইকেলটার অতটুকু দরজার পক্ষে অতিকায় চেহারা। ওলেগ্ কেন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা ও কার সঙ্গে দেখা করতে চায়, যুবক এসব কিছুই জানতে চাইল না। ও স্রেফ মোটর সাইকেলটা এমন করে বের করে আনল যেন ওলেগের কোন অস্তিত্বই নেই। যুবকটি কাউকে জায়গা দেওয়ার পাত্র নয়। ওলেগ্ এক পাশে সরে দাঁড়াল।

ভেগা ত' একা থাকে, তবে যুবকটি এখানে কেন? ও কেন ভেগার ঘর থেকে বেরোল? শ্রম শিবিরের ব্যারাক বাড়ীতে কারো ব্যক্তিগত সত্তা থাকে না বটে, কিন্তু সাধারণ জীবনে, গোষ্ঠী আবাসন প্রকল্পের ফ্ল্যাট ত' ঐ রকম হওয়ার কথা নয়। উশ্-টেরেকে, অবশ্য, গোষ্ঠী আবাসনের ব্যাপার নেই। সেখানে সবাই নিজের বাড়ীতে থাকে।

"আচ্ছা, শুনুন···"ওলেগ্ যুবককে বলল। যুবক তার আগেই ঝুলন্ত চাদর পেরিয়ে মোটর সাইকেলটা সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। সিঁড়িতে চাকার ফাঁপা শব্দ হচ্ছিল।

যুবক ঘরের দরজা খোলাই রেখেছিল। অনালোকিত বারান্দার ভেতর দিকে প্রথমে একটা, তারপর আরো দু'টো দরজা দেখা গেল। ভেরার কোন্‌টা। আধা-অন্ধকারে একটি স্ত্রীলোককে দেখল। স্ত্রীলোকটিও বাতি জ্বালল না।

"কাকে চাই?" স্ত্রীলোকটি আক্রামক ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল।

"ভেরা কর্নিলিয়েভ্না" ওলেগ্ এমন করে বলল যে ও নিজের গলা চিনতে পারল না।

"ও নেই," স্ত্রীলোকটি তীক্ষ্ণ, সংশয়াতীত বিরোধিতা প্রকাশ করে বলল। ও ওলেগের দিকে তাকানোর কিংবা কোন দরজা নেড়ে দেখার তোয়াক্কা না

করে ওলেগের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। ওলেগ্ বাধ্য হয়ে ক' পা পেছিয়ে দাঁড়াল।

"একটু কড়া নেড়ে দেখবেন?" ওলেগ্ নিজ সত্তা ফিরে পেয়ে বলল। ভেরার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ওকে নরম করে দিলেও, ও এখন ভেরার পড়শীদের সঙ্গে সহজভাবে দ'ুএক কথা বলতে সক্ষম। "ওর আজকে কাজে যাওয়ার কথা নয়" ওলেগ্ বলল।

"আমি জানি। ও নেই। ও ছিল, কিন্তু এখন বেরিয়েছে," স্ত্রীলোকটি ওলেগ্‌কে ভাল করে দেখল। স্ত্রীলোকটির কপাল নিচু। চোয়াল তোবড়ানো। ও ওলেগের ভায়োলেট ফুলগ‌ুলো দেখে ফেলল। এখন আর ল‌ুকানোর মানে হয় না।

ভায়োলেটগ‌ুলো হাতে না থাকলে ওলেগ্ একটুও কিন্তু-কিন্তু ভাব করত না। ব‌ুক চিতিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নেড়ে নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করত। ভেরা কতক্ষণ হ'ল বেরিয়েছে, একটু পরেই ফিরবে কিনা না জেনে ছাড়ত না। ভেরাকে একটা চিঠিও লিখে ফেলত। হয়ত ভেরাই ওর জন্য কোন চিঠি রেখে গিয়েছে, কে জানে?

কিন্তু ভায়োলেটগ‌ুলো যে ওকে এক হ্যাংলা, উপহার বওয়া, উপযাচক, আহাম্মক প্রেমিক প্রতিপন্ন করে তুলেছে…

গাল তোবড়ানো স্ত্রীলোকটির আক্রমণে ওলেগ্ পেছ‌ু হটে বারান্দায় চলে এল। তব‌ু স্ত্রীলোকটি ছাড়ে না। ওকে শ্যেন দ‌ৃষ্টিতে দেখতে থাকল। যেন ওলেগের ফুলে ওঠা ভিখারির ঝোলা দেখে সন্দেহ, ও কিছ‌ু চুরি করতে পারে।

উঠোনে মোটর সাইকেলটা থেকে থেকে উদ্ধত, বিস্ফোরক আওয়াজ করছিল। ওতে শব্দ নিরোধক লাগানো নেই। ওর ইঞ্জিনের গর্জন থামল, আবার শোনা গেল, শেষে থেমে গেল।

ওলেগ্ ইতস্ততঃ করল। স্ত্রীলোকটি ওর দিকে বিরক্তি ভরা চোখে তাকাল।

ভেরা নেই, এ হতে পারে? ও যে কথা দিয়েছিল। কিন্তু ভেরা যদি অনেকক্ষণ ওর অপেক্ষায় বসে থেকে কোথাও চলে গিয়ে থাকে? সে এক বিপর্যয় হবে। ছোট-খাটো মন্দ বরাত বা হতাশা নয়, রীতিমত বিপর্যয়।

ওলেগ্ ভয়োলেটের তোড়া ধরা হাতটা ওভারকোটের আস্তিনের মধ্যে ঢ‌ুকিয়ে নিল। যেন ওর হাতের পাঞ্জা কাটা পড়েছে।

"আচ্ছা, ভেরা কি ফিরে আসবে, না কাজে গিয়েছে, তা বলতে পারেন?"

"ও বেরিয়েছে," স্ত্রীলোকটি হ্রস্ব জবাব দিল।

কিন্তু ওটা কি একটা জবাব হ'ল? কিন্তু স্ত্রীলোকটির সামনে দাঁড়িয়ে থেকেই বা কি লাভ?

মোটর সাইকেলটা কয়েক বার ফট্‌ফট্ করল, গর্জন করল, তারপর আবার চুপচাপ।

বারান্দার রেলিঙে মেলে দেওয়া বালিশ, তোষক আর কম্বলের সারি থামের মধ্যে চিঠির মত ওয়াড়ের নিচ থেকে রোদে শুকোচ্ছিল।

শয্যা দ্রব্যের ঐ পাহাড় যেন ওলেগ্‌কে ডেকে বলল, "কি জন্য অপেক্ষা করছ, ভাই?" ওলেগ্‌ আর কিছু ভাবতে পারল না।

গাল তোবড়ানো স্ত্রীলোকটির তাকিয়ে থাকারও কামাই নেই।

হতচ্ছাড়া মোটর সাইকেলটাও ওলেগকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। ওটা কিছুতে স্টার্ট নেবে না।

ওলেগ্‌ শয্যা দ্রব্যের দুর্গ থেকে পিছু হটে সিঁড়িতে নেমে এল। ও প্রত্যাখ্যাত।

একটা বালিশ—এক কোণ দোমড়ানো, গরুর স্তনের মত ঝুলতে থাকা দুটো কোণ আর ছুঁচলো পাথরের মত বেরিয়ে থাকা চতুর্থ কোণ—ঐ বালিশটা না থাকলে ওলেগ্‌ নিজেকে সংযত রেখে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারত, অত চট করে চলে যেত না। ও বুঝে নিত, ভেরা কিছু পরেই ফিরে আসবে। ওলেগ্‌ অপেক্ষা না করে চলে গেলে ভেরা দুঃখ পাবে। খুবই দুঃখ পাবে।

কিন্তু ওর পরীক্ষিত বিশ্বাসযোগ্য অভিজ্ঞতায় ঐ বালিশ, তোষক, কম্বল, কম্বলের ওয়াড় আর বিজ্ঞাপনের মত ঝুলতে থাকা চাদরগুলোর যে তাৎপর্য দাঁড়াল তাকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা ওলেগের ছিল না। অধিকারও ছিল না। বিশেষতঃ ঐ সময়। বিশেষতঃ ওলেগের।

মনে যত কাল বিশ্বাস বা আশা থাকে পুরুষ ততকাল ন্যাড়া তক্তায় ঘুমোতে কিছু মনে করে না। পুরুষ বন্দী তাই করে যেহেতু উপায়ান্তর বিহীন। পুরুষ সঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন নারী বন্দীর বেলাও একই কথা খাটে। কিন্তু নারী-পুরুষ যেখানে একত্র হতে সম্মত হয়, সেখানে নরম বালিশের নিশ্চিন্ত আশ্রয় তাদের ন্যায্য পাওনা হয়। ওরা এটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হয় যে যেটুকু ওদের পাওনা তা ফাঁক যাবে না।

ওলেগ্‌ ঐ দুর্ভেদ্য দুর্গে ঢুকতে না পেরে সরে এল। ও ফিরে চলল। ভারী ইস্তিরিটা পিঠে ঠকাস ঠকাস করতে থাকল। ওর একটা হাত কাটা পড়েছে। বালিশের ব্যারিকেড অনায়াসে মেশিনগান চালিয়ে ওর পিঠ ঝাঁঝরা করে দিল।

মোটর সাইকেলটাও স্টার্ট নেয় না। আপদ কোথাকার!

গেটের বাইরে পৌঁছতে মোটর সাইকেলের শব্দের তীব্রতা কমল। ওলেগ্‌ একটু থামল। আরেকটু অপেক্ষা করে দেখবে নাকি?

ওলেগ্‌ তখনো ভেরার জন্য অপেক্ষা করার ইচ্ছে ত্যাগ করেনি। ভেরার ফিরতে হলে এই জায়গাটা এড়ানোর উপায় নেই। দু'জনে দেখা হলে হেসে বলবে: "আরে · ···" "জানো, কি হয়েছে····· ?" "এমন এক বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটল, জানো··· "

ওলেগ্‌ কি তখন মিইয়ে যাওয়া, দুমড়ে যাওয়া ভায়োলেটগুলো ওভারকোটের আস্তিন থেকে বের করে ওকে উপহার দিতে পারবে?

ভেরা ফিরে এলে ওরা সেই উঠোন আর বারান্দাতেই ফিরে যাবে, কিন্তু ঐ ফুলে থাকা, আত্মপ্রত্যয় পূর্ণ বালিশের ব্যারিকেডকে এড়াতে পারবে না। ঐ ব্যারিকেডের সামনে দিয়েই যেতে হবে। তাতে যা ঘটে ঘটুক।

এক দিন, আজই না হোক তবু কোন এক দিন ভেরা, লঘু চলন ভেরা, গাঢ়-বাদামী আর উজ্জ্বল চোখ এবং অপার্থিব 'ভেরা, সবকিছুতে এই ধূলির ধরাতলের সম্পূর্ণ বিপরীত ভেরা নিজের আরামপ্রদ, ছোট্ট বিছানা একই বারান্দায় শুকোতে দেবে। হ্যাঁ, ভেরাও।

নীড় ছাড়া পাখী বাঁচে না, বিছানা ছাড়া নারী।

যত অমর, যত অপার্থিবই ভেরা হোক না কেন ওর রাতের অবধারিত আট ঘণ্টা ঘুম আর তারপর জাগা এড়ানোর উপায় নেই।

বেরিয়ে গেল! লাল মোটর সাইকেলটা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওলেগ্ শান্তি পেল।

থ্যাবড়া নাক ছোকরা যেন দিগ্বিজয়ীর মত চলেছে।

ওলেগ্ ফিরে চলল। পরাজিত ওলেগ্।

ও ভায়োলেটগুলো ওভারকোটের আস্তিন থেকে বের করল। ফুলগুলো তখন খাবি খাচ্ছিল। আর ক'মিনিট পরে আর কাউকে উপহার দেওয়া যাবে না।

কালো চুলে বৈদ্যুতিক তারের মত আঁটসাঁট বিনুনি করা দু'টি উজ্‌বেক্ স্কুলের মেয়ে আসছিল। ও দু'হাতে দু'টো তোড়া নিয়ে বলল, "মেয়েরা, ফুল নাও।"

মেয়েরা অবাক। দু'জনে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করল। ওলেগ্‌কে দেখল। ওরা উজ্‌বেক্ ভাষায় কিছু বলাবলি করল। ওরা বুঝল, লোকটা মাতাল নয়, কিংবা ওদের ধর্ষণ করার মতলবে নেই। হয়ত এও বুঝল যে, কোন অঘটন ঘটে যাওয়ার ফলে ফৌজী লোকটি ওদের ফুল দিতে চাইছে।

একটি মেয়ে ফুল নিল। মাথা নিচু করে ধন্যবাদ জানাল। দ্বিতীয় মেয়েটিও তাই করল। তারপর ওরা দ্রুত পায়ে, কাঁধ ঘষাঘষি করতে করতে, বকর-বকর করতে করতে চলে গেল।

ওলেগের কাছে পড়ে রইল শুধু নোংরা, ঘাসে ভেজা, চামড়ার থলেটা। ওর কাঁধের ওপর গুরুভার।

রাত কাটাবে কোথায়? আবার কিছু ভেবে দেখতে হ'ল।

ও হোটেলে থাকতে পাবে না। জোয়ার কাছে যেতে পারবে না। ভেরার কাছেও যেতে পারবে না। 'যেতে পারবে না'র চেয়ে বড় কথা, ও মোটেই যাবে না।

ভেরাকে বাদ দিয়ে সুন্দর শহরটা, লক্ষ লক্ষ বাসিন্দায় সমৃদ্ধ শহরটা যেন ওর কাঁধে এক গুরুভার বোঝা। অথচ এই সকালেই ও এই শহরে আরো কিছু দিন কাটাতে চেয়েছিল।

আরো অদ্ভুত কথা, সকালে অত আনন্দিত হওয়ার কারণটা কি? রোগা-রোগ্য ওর আর তেমন বড় আশীর্বাদ মনে হচ্ছিল না।

কয়েকটা বাড়ী পেরোনোর পর ওলেগ্ বুঝতে পারল ওর কত খিদে পেয়েছে, পা দু'টো কত টনটন করছে, শরীর কত অবসন্ন লাগছে আর তখনো পরাস্ত না হওয়া টিউমারটা কেমন পেটের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহর থেকে পালাতে চাইল।

যে উশ্-টেরেকে ফেরার পথ তখনো খোলা ছিল ওকে তা আর আকর্ষণ করল না। হতাশায় ডুবে মরা ছাড়া আর কোন পথই নেই।

ওর এমন কোন জিনিষ বা জায়গার কথা মনে পড়ল না যাতে মনের ভার দূর হতে পারে।

এক, ভেরার কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া। ভেরার কছে নয় আত্ম সমর্পণই করবে। কিন্তু সেখানে যে ও 'যেতে পারবে না'র চেয়ে বড় কথা, ও মোটেই যাবে না।

ওলেগ্ এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করল, ক'টা বাজে। বেলা দু'টো বেজে গিয়েছে। এখন সিদ্ধান্ত না নিলেই নয়।

একটা ট্রলি-বাস এল। ঐ নম্বরের ট্রলি কমেন্দাতুরার দিকে যায়। ওলেগ্ ট্রলিতে উঠে ওর প্রয়োজনীয় স্টপেজ খুঁজতে লাগল।

ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে, বিশেষতঃ বাঁকের মুখে,—সেও কত অসুস্থ—, ট্রলিটা পাথর বাধানো সরু সরু রাস্তা দিয়ে ওলেগ্‌কে টেনে নিয়ে চলল। ওপর থেকে ঝুলন্ত চামড়ার বেল্ট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ওলেগ্ মাথা ঝুঁকিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ দিকটায় সবুজের বালাই নেই, কেবল বিশ্রী দেখতে বাড়ীর সারি আর ফুটপাথ। একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ালে লটকানো আছে। কোথাও খোলা জায়গায় সিনেমা দেখাবে। বিকেলে। মন্দ নয়। কিন্তু পৃথিবীর সব নতুনত্বে ওলেগের আগ্রহ উবে গিয়েছিল।

ভেরা সগর্বে ষোল বছরের একাকিত্ব সহ্য করেছে বটে, কিন্তু ছ'মাস একাকিত্বের বৈপরীত্য কি করতে পারে তা ভেরা জানেনা; অর্থাৎ সান্নিধ্য তবু সান্নিধ্যের অভাব।

ওলেগ্ নিজের স্টপেজ চিনে নেমে পড়ল। এবার দেড় কিলোমিটার হাঁটা। কারখানা অঞ্চল। পথঘাট চওড়া হলেও নয়নানন্দ নয়। অনবরত লরি আর ট্রাক্টরের ছোটাছুটি। পাথরের লম্বা দেওয়ালের গা দিয়ে ফুটপাথ চলে গিয়েছে। প্রথমে এক কারখানার রেল লাইন, তারপর প্রকাণ্ড এক কয়লা ডিপো পেরিয়ে, খানা-খন্দ ভর্তি বেশ বড় খোলা মাঠ আর আরো রেল লাইনের পর সারি সারি একতলা কাঠের বাড়ীর—সরকারী ফাইলে যারা 'অস্থায়ী অসামরিক আবাসন' হিসেবে চিহ্নিত হয়েও বিশ-তিরিশ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে—ধার দিয়ে। অবশ্য, জানুয়ারিতে যখন ওলেগ্ প্রথম কমেন্দাতুরায় দেখা করতে এসেছিল তখনকার মত পথঘাটে কাদা নেই। যাহোক পথটা

একই রকম দীর্ঘ আর আনন্দহীন। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এটাও সেই শহরের এক পথ যে শহরের আরেক দিকে রাস্তার মাঝ বরাবর ফুলের কেয়ারি, ধারে ধারে মোটা মোটা গুঁড়িওলা ওক্ গাছ, মাথা উঁচু পপলার, আর অপূর্ব গোলাপী রঙের ফুলন্ত খোবানি গাছের ছড়াছড়ি।

ভেরা নিজেকে যতই বোঝানোর চেষ্টা করুক না কেন যে ও ঠিক কাজ করেছে, আসল কথাটি চিরদিনই মনের অতলে শুয়ে থাকবে না, একদিন স্পষ্ট হবেই। তখন ওর দুঃখ হবে আরো, আরো বেশী।

কমেন্দাতুরা, অর্থাৎ যে দপ্তরে শহরে আগত অনাবাসিক নির্বাসিতদের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়, শহরের অত দূর কোণে রাখা যে কার দুর্বুদ্ধি প্রসূত কে জানে? কাদাময় মেঠো পথঘাট পেরিয়ে কয়েকটা ব্যারাক বাড়ীর সারি। ভাঙা জানলাগুলোয় প্লাইউডের তাপ্পি মারা। পর পর দড়িতে অজস্র ধোয়া কাপড-চোপড শুকোচ্ছে। হ্যাঁ, এই ত'।

ওলেগের গতবার কমেন্দান্ত-এর অভ্যর্থনা মনে পড়ল। সাপ্তাহিক কাজের দিনেও ওঁর কাজ করতে হচ্ছিল বলে বেজার মুখ। কমেন্দান্ত-এর ব্যারাকের বারান্দায় উঠে ওলেগ্ নিজেব চেহারায় কিছুটা ভব্য, আত্মমর্যাদা পূর্ণ ভাব ফোটানোর চেষ্টা করল। ওকে যারা জেলে পোরে তারা আপ্যায়নের হাসি হাসলেও ওলেগ্ হাসবে না। ও যে ওদের আচরণের কোন কিছু ভোলেনি এটা ওদের বুঝিয়ে দেওয়া ওলেগের কতব্য।

ওলেগ্ কডা নেড়ে, ভেতরে ঢুকল। প্রথম ঘরে সামনের দিকে রাখা, হেলান দেওয়ার জায়গা বিহীন দুটো লম্বা, নড়বড়ে কেঠো বেঞ্চি। একটা প্লাইউডের পার্টিশন। পার্টিশনের পেছনে একটা টেবিল, যেখানে মাসে দুবার কমেন্দান্ত বহিরাগত নির্বাসিতদের নথিভুক্তির পবিত্র কর্তব্য সম্পাদক করেন বলে ধরে নেওয়া চলে।

কেউ নেই। আরেকটু এগোতে একটা দরজা হাট করে খোলা। দরজায় লেখা ঃ কমেন্দান্ত্। ওলেগ্ দরজা অব্দি পেঁছে উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, "ভেতরে আসতে পারি?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়!" সাদর অভ্যর্থনা শোনা গেল।

অসম্ভব! ওলেগ্ কখনো এন কে ভি. ডি'র কোন পদস্থ কর্মীকে ঐ সুরে কথা বলতে শোনেনি। কমেন্দান্ত্ ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না। কমেন্দান্ত্ তাঁর চেয়ারে বসেছিলেন। কিন্তু এ সেই লোকটি নয়। আগের লোকটি ছিল বিজ্ঞ ভাণ করা এক মূর্খ যে সব সময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকতে চাইত। এ এক শিক্ষিত, মার্জিত, নরম মুখভাব আর্মেনীয়। লোকটি ইউনিফর্ম পরেনি, একটা ভাল স্যুট পরেছে, যা ব্যারাকের পরিবেশে বেখাপ্পা। লোকটির হাবভাব একটুও উদ্ধত নয়। আর্মেনীয়টি ফুর্তিভরা দৃষ্টিতে ওলেগের দিকে তাকাল। যেন ওর কাজ থিয়েটারের টিকিট বিক্রি করা, এবং ওলেগ্ এক সঙ্গে অনেকগুলো টিকিট কিনতে চায় বলে ও খুশি।

বন্দী শিবিরে অত বছর কাটানো ওলেগের পক্ষে আমে নিয়ানটিকে প্রথমে সুনজরে না দেখাই স্বাভাবিক। এন. কে. ভি. ডি'র লোকগুলি সংখ্যায় অতি অল্প হলে হবে কি ওরা পরস্পরের স্বার্থ রক্ষায় সদা সচেষ্ট ; ওরা শিবিরের সেরা কাজগুলো দখল করে——ভাঁড়ারে, রান্নাঘরে ইত্যাদি—— যাতে মাখনের মত দুর্লভ বস্তুও ওরা পায়। তবু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে ওলেগ্ ওদের দোষ দিতে পারত না। আর যাহোক বন্দী শিবির উদ্ভাবন ওরা করেনি। সাইবেরিয়াও উদ্ভাবন করেনি। ওরা যে পরস্পরকে সাহায্য করবে না বা বিপদ থেকে রক্ষা করতে চাইবে না, এমন উচ্চ নৈতিক আদর্শ কোথায় ? নিজ নিজ কাজ-ধান্ধা ছেড়ে ওরা কোদাল কোপাতে যাবে কেন ?

নিজের সরকারী চেয়ার-টেবিলে উপবিষ্ট, বন্ধুত্বপূর্ণ চেহারার আমে-নিয়ানটিকে দেখে ওলেগের মনে হ'ল অনাড়ম্বর, সহজ আচরণ আর্মেনিয়ানদের এক বিশেষ গুণ।

ওলেগ্ নিজের পুরো নাম বলল। বলল, ও অস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নিজের নাম নথিভুক্ত করিয়েছিল। মোটা-সোটা মানুষ হলেও কমেন্দান্ত্ চেয়ার থেকে সাগ্রহে উঠে, একটা ফাইল বের করে তা থেকে অনেকগুলো কার্ড দেখতে লাগলেন। তার সঙ্গে যেন ওলেগের সময় কাটানোর সুবিধার্থে আপন মনে বিড়বিড় করে চললেন। মাঝে মাঝে এক-আধজন লোকের নামও উচ্চারণ করছিলেন, যা ঐ পদাধিকারীর পক্ষে নিষিদ্ধ আচরণ।

"হ্যাঁ, এই বার দেখা যাক······কালিফোতিদেস্······কনস্ট্যান্টিডেস··· আপনি একটু বসুন, প্লিজ্······কুলায়েভ্,······কারামুরিয়েভ্, এই যে পেয়েছি ···কাজ্‌মাগোমায়েভ্······ কস্টোগলোটভ্ !"

আরেকবার এন কে. ডি. ডি'র নিয়ম অগ্রাহ্য করে উনি ওলেগ্‌কে নিজের নামের প্রথমাংশ উচ্চারণ করতে না বলে, নিজেই প্রশ্ন করলেন, "ওলেগ ফিলিমনোভিচ্ ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা। আপনি তেইশে জানুয়ারি থেকে ক্যানসার চিকিৎসালয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন···" কমেন্দান্ত্ কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, "তা কেমন চিকিৎসা হ'ল ? অনেকটা ভাল আছেন ত' ?"

ওলেগের মন ভরে গেল। কৃতজ্ঞতায় কথা আটকিয়ে গেল। মানুষের মন ভরতে কতটুকু লাগে ? ঐ হতচ্ছাড়া টেবিলগুলোর পেছনে অল্প কিছু হৃদয়বান মানুষ বসলেই জীবন একেবারে বদলিয়ে যেতে পারে। ওলেগের আর বাধো-বাধো ভাব হচ্ছিল না। ও সহজ ভাবে বলল, "ঠিক কি বলব বুঝতে পারছি না···এক দিক থেকে দেখলে আগের চেয়ে ভাল আছি, আরেক দিক থেকে দেখলে আগের চেয়ে খারাপ···(আগের চেয়ে খারাপ ? মানুষ কত অকৃতজ্ঞ হতে পারে! হাসপাতালের মেঝেয় শুয়ে যে শুধু মরতে চেয়েছিল,

সে তার চেয়ে খারাপ থাকে কি করে ?)······মানে, মোটের ওপর ভালই আছি।"

"বেশ, বেশ, খুব ভাল", কমেন্দান্ত্ খুশি মনে বললেন, "আপনি বসুন।"

থিয়েটারের টিকিট কাটতেও একটু সময় লাগে। ওলেগের কাগজপত্রে সীলমোহর লাগাতে হ'ল, তাতে কালিতে তারিখ লিখতে হ'ল, তারপর একটা মোটা খাতায় নকল করা হ'ল, সব শেষে আরেকটা মোটা খাতা থেকে কিছু কেটে দিতে হ'ল। কমেন্দান্ত্ এ সবই হাসি মুখে করলেন। ওলেগের প্রমাণপত্র আর রেলে যাতায়াতের অনুমতিপত্র ফাইল থেকে বের করে ওলেগ্‌কে দিলেন। ওঁর চাউনি অভিব্যক্তি ব্যঞ্জক, গলার স্বরে হোমড়া-চোমড়া সরকারী কর্মচারীর ভাব নেই। উনি আগের চেয়ে একটু নিচু গলায় বললেন, "শুনুন, এসব নিয়ে মন খারাপ করবেন না। খুব শিগ্‌গীরই এসব উঠে যাবে।"

"কি উঠে যাবে ?" ওলেগ্ অবাক।

"আপনি বুঝতে পারছেন না ? এই নথিভুক্ত করার কথা বলছি। আপনার নির্বাসন আর কমেন্দানত্‌ও উঠে যাবে", উনি সহজ হেসে বললেন।

নিশ্চয় ভদ্রলোক কোন আরো আরামের চাকরি বাগিয়েছেন তাই ঐ কথা বলছেন। "তাই নাকি ? তেমন কোন ·· নির্দেশ এসেছে নাকি ?" ওলেগ্ সাগ্রহে বলল।

"না, নির্দেশ পাইনি," কমেন্দানত্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কিন্তু তেমন কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমি আপনাকে খোলাখুলি বলছি, ঐটাই হতে চলেছে। আপনি রোগ সারিয়ে নিন। আপনার আবার জগতে ফিরে যেতে হবে।"

ওলেগ্ কুটিল হেসে বলল, "আমি প্রায় এ জগতের বাইরের মানুষ।"

"আপনার পেশা কি ?" "আমার কোন পেশা নেই।"

' আপনি কি বিবাহিত ?" "না।"

"খুব ভাল," কমেন্দান্ত্ প্রত্যয় সহ বললেন, "যারা নির্বাসনে বিয়ে করে তারা ছাড়া পেয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করবেই। সেটা বিশ্রী। আপনি ছাড়া পাওয়ার পর নিজের দেশে ফিরে বিয়ে করতে পারবেন।"

"তাই যদি হয় তবে আপনাকে ধন্যবান জানাই," ওলেগ্ যাওয়ার জন্য উঠে পড়ল।

কমেন্দানত্ বিদায় জানাতে মাথা নোয়ালেন বটে, করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন না।

ওলেগ্ কমেন্দানত্-এর কথা ভাবতে ভাবতে বেরোল। উনি ।ক আগেও এই রকম ছিলেন, না···কালের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছেন ? উনি কি স্থায়ী না না অস্থায়ী কমেন্দানত্ ? কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ এই ধরনের মানুষদের কমেন্দান্ত্ নিয়োগ করা শুরু করেছে নাকি ?

আবার ব্যারাক বাড়ীর সারি, রেল লাইন, কয়লার ডিপো, দু'ধারে

কারখানাওলা লম্বা পথ পেরিয়ে ফেরা। ওলেগ্ অনেক জোর কদমে হাঁটছিল। একটু পরেই গরমের জন্য ওভারকোট খুলে ফেলতে হ'ল। কমেন্দানত্ যে আনন্দের কলস পূর্ণ করে দিয়েছিলেন তা ওর পুরো সত্বায় ছড়িয়ে পড়ছিল। ও ধীরে ধীরে তার পুরো তাৎপর্য উপলব্ধি করছিল।

ধীরে ধীরে উপলব্ধির কারণ, ও আমলায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। এই আমলারা, ক্যাপ্টেনরা আর মেজররা যেভাবে যুদ্ধের পরের বছরগুলোয় রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য ব্যাপক মার্জনা ঘোষণার প্রস্তুতি চলছে বলে ইচ্ছাকৃত মিথ্যে খবর ছড়াত, ওলেগ্ তা কি ভুলতে পারে? বন্দীরা ঐ মিথ্যে আশার বাণী বেদ বাক্য মনে করত: "ক্যাপ্টেন নিজে আমাকে ঐকথা বলেছে!" আসলে কিন্তু, উৎপাদনের লক্ষমাত্রা অর্জন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বন্দীদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য, ঐ উচ্চপদস্থ কর্মীদের স্রেফ এমন কোন লক্ষ্য বা আশার কথা শোনাতে বলা হয়েছিল যা অবলম্বন করে তারা টিকে থাকতে পারে।

ঐ আর্মেনিয়ানটি সম্পর্কে বড়জোর এটুকু সন্দেহ করা চলে যে ও যেন একটু বেশী জানে, অন্ততঃ নিজের পদের চেয়ে অনেক বেশী কথা বলে। অথচ খবরকাগজের টুকরো খবর পড়ে ওলেগ্ নিজেই কি এ ধরনের কোন কথা শোনার আশা করেনি?

ঐ সুখবরটি সত্যিই এত দিনে বাস্তব হওয়া উচিত। বরং বেশ দেরী হয়ে গিয়েছে। মানুষ যদি টিউমারে মারা যেতে পারে তবে অতগুলো বন্দী শ্রম শিবির আর নির্বাসন কেন্দ্রের মত টিউমার নিয়ে একটা দেশ কতকাল বেঁচে থাকতে পারে?

ওলেগের আবার খুব ভাল লাগল। কি ভাগ্য ও এখনো বেঁচে আছে! কিছু দিন পরই ও লেনিনগ্রাদ যাওয়ার টিকিট কিনতে পারবে। সত্যিই আবার সন্ত আইজাক-এর গীর্জার থামগুলো হাত দিয়ে ছুঁতে পারবে? ওর বুক যে আনন্দে ফেটে যাবে!

কিন্তু সন্ত আইজাক-এর কথা কেন? মুক্তি পেলে ওর আর ভেরার সবকিছুই ত' বদলিয়ে যাবে। সত্যি যদি · বাস্তবে···না, এ আর নিছক কল্পনা নাও রয়ে যেতে পারে। ও এই শহরেই ভেরার সঙ্গে বসবাস করতে পারবে।

ভেরার সঙ্গে থাকা! এ কল্পনাতেই বুক ফেটে যায়।

ভেরাকে এসব কথা জানালে ভেরা কত খুশি না হবে। ও ভেরাকে এসব বলবে নাই বা কেন? কেনই বা ভেরার কাছে ফিরে যাবে না? ওই যদি না বলে তবে এ জগতে আর কে আছে যে ভেরাকে বলবে? ও মুক্তি পেল কি পেল না তা নিয়ে আর কার মাথা ব্যথা?

ট্রলি-বাসের স্টপেজ এসে গিয়েছিল। এবার নির্বাচন করতে হবে কোন

ট্রলিতে উঠবে—স্টেশনের না ভেরার বাড়ীর। দেরী করা চলবে না। ভেরা বেরিয়ে যাবে। সূর্য অস্তগামী হয়েছে।

ওলেগের আবার উত্তেজনা বাড়ল। আবার ভেরার জন্য মন উচাটন হ'ল। কমেন্দান্তুরায় যাবার পথে যে জোরদার যুক্তিগুলো খাড়া করেছিল তার কোনটা টিকল না।

ও ভেরার কাছে যাবে নাই বা কেন? ও কোন অপরাধ করেনি, কালিমালিপ্ত হয়নি, তবে কেন ভেরাকে এড়িয়ে চলবে? বরং ভেরা ওর যাকিছু চিকিৎসাজনিত অন্যায় করেছে তা জেনেশুনেই করেছে। ওলেগ যখন ঐ চিকিৎসার বিরুদ্ধে অত যুক্তিতর্ক করছিল ভেরা স্রেফ চুপ করে পশ্চাদপসারণ করেনি?

তবে কেন ওলেগ ভেরার কাছে যাবে না? কেন দু'জনে মিলে সাধারণ ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করবে না? ওরাও ত মানুষ। অন্ততঃ ভেরা ত' তাই।

ও ভিড় ঠেলে এগোল। ও যে ট্রলিতে উঠতে চায় সেই ট্রলির জন্য অনেকেই স্টপেজে অপেক্ষা করছিল। সবাই ঐ দিকে যাবে। ওর এক হাতে ওভারকোট আর অপর হাতে চামড়ার থলেটা ছিল বলে ও হাতল ধরতে পারল না। ভিড়ে চেপ্টিয়ে, এক পাক ঘুরে ও ট্রলির পা-দানিতে, শেষে ভেতরে ঢুকতে পেল।

যাত্রীর ভিড় ওকে সব দিক থেকে অসভ্যের মত চেপে ধরছিল। ভিড়ের ঠেলায় ও দেখল দু'টি মেয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ছাত্রী মনে হয়। একটি অনেক বেশী ফরসা, অপরটি তত নয়। ওরা দু'জনই এত কাছে যে ওলেগের শ্বাস-প্রশ্বাসও অনুভব করতে পারার কথা। দু'হাতেই জিনিষ থাকার ফলে ও দেহের ভারসাম্য রাখতে পারছিল না। বস্তুতঃ নড়তেই পারছিল না। টিকিট কাটতে পারছিল না বলে কন্ডাক্টর রেগে যাচ্ছিল। ওর বাঁ হাত, যাতে ওভারকোট রাখা, যেন কম ফরসা মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরছিল, আর সারা দেহই ফরসা মেয়েটির দেহের সঙ্গে সেঁটে ছিল। ও মেয়েটির চিবুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত সবই অনুভব করতে পারছিল। মেয়েটিরও অনুরূপ অনুভব করতে পারার কথা।

নর-নারীর নিবিড়তম মিলনও ওদের অত ঘনিষ্ঠ করতে পারত না যা ঐ ভিড় করেছিল। মেয়েটির গলা, কান, অলকগুচ্ছ সবই ওলেগের এত বেশী কাছাকাছি যা ওর অচিন্তপূর্ব। মেয়েটির জীর্ণ পোষাক ভেদ করে তার দেহের উত্তাপ, তার কমনীয়তা, তার যৌবন ওলেগের দেহে সঞ্চারিত হচ্ছিল। অপর মেয়েটি কলেজের ঘটনা সম্পর্কে ওর সঙ্গে তখনো গল্প করছিল। ফরসা মেয়েটি আর উত্তর দিচ্ছিল না।

উশ্-টেরেকে ট্রলি বাস নেই। কেবল মাত্র সেখানকার খনি গর্ভে ওলেগ মেয়েদের এত কাছাকাছি হতে পেরেছে। তাও ওখানে সব সময়

মেয়ে থাকত না। এই নতুন অনুভূতি যেন ও কয়েক যুগের মধ্যে অনুভব করেনি। এ অনুভূতি একান্ত আদিম, তাই অত জোরদার।

ও অনুভূতি যেমন সুখকর তেমনি দুঃখজনক। হাজার ইচ্ছে থাকলেও, সে ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারলেও, ঐ অনুভূতির যে সীমারেখা আছে তা লঙ্ঘন করা অসম্ভব।

তাছাড়া হাসপাতাল থেকে ত' ওকে বলেই দিয়েছে, ইচ্ছে থাকবে, কিন্তু শুধু ইচ্ছেই···

কয়েকটা স্টপ পেরিয়ে গেল। কিছু যাত্রী উঠল, নামলও। কিন্তু এখন আর পেছন থেকে ভিড়ের ঠেলা তেমন ছিল না। ওলেগ্ একটু সরে যেতে পারত, কিন্তু সরল না। ঐ সুখকর নির্যাতন শেষ করার মত মনের জোর পেল না। মনে হচ্ছিল আরো খানিকক্ষণ একই রকম থাকতে পারলে মন্দ হয় না। তাতে যদি ট্রলিটা পুরানো শহরে ফিরে যায় ত' যাক। ট্রলিটা যদি মনের ভুলে ওদের নিয়ে সারা রাতই অনবরত ঘটাং ঘটাং চলে ত' চলুক না। ট্রলিটা যদি সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকে তবু ওলেগের ট্রলি থেকে নেমে পড়ার মত মনের জোর ছিল না। প্রলম্বিত সুখকর অনুভূতিতে নিমজ্জিত ওলেগ্ পেছন থেকে দু'চোখ ভরে ফরসা মেয়েটির কোঁকড়ানো চুলের গোছা দেখছিল। ওর মুখ তখনো ভাল করে দেখা হয়নি।

মেয়েটি সরে গেল। নামার জন্য এগিয়ে গেল।

বেঁকে থাকা দুর্বল হাঁটু দু'টো সোজা করে দাঁড়াতে গিয়ে ওলেগের মনে হ'ল ভেরার সঙ্গে দেখা করতে এই যাত্রার শঠতা আর মনোযন্ত্রণাই শুধু পাওনা হবে।

ভেরার সঙ্গে ওর যে মন বোঝাবুঝি হয়েছিল তার সার কথা, দু'জনের মানসিক লেনদেন আর সবকিছুর চেয়ে মহনীয়। স্বহস্তে সেই দীর্ঘ মানসিক সেতু রচনার পর ওলেগ্ দেখল ওর হাত দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ও এমন কিছুতে ভেরার মতৈক্য আদায় করতে চলেছে যা ওর নিজের মনের কথা নয়। ভেরা হয়ত ওকে ঘরে রেখে, বেরোল। ভেরার ঘরে ও একা একা ভেরার জামা-কাপড় ঘাঁটাঘাঁটি করবে, ভেরার তুচ্ছতম জিনিষগুলো—যেমন ওর সুগন্ধিত রুমাল—নিয়ে আত্মহারা হবে।

না, ওলেগ্ আর কিশোরীর মত ছোট-খাটো জিনিষ নিয়ে আত্মহারা হবে না। ও বরং রেল স্টেশনে যাবে।

ও ট্রলিবাসের পেছনের কামরায় গেল—সামনের কামরার বেরনোর পথ দিয়ে নামলে পাছে অল্প বয়সী ছাত্রী দু'টির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—পেছনের দরজা দিয়ে লাফিয়ে নামল। এক যাত্রী ওকে গালাগাল দিল।

ট্রলি স্টপের অদূরে কেউ ফুল বেচছিল। ভায়োলেট ···

সূর্য আরো খানিকটা নেমেছে। ওলেগ্ ওভারকোট পরে নিয়ে স্টেশনগামী ট্রলিতে উঠল। এ ট্রলিতে অত ভিড় ছিল না।

ঠেলাঠেলি করে স্টেশনে ঢুকতে হ'ল। বারবার প্রশ্ন করে আর ভুল জবাব পেয়ে এগোতে হ'ল। অবশেষে চারদিক ঘেরা বাজারের মত দেখতে একটা চত্বর। সেখানে দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট বিক্রি হচ্ছিল।

চারটে টিকিট বিক্রির জানলা। সব জানলায় দেড় থেকে দু'শো লোকের লাইন। তাছাড়া আরো কিছু লোক লাইনে নিজের জায়গা রেখে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

রেল স্টেশনে টিকিটের জন্য দিনের পর দিন ধরে লাইন লাগানোর ব্যাপারটা ওলেগের অত্যন্ত চেনা। যেন ওর কত কালের পুরানো চেনা। পৃথিবীতে অনেক কিছু বদলিয়েছেঃ ফ্যাশন, রাস্তার আলো, যুবকদের অভ্যাস, আরো কত কি। কিন্তু, ওলেগের মনে পড়ল, রেল টিকিটের লাইন একটুকু বদলায়নি। ১৯৩০-এ যা ছিল, ১৯৩৯-এ ও তাই, ১৯৪৬-এও একই রকম। ওর মনে পড়ল 'নব অর্থ নৈতিক নীতি'র [১৯২১-এ লেনিন প্রবর্তিত নীতি যদ্বারা ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক উদ্যোগ সীমিত করা হয়েছিল] আমলেও খাদা-শস্য উপচিয়ে পড়া দোকান দেখা যেত বটে, কিন্তু অনায়াসে রেলের টিকিট পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। রেল ভ্রমণের অসুবিধে শুধু তাদেরই ভোগ করতে হত না যারা বিশেষ ধরণের কার্ড কিংবা সরকারী অনুমতি-পত্র পেত।

ওলেগের অনুমতিপত্র ছিল। হোমড়া-চোমড়া গোছের না হলেও, ওর কাজ চালানোর উপযোগী।

গরমে ঘাম হচ্ছিল। ও তবু চামড়ার থলে থেকে ফারের একটা আঁট টুপি বের করে মাথায় পরল। টুপি নির্মাতারা কাঠের মূর্তির মাথায় ঐ রকম টুপি পরিয়ে টুপির মাপ যাচাই করে। তারপর চামড়ার থলেটা কাঁধে ঝুলিয়ে ওলেগ্ এমন মুখভাব করল যেন মাত্র দু'সপ্তাহ আগে ওর অপারেশন হয়েছে। শ্রান্তির ভাণ মুখে নিয়ে, চোখে উদ্দেশ্য বিহীন চাউনি ফুটিয়ে, ও লাইনের মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। টিকিট-জানলার কাছে তখন যে কোন মারামারি হচ্ছিল না তার একমাত্র কারণ কাছেই একটি পুলিশ দাঁড়িয়েছিল।

সবার চোখের ওপর ওলেগ্ নিজের দুর্বল শরীরকে কষ্ট দিয়ে ওভার-কোটের পকেট থেকে রেল ভ্রমণের অনুমতি পত্রটি বের করে এনে, পূর্ণ বিশ্বাস সহ 'কমরেড সিপাহী'র হাতে দিল।

পুলিশটি এক ঋজুদেহ, গোঁফওলা উজ্‌বেক্। জেনারেল-এর মত দেখতে। ও ঘটা করে অনুমতিপত্র পড়ে লাইনের মাথায় দাঁড়ানো লোকদের বলল, "এই লোকটিকে সামনে যেতে দিন। এর অপারেশন হয়েছে।" ও ওলেগ্‌কে লাইনের তৃতীয় স্থানে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করল।

ওলেগ্ লাইনে তার পড়শীদের ভাল করে দেখল। ও লাইনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা না করে, মাথা নিচু করে এক পাশে দাঁড়াল। রোদে পোড়া মুখের

ওপর থালার মত চওড়া কিনারওলা টুপি পরা, মোটাসোটা, বয়স্ক এক উজ্‌বেক্‌ ওর হাত ধরে লাইনে ঢুকিয়ে দিল।

টিকিট-জানলার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ওলেগের ভাল লাগল। টিকিট বিক্রেতা মেয়েটি যাত্রীদের টিকিট জানলায় এগিয়ে দেওয়ায় সময় তার আঙুল দেখা যাচ্ছিল। যাত্রীদের হাতে ঘামে ভেজা নোট, যা ওরা প্রয়োজনানুযায়ী পকেট কিংবা বেল্ট থেকে বের করে রেখেছে। যাত্রীদের কিছু বিনম্র অনুরোধ --যা ঐ মেয়েটি নির্দয় ভাবে প্রত্যাখ্যান করছিল— শোনা গেল। লাইন এগোচ্ছিল। দ্রুত।

ওলেগের পালা এল। ও জানলায় ঝুঁকে বলল, "খান-তাউ যাওয়ার একটা সাধারণ টিকিট পাব?"

"কোথাকার?" মেয়েটি প্রশ্ন করল। "খান-তাউ।"

"ঐ স্টেশনের নামই শুনিনি," মেয়েটি দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে রেল স্টেশনের অতিকায় তালিকা দেখতে আরম্ভ করল।

"আপনি সাধারণ টিকট চাইছেন কেন?" ওলেগের পেছনে দাঁড়ানো এক স্ত্রীলোক সহানুভূতি ভরে বলল, "অপারেশনের পর সাধারণ টিকিট? বাঙ্কে উঠতে গেল ত' আপনার সেলাই কেটে যাবে। আপনার সংরক্ষিত টিকিট নেওয়া উচিত।"

"কিন্তু আমার যে অত টাকা নেই," ওলেগ্‌ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কথাটা সত্যি।

"ঐ নামের কোন স্টেশন নেই!" টিকিট বিক্রেতা মেয়েটি স্টেশনের তালিকা দুম্‌ করে বন্ধ করে, বলল, "আর কোন স্টেশনের টিকিট নিন।"

"ঐ স্টেশন থাকতেই হবে," ওলেগ্‌ ম্লান হেসে বলল, "স্টেশনটা সারা বছর খোলা থাকে। আমি নিজে ঐ স্টেশন থেকে এসেছি। যদি জানতাম এমন বিভ্রাট হবে, টিকিটটা রেখে দিতাম।"

"আমি ওসব জানি না। যদি তালিকায় না থাকে, তার মানে ঐ নামের কোন স্টেশন নেই।"

"কিন্তু, আমি জানি ঐ স্টেশনে ট্রেন থামে, কোন ভুল নেই!" ওলেগ্‌ উত্তেজিত হয়ে তর্ক করছিল, যা সবে অপারেশন হওয়া মানুষের করা উচিত নয়। "ওখানে একটা টিকিট ঘরও আছে ·"

"আপনি সরে দাঁড়ান। আপনার টিকিটের দরকার নেই দেখছি! পরের জন আসুন!"

"ঠিকই ত,' উনি কেন আমাদের পথ আটকিয়ে থাকবেন?" পেছন থেকে মন্তব্য শোনা গেল। "যে স্টেশনের টিকিট দিচ্ছে তাই নেও না, বাপু···সবে অপারেশন হয়েছে মানলাম, কিন্তু তাই বলে অত খুঁতখুঁতে হলে চলবে কেন!"

ওলেগ্‌ ওদের সঙ্গে অনেক তর্কাতর্কি করতে পারত। যাত্রী সেবা অধিকর্তা আর স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে করছিল। এই মাথা·

মোটা মানুষগুলোর থেকে কি করে সুবিচার—অত ছোট-খাটো ব্যাপার হলেও সুবিচার প্রয়োজন—আদায় করতে হয় তা দেখিয়ে দিত। আর, উপযুক্ত উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই করতে হলে নিজেকে সব সময় মানুষের মত মানুষ মনে হয়।

কিন্তু পরিবহণ পরিকল্পনার নিয়মগুলো প্রয়োজন-যোগানের নিয়মের মতই লোহ কঠোর। ওলেগের পেছনে দাঁড়ানো যে স্ত্রীলোকটি ওকে সংরক্ষিত আসন নিতে পরামর্শ দিয়েছিল সেই ইতিমধ্যে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে জানলায় টাকা পেঁচাচ্ছিল। যে পুলিশটি একটু আগে ওকে লাইনের মাথায় দাঁড়াতে বলেছিল সেও এখন ওকে এক ধারে সরে দাঁড়াতে ইসারা করছিল।

"আমি যে স্টেশনের টিকিট চাইছি সেটা আমার বাড়ী থেকে তিরিশ কিঃ মিঃ দূরে। আরেকটা স্টেশন আছে, যা সত্তর কিঃ মিঃ দূরে।" কিন্তু ওলেগের এসব কথা, শিবিরের ভাষায়, কেবল নিজের পেট ব্যথা বাড়ায়। "ঠিক আছে, আমাকে চু স্টেশনেরই একটা টিকিট দিন।"

মেয়েটি চু স্টেশন সঙ্গে সঙ্গে চিনল। টিকিটের দামও ওর জানা। ওলেগের বরাত ভাল, একটা টিকিটই পড়েছিল। ও জানলা থেকে তফাতে সরে টিকিটের ফুটো করা জায়গাগুলো আলোয় যাচাই করে নিল, গাড়ীর নম্বর, টিকিটের দাম আর ফেরৎ খুচরো কোপেক্ মিলিয়ে দেখে, ধীরে এগিয়ে চলল।

লাইনে দাঁড়ানো যাত্রীরা ওকে অপারেশন হওয়া মানুষ বলে জেনেছে। তাদের সঙ্গে ওর ব্যবধান যত বাড়ল ও তত সিধে হয়ে দাঁড়াল। হতচ্ছাড়া টুপি খুলে চামড়ার থলেতে পুরল। ট্রেন ছাড়তে পুরো দু'ঘণ্টা বাকি। সংরক্ষিত আসনের আশ্বাস প্রদায়ী টিকিট পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে ভালই লাগছিল। এই সময়টা সাড়ম্বরে ব্যয় করা চলে। আইসক্রিম খেলে মন্দ হয় না; উশ্-টেরেকে ও বস্তু মেলে না। এক গ্লাস কোয়াস্ [রুশদের জাতীয় পানীয়, গম থেকে তৈরি হয়] পান করাও চলতে পারে; ঐ বস্তুও উশ্-টেরেকে মেলে না। ট্রেনের জন্য কিছু কালো রুটি কিনে নিতে হবে। চিনির কথা ভুললে চলবে না। ধৈর্য সহকারে লাইন লাগিয়ে এক বোতল গরম জলও নিয়ে নিতে হবে। পথে নিজের জলের সরবরাহ থাকা দারুণ ব্যাপার। নোনা হেরিং মাছ ত' মোটেই নেবে না। বন্দীবাহী গাড়ী, অর্থাৎ রূপান্তরিত মালগাড়ীতে যাত্রার চেয়ে এ ভ্রমণ কত সহজ আর আরামদায়ক। রেল গাড়ীতে তোলার আগে কেউ তল্লাশি ত' করবেই না, শস্য বওয়ার গাড়ীতে ঠাসাই করে কেউ স্টেশন অবধি নিয়ে আসবে না, কিংবা পাহারাদার ঘেরা আর তেষ্টায় ছাতি ফাটা অবস্থায় আটচল্লিশ ঘণ্টা স্টেশনের চত্বরে মাটিতে বসিয়ে রাখবে না। উল্টে, ওলেগ্ যদি বাঙ্কের ওপর দিকে একটা মাল রাখার তাক বাগাতে পারে তবে পুরো যাত্রাটাই আরামে শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে। এবার আর এক বাঙ্কে দু-তিনজন যাত্রী নয়। ও একা! আরামে শুয়ে পড়বে। টিউমারের ব্যথা

টেরও পাবে না। একেই ত' সুখ বলে! ও প্রকৃতই সুখী মানুষ। আর মিথ্যে অভিযোগ তুলে কি হবে?

তাছাড়া কমেন্দান্তটা ব্যাপক মার্জনা সম্পর্কে কি যেন বক্‌বক্‌ করছিল... তাহলে ওর দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত সুখ সমাগত। কোন কারণে ও কেবল চিনতে পারেনি।

মনে পড়ল, ও ভেরাকে সার্জেন লেভ্‌কে 'লিওভা' বলে ডাকতে শুনেছে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলতেও শুনেছে। যাহোক, লেভ্‌ যদি না হয়, আর কেউ অবশ্যই ভেরার ঘনিষ্ঠ হবে। সুযোগের অভাব নেই। পুরুষ যখন একবার কারো জীবনে স্থান পায় তখন যেন বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে।

ওলেগ সকালে যে চাঁদ দেখেছিল সে চাঁদ দেখে মনে বিশ্বাস জেগেছিল। এ চাঁদটা মিওনো...

এবার প্ল্যাটফর্মে যাওয়া দরকার। কামরায় যাত্রীদের ওঠা শুরু হওয়ার আগেই পেঁছনো উচিত। ট্রেনটা, অবশ্য, ফাঁকাই আসবে। তবু নিজের কামরা খুঁজে বের করে যাত্রীদের লাইনের মাথায় দাঁড়াতে হবে।

ওলেগ্‌ সময় সূচী দেখল। বিপরীত দিকে একটা ট্রেন ছাড়ার কথা, নং ৭৫। ওটাই ওর ট্রেন। যাত্রীরা নিশ্চয় ইতিমধ্যে গাড়িতে উঠতে শুরু করেছে। ও হাঁফানোর ভাণ করতে করতে, ঠেলাঠেলি করে গেটের দিকে চলল। আঙুলের ফাঁকে টিকিটটা অর্ধেক লুকিয়ে রেখে যাকে পারল তাকেই জিজ্ঞাস করল, টিকিট কালেক্টরও বাদ গেল না, "এটা ৭৫ নং ট্রেন? এটাই ত'?"

ওলেগের মনে দারুণ ভয়, পাছে ৭৫ নং ট্রেন ছেড়ে দেয়। টিকিট কালেক্টর ওর টিকিট দেখার তোয়াক্কাই করল না। স্রেফ ওলেগের পিঠ থেকে বেরিয়ে থাকা ভারী থলেয় একটা চাপড় মেরে ওকে সামনে এগিয়ে দিল।

ওলেগ্‌ প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগল। তারপর থেমে, একটা সান বাঁধানো উঁচু জায়গায় ভারী থলেটা নামিয়ে রাখল। ১৯৩৯ সালের, অর্থাৎ ওর জীবনের শেষ স্বাধীন বছরের একটা মজার ঘটনা মনে পড়ল। তখন মলোটভ্‌-রিবেনট্রপ চুক্তি সই হয়ে গেলেও মলোটভ্‌ তখনো বক্তৃতা দেননি আর উনিশ বছর বয়স্কদের বাধ্যতামূলক ভাবে ফৌজে ভর্তির হুকুম জারি হয়নি।

সে বছর গ্রীষ্মে ওলেগ্‌ আর ওর এক বন্ধু ভল্গা নদীতে নৌকা ভ্রমণে বেরিয়েছিল। স্ট্যালিনগ্রাদে এসে নৌকা বেচে দিয়ে স্থির করল ট্রেনে করে ওরা যেখানে পড়ত সেখানে ফিরে যাবে। কিন্তু নৌকা ভ্রমণের পর ওদের হাতে এত বেশী জিনিষপত্র রয়ে গিয়েছিল যে তা ওদের চারটি হাতে বওয়া অসম্ভব। তার ওপর ওর বন্ধু নদী পথের ওপর কোন গ্রামের দোকান থেকে একটা লাউডস্পিকার কিনেছিল। তখনকার দিনে লেনিনগ্রাদে লাউডস্পিকার পাওয়া যেত না।

লাউডস্পিকারটা একটা বক্স-বিহীন, কোণাকৃতি, বড় চোঙ। ওদের দু'জনের ভয়, ট্রেনে তুলতে গিয়ে জিনিষটা ভেঙে যাবে। ওরা স্টেশনে পৌঁছে, ওদের সারা হলঘরে ছড়ানো এক লম্বা লাইনের পেছনে দাঁড়াতে হ'ল। হলঘরটা কাঠের বাক্স, তোরঙ্গ আর থলেয় ঠাসা। ওসব পেরিয়ে ট্রেনে ওঠার আগে ট্রেন ছেড়ে দেবে। যাত্রীর ভিড় এত বেশী যে হয়ত হলেই দু'রাত কাটাতে হবে, যেখানে তিল ধারণের স্থান নেই। তার সঙ্গে ছিল সবার খর দৃষ্টি যাতে কোন যাত্রী অপরকে টপকিয়ে না প্লাটফর্মে পৌঁছতে পারে।

হঠাৎ ওলেগের মাথায় একটা বুদ্ধি এল ঃ ও লাউডস্পিকারটা নিয়ে সোজা ট্রেনের কর্মীদের কামরার সামনে হাজির হ'ল। কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ও লাউডস্পিকারটা তুলে কর্তব্যরত স্ত্রীলোকটিকে দেখাল। স্ত্রীলোকটি দরজা খুলল। ওলেগ্ বলল, "আমি শুধু এই জিনিষটা রাখতে চাই। তাহলেই হবে।" স্ত্রীলোকটি সহানুভূতিসহ মাথা হেলাল, যেন ওলেগ্ সারা দিন ঐ লাউডস্পিকারটা নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়িয়েছে। ট্রেন এল। ওলেগ্ সবার আগে উঠে দুটো লাগেজ রাখার তাক বাগিয়ে নিল।

ওটা ষোল বছর আগের ঘটনা হলেও এখনো কিছুই বদলায়নি।

প্লাটফর্মে ঘোরাঘুরি করতে করতে ওলেগ্ লক্ষ্য করল অন্য যাত্রীরা ওর চেয়ে কম চালক নয়। ওরা এই ট্রেনের যাত্রী না হলেও বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে অপেক্ষা করছে। স্টেশন আর স্টেশনের সামনে বাগানে যত ভিড় প্লাটফর্মে তত নয়। ৭৫ নং ট্রেনের কিছু যাত্রী নিরুদ্বিগ্ন ভাবে প্লাটফর্মে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওরা সবাই সুসজ্জিত। ওরা সংরক্ষিত আসনের যাত্রী। কেউ ওদের আসন ছিনিয়ে নেওয়ার ভয় নেই। কিছু স্ত্রীলোক ফুল হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শুভার্থীরা বিদায় জানাতে এসে ফুল দিয়েছে। বিয়ারের বোতল হাতে নিয়ে কয়েকজন পুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কয়েকজন ফটো তুলছিল। এসব ওলেগের অলভ্য জীবন। ওর বুদ্ধির অতীত জীবন। বসন্তের উষ্ণ বাতাস বইছিল। ছাউনি ঢাকা লম্বা প্লাটফর্মটা দেখে ওর শৈশবে দেখা দক্ষিণ অঞ্চলের একটা জায়গার কথা মনে পড়ল…জায়গাটার নাম বোধ হয় মিনারলনিয়ে ভোডি [কয়েকশাস্ পর্বতাঞ্চলের উষ্ণ প্রস্রবনময় এক স্বাস্থ্য কেন্দ্র]।

প্লাটফর্মের ওপর একটা ডাকঘর। ডাকঘরের সামনে একটা ঢালু টেবিল, যাত্রীদের চিঠিপত্র লেখার সুবিধার্থে। ওলেগের হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এখনই লিখে ফেলা ভাল, নইলে স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ঝোলা কাঁধে নিয়ে ওলেগ্ এগিয়ে গেল। একটা খাম, না দুটো খাম, আর দুটো কাগজ দিতে বলল। হ্যাঁ, একটা পোস্টকার্ডও। তারপর প্লাটফর্মে ফিরে এসে, ইস্তিরি আর কালো রুটি বোঝাই থলেটা দু'পায়ের ফাঁকে নামিয়ে রেখে, ঢালু টেবিলে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে যা সবচেয়ে সহজ কাজ— পোস্টকার্ড লিখতে শুরু করল।

প্রিয় ডিওম্‌কা,

চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। সত্যিই দেখার মত। আমি কখনো অমন ভাল জিনিষ দেখিনি। শ্বেত ভাল্লুক আছে, ভাবতে পারছ? কুমীর, বাঘ আর সিংহও আছে। সুযোগ করে ওখানে একটা গোটা দিন কাটিও। ওখানে খাবারও পাওয়া যায়, কোন চিন্তা নেই। হরিণের মত পাকানো শিঙ পাঁঠা দেখতে যেন ভুল না হয়। একটুও তাড়াহুড়া করবে না। দু'চোখ ভরে দেখবে। আর ভাববে। আর যদি নীলগাই দেখতে পাও, তার বেলাও ঐ করবে। বাঁদরের ছড়াছড়ি। তোমাকে হাসিয়ে পেটে খিল ধরিয়ে দেবে। কিন্তু একটা বাঁদরকে দেখতে পাবে না। একটা বদলোক ওর চোখে তামাক ছুঁড়ে দিয়েছিল। এমনিই, সম্পূর্ণ অকারণে। বেচারী অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ট্রেন আসছে। আর লিখতে পারছি না।

ভাল হয়ে ওঠো। নিজের আদর্শে অটল থেকো। তোমার ওপর ভরসা রাখি।

আলেক্সি ফিলিপোভিচ্‌কে আমার শুভতম ইচ্ছা জানিও। আশা করি তিনি ভাল হয়ে উঠছেন।

শুভেচ্ছাসহ,

ওলেগ্‌।

চিঠি লিখতে ওলেগের মানসিক অসুবিধে হচ্ছিল না। কলমের নিব অসমান বলে কাগজ ছিঁড়ে যাচ্ছিল আর কাগজে কালি বেশী ছড়িয়ে পড়ছিল। ও যত চেষ্টা করুক না কেন এ চিঠিটার চেহারা হ'ল রীতিমত কুৎসিত:

আমার প্রিয় ভাল্লুক ছানা, জোয়েঙ্কা,

আমার অধরোষ্ঠকে প্রকৃত জীবনের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দানের জন্য আমি কত যে কৃতজ্ঞ তা কি করে জানাব। ঐক'টা সন্ধ্যে বরাতে না জুটলে আমি নিতান্ত রিক্ত, নিঃস্ব, লুণ্ঠিত বোধ করতাম।

তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী সুবিবেচক। তাই কোন প্রকার অনুশোচনা বোধ ছাড়াই বিদায় নিতে পারছি। তুমি দেখা করতে বলেছিলে ঠিকই, কিন্তু আমি দেখা করিনি।

তার জন্যও তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমার মনে হ'ল আমরা যা পেয়েছি তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। তাকে পণ্ড করে কাজ নেই। তোমার সবকিছুই আমি চিরকাল সকৃতজ্ঞ চিত্তে মনে রাখব।

তোমার সবচেয়ে সুখী বিয়ের জন্য আন্তরিক শুভ কামনা সহ,

ওলেগ্‌।

এন. কে ভি. ডি'র হেফাজতী কারাগারেও ঐ রকম হত। সরকারীভাবে অভিযোগ জানানোর দিন ওরা এক বিশ্রী দোয়াত, একই রকম বিশ্রী কলম, আর পোস্টকার্ডের চেয়ে ছোট আকারের কাগজ সরবরাহ করত। কালি

কাগজে ছড়িয়ে পড়ে কাগজের অপর পিঠে ফুটে উঠত। ঐ ধরনের লেখার ব্যবস্থায় কাকে কত লিখবে লেখো না।

ওলেগ্ জোয়াকে লেখা চিঠিটা পড়ল, মুড়ে খামে ভরল। খামের মুখ বন্ধ করতে গিয়ে শৈশবে পড়া একটা গোয়েন্দা কাহিনী মনে এল ; ঐ কাহিনীর শুরু ভুল খামে চিঠি ঢোকানো থেকে। যা হোক এখন এ খামের মুখ বন্ধ করা সহজ কাজ নয়। সরকারী নিয়মানুযায়ী, খামের ঢাকনির কিনারে আঠা লাগানো থাকার কথা। সেখানে একটা রেখা আছে বটে, কিন্তু আঠা লাগানো নেই।

ওলেগ্ তিনটে কলমের ভালটা বেছে নিয়ে তার নিব মুছে পরিষ্কার করে নিল। ভাবতে লাগল, শেষ চিঠিটা কিভাবে লেখা যায়। এতক্ষণ ও বেশ মজবুত পায়ে দাঁড়িয়েছিল, এমন কি হাসছিলও। কিন্তু তারপর সব কেমন টলমল করে উঠল। ও স্থির করছিলে 'ভেরা কর্নিলিয়েভ্না' লেখা দিয়ে শুরু করবে, কিন্তু তা না লিখে লিখল ঃ

প্রিয়তমা ভেগা,

সব সময়ই তোমাকে এই নামে ডাকতে চেয়েও পারিনি, তাই অন্ততঃ একবার ডাকার লোভ সামলাতে পারলাম না। তোমাকে একান্ত খোলাখুলি ভাবে কিছু লিখতে চাই, আমরা দু'জনে অত খোলাখুলি ভাবে কখনো কথা বলতে পারিনি। যা বলতে চেয়েও পারিনি আমরা তা নিয়ে ভেবেছি, ভাবিনি? আব যাহোক, যে মানুষটিকে ডাক্তার তার নিজের বাসস্থান এবং শয্যার আশ্রয় দিতে অকুণ্ঠিত সে কি এক সাধারণ রোগী হতে পাবে ?

আজ অনেকবারই তোমার বাড়ী মুখো হেঁটেছি। এক বার ত' বাড়ীতেই পেঁৗছেছিলাম। নব যৌবন প্রাপ্ত কিশোরের মত আবেগ কম্পিত হয়ে গিয়েছিলাম, যা আমার মত জীবন যে মানুষের তার পক্ষে অশোভন আচরণ। আমি যুগপৎ আবেগ কম্পিত, বিব্রত, আনন্দিত এবং ভীত হয়েছি। যুগ যুগান্তের পথ চলার পরই 'ভগবান তোমাকে আমারই জন্য পাঠিয়েছেন' কথাটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয়।

দ্যাখো ভেগা, তোমাকে বাড়ীতে পেলে হয়ত দু'জনেব মধ্যে কিছু কৃত্রিম, কিছু কষ্টকৃত উপাখ্যান শুরু হতে পারত। তোমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে মনে হ'ল, দেখা না হয়ে ভালই হয়েছে। তোমাকে আর আমাকে যা কিছু জ্বালিয়েছে তার অন্তত: একটা নাম আছে, এবং তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব। কিন্তু যা শুরু হতে পারত আমরা তাকে কোন মতেই মেনে নিতে পারতাম না। তুমি এবং আমি, আর আমাদের মধ্যে এই বস্তুটির উপস্থিতি ঃ ধূসর এবং জীর্ণ হয়েও এক ধরনের ক্রমবর্দ্ধমান সরীসৃপ।

আমি তোমার চেয়ে বড়। বয়সে না হলেও, জীবনের মাপকাঠিতে বড়। অতএব আমি বলি, তোমার সবকিছুই সঠিক। তোমার অতীত যেমন,

বর্তমানও তেমনি সঠিক। কেবল তোমার ভবিষ্যতের রূপরেখা এখনো অজানা। হয়ত তুমি আমার মতামত মেনে নেবে না, তবু একটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাইঃ পরিণত বয়ঃপ্রাপ্তি জনিত ঔদাসীন্যে গা ভাসানোর অবস্থা আসার অনেক আগেই তুমি এই দিনটাকে জীবনের এক পরম শুভদিন বলে মেনে নেবে যেদিন তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী হতে নারাজ হয়েছিলে। (এক্ষেত্রে আমার নির্বাসন জীবন ইঙ্গিত করিনি। গুজব শুনেছি তাও শেষ হয়ে আসছে) তুমি জীবনের প্রথমার্দ্ধ ছাগ-শিশুর মত বলিদান করেছ। দ্বিতীয়ার্দ্ধটা যেন তা করো না।

যাহোক, আমি যখন চলেই যাচ্ছি (আমার নির্বাসনের অবসান যদি কখনো হয়ও, আমি চিকিৎসা বা নিয়মিত রোগ পরীক্ষার জন্যও তোমার কাছে যাব না, যার অর্থ এবার আমার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় নিতে হবে), একটা কথা খোলাখুলি ভাবে না বলে পারছি নাঃ আমরা যখন অতি বিদগ্ধ আলোচনায় মগ্ন ছিলাম——এবং তখন যা কিছু বলেছি তার সবটুকুই আন্তরিক সততা এবং নিষ্ঠাসহ বিশ্বাস করেছি বলেই বলতে পেরেছি—— তখন সব সময়ই তোমাকে জড়িয়ে ধরার জন্য, চুমু খাওয়ার জন্য অধীর হয়েছিলাম। তার পরিণাম বুঝতেই পারছ।

এখন, "তোমার অনুমতি ছাড়াই সেই চুমু খেলাম।"

দ্বিতীয় খামের বেলাও একই ব্যাপার। খামের ঢাকনিতে একটা কালো দাগ আছে, আঠা নেই।

ইতিমধ্যে ওলেগের অত চতুর পরিকল্পনা সত্ত্বেও ট্রেন এসে প্লাটফর্মে দাঁড়াল আর যাত্রীরা ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল।

ও এক হাতে থলে আর অপর হাতে দুটো খাম নিয়ে ডাকঘরের ভেতরে ঢুকল। "আঠা কোথায়? আঠা নেই?"

"লোকে নিয়ে পালিয়ে যায়," ডাকঘরের মেয়ে কর্মীটি সাফ জবাব দিল। তারপর এক পাত্র আঠা এগিয়ে দিল, "এই যে, আমার সামনে আঠা লাগান। কোথাও নিয়ে যাবেন না।"

থকথকে, কালো আঠা, মাঝে মাঝে শুকনো আঠার গুলিও ছিল। যেন কোন অনভিজ্ঞ কিশোর ঐ আঠা তৈরি করেছে। শুধু ব্রাশের সাহায্যে ঐ আঠা লাগানো অসম্ভব। ব্রাশের পুরো দেহ খামের ঢাকনির ওপর করাতের মত প্রয়োগ করে আঠা লাগাতে হ'ল। তারপর আঙুল দিয়ে বাড়তি আঠা মুছে ফেলা। অবশেষে খাম বন্ধ করা।

এর মধ্যে লোকজনের ছোটাছুটি থেমে থাকেনি।

এবার আঠা ফেরৎ দিয়ে, চামড়ার থলে তুলে নিয়ে (ওলেগ থলেটা দু'পায়ের ফাঁকে রেখেছিল, পাছে কেউ ছিনিয়ে নেয়), চিঠি ডাক বাক্সে ফেলা। তারপর ছুট!

অত দীর্ঘ কারা এবং নির্বাসন দণ্ড ভোগ, তার ওপর রোগে একেবারে বিধ্বস্ত। তবু কেমন ছোটে দ্যাখো!

যাত্রীদের বেরোনোর বড় বড় গেট দিয়ে বেরিয়ে আসা মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নিজের ভারী বোঝা নিয়ে ওলেগ্ প্রথম প্ল্যাটফর্মের পুরো দৈর্ঘ পেরিয়ে দ্বিতীয় প্লাটফর্মে পেঁছিল। গাড়ীর কাছে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাইনে ওর স্থান দ্বাদশ হওয়া উচিত। কিন্তু লাইনের সামনের যাত্রীরা বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে লাইন লাগিয়েছে বলে ওর হ'ল ত্রয়োদশ। ওর ওপরের বাঙ্কে জায়গা হবে না। না হোক, ওর ঠ্যাঙ দু'টো এত লম্বা যে জায়গা হয়েও লাভ নেই। লাগেজ রাখার তাকে নিজের মাল রাখতে পারলেই হ'ল। ওরা টুকরি আর ঝুড়িতে তাক ভরে দেবার চেষ্টা করবে বটে, কিন্তু ওলেগ্ জায়গা করে নিতে পারবে ঠিকই।

সবার হাতে একটা করে ঝুড়ি। অনেকের হাতে বালতিও আছে। ওগুলোতে হয়ত বসন্তের তরিতরকারি ঠাসা আছে। হয়ত ওরা কারাগণ্ডায় চলেছে—চ্যালি বলেছিল ওখানে তরকারির দারুণ অভাব—সরবরাহ ব্যবস্থার ত্রুটির সুযোগে দু'পয়সা কামাবে বলে।

পাকাচুল, বুড়ো কণ্ডাক্টর সবাইকে হেঁকে বলছিল, গাড়ীর পাশে চুপ করে দাড়ান কিন্তু উঠবেন না। গাড়ীতে সবার জায়গা হবে। কিন্তু ওর আশ্বাস তেমন জোরদার শোনাল না, কারণ ওলেগের পেছনে লাইন ক্রমে বাড়ছিল। ওলেগ্ যে ভয় করেছিল এবার তার শুরু হ'ল, অর্থাৎ লাইন টপকানোর চেষ্টা। প্রথম ঐ চেষ্টা করল উদ্‌ভ্রান্তের মত চিল্লানো এক গুণ্ডা মার্কা লোক। অনভিজ্ঞ মানুষ ওকে মানসিক রোগগ্রস্ত মনে করে লাইনের মাথায় দাঁড়াতে দিত। কিন্তু ওলেগ্ ওকে সঙ্গে সঙ্গে কোন বন্দী শিবিরের স্বঘোষিত মস্তান বলে চিনল। মস্তানটির লোককে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করার ধান্দা। ঐ জাতের মানুষ তাই করে থাকে। কিছু সাধারণ, নিরীহ গোছের মানুষ ঐ চিল্লানো মস্তানকে সমর্থন করছিল। মস্তান গাড়ীতে উঠতে পারলে ওরাও ওঠার দাবী জানাবে। ওলেগ্ও ঐ ফন্দি কাজে লাগাতে পারত। তাতে একটা পুরো বাঙ্কই ওর দখলে আসত। কিন্তু বছরের পর বছর ঐ সব কৌশল অবলম্বন করে ওর কৌশলে ঘেন্না ধরেছিল। ও চাইছিল বৃদ্ধ কণ্ডাক্টর যেমন বলছে, সবাই সেভাবে নিয়ম মাফিক নিজের জায়গা করে নিক।

কণ্ডাকটর মস্তানকে গাড়ীতে উঠতে দেবে না। মস্তান কণ্ডাকটরের বুকে ঠেলা দিতে দিতে এমন করে জঘন্য গালি-গালাজ করছিল যেন ওগুলো দৈনন্দিন ব্যবহারের সাধারণ ভাষা। লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলো বলাবলি করছিল, "ওকে উঠতে দিন না, বেচারী অসুস্থ····· "

ওলেগ্ সচকিত হ'ল। কয়েকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে মস্তানের কাছে হাজির হ'ল। ওর কানের ওপর চিৎকার করে বলল, "এই, শোনো হে, তুমি যেখানে থেকে এসেছ আমিও সেখানকার আমদানি! বুঝেছ?"

মস্তান চমকে উঠে সরে দাঁড়াল। বলল, "কোথা থেকে?"

লড়বার মত শক্তি ওলেগের ছিল না। কিন্তু ওর হাতদুটো ত' খালিই ছিল। মস্তানের এক হাতে একটা ঝুড়ি। ওলেগ্ অনেকটা বেশী লম্বাও। ওলেগ্ মাপা ভঙ্গীতে জবাব দিল, "যেখানকার নিরানব্বই জন মানুষ কাঁদে আর মাত্র একজন হাসে।"

লাইনের লোকগুলো বুঝতে পারছিল না মস্তানের পাগলামি অত তাড়াতাড়ি কি করে সেরে গেল। ওরা দেখল মস্তান চুপসে গিয়ে, ওভারকোট পরা লম্বা লোকটাকে এক চোখ টিপে বলল, "ঠিক আছে, আমি কিছু বলছি না। যদি চান, আপনিই আগে উঠুন।"

কিন্তু ওলেগ্ মস্তান আর কণ্ডাকটারের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। দরকার হলে ওখান থেকে উঠতে পারবে। কিন্তু যারা ঠেলাঠেলি করতে করতে এগিয়ে এসেছিল তারা লাইনে নিজ নিজ জয়গায় ফিরে যেতে লাগল। মস্তান ছদ্ম সাধুতা দেখিয়ে বলল, "বেশ, আমারও অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই।"

ঝুড়ি আর বালতি হাতে যাত্রীরা পর পর উঠতে লাগল। এক একটা চটের ঢাকনির নিচ থেকে লাইলাক-গোলাপী মুলো দেখা গেল। প্রতি তিনজনের মধ্যে দু'জনই কারাগাণ্ডার যাত্রী। ওদেরই জন্য ওলেগ্ লাইন সুব্যবস্থিত করেছে। অল্প কিছু সাধারণ যাত্রীও ছিল। নীল জ্যাকেট গায়ে অভিজাত চেহারার এক মহিলাও ছিলেন। ওলেগ্ উঠল। এর পর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মস্তান।

কামরায় ঢুকেই ওলেগ একটা তাক দেখতে পেল। এটা জানলার ধারে যে অসুবিধাজনক তাক দেখা যায় সেই ধরণের তাক নয়। এ তাকটা প্রায় ফাঁকা। ওলেগ্ জোর পায়ে এগিয়ে গেল। "কার ঝুড়ি ঐটা? এটা সরাতে হবে," ওলেগ্ ঘোষণা করল।

"কোথায় সরাবেন? কি ব্যাপার?" একটা ল্যাংড়া, কিন্তু তাগড়া লোক সভয়ে বলে উঠল।

"এই ত' ব্যাপার," ওলেগ্ জবাব দিল। ও এর মধ্যে তাকে উঠে পড়েছিল। "লোকের কোথাও শোয়ার জায়গা নেই। সব জিনিষপত্র ঠাসা।"

ও তাকে আরামে শোয়ার জায়গা করে নিল। ইস্তিরিটা বের করে নিয়ে চামড়ার থলে দিয়ে বালিশ বানাল। ওভারকোট খুলে বিছিয়ে দিল! নিজের ফৌজী জ্যাকেট খুলে তার ওপর পাতল। এতখানি জায়গা পেলে যেভাবে খুশি কাজে লাগানো চলে। এবার আরাম করে শোয়া। তবু ফৌজী বুট পরা লম্বা ঠ্যাঙ দুটোর গোড়ালির কিছু ওপর অব্দি যাতায়াতের পথের ওপর বেরিয়ে রইল। কিন্তু তা এত উঁচুতে যে লোকজনের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

নিচের আসনগুলোর যাত্রীরা এতক্ষণে গুছিয়ে নিয়ে, আলাপ করছিল। ল্যাওড়া লোকটা আলাপী। ও জানাল, ও এক সময় পশু চিকিৎসকের

সহকারী ছিল। "আপনি ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন?" সবাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"তার মানে? কোথাও কোন একটা ভেড়া মরার জোগাড় হল ত' আমি দৌড়াদৌড়ি করে মরি আর কি? পঙ্গুর অবসর ভাতা আর এই তরকারি ফেরি করে দিব্যি আছি," ও নিজের সাফাই গাইল।

"কেন, তরকারি ফেরি করা কি দোষের?" নীল জ্যাকেট গায়ে মহিলা প্রশ্ন করলেন।

"বেরিয়া'র আমলে ফল আর তরকারি ফেরি করলে পুলিশ ধরত। এখন গেরস্থালি জিনিষ ফেরি করলে ধরে।"

স্টেশনটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে না থাকলে সূর্যের শেষ কিরণ ওদের গায়ে পড়ত। তবু নিচের আসনগুলোয় এখনো বেশ আলো। ওলেগের জায়গাটা এখনই আলো-আঁধারি। 'নরম' আর 'শক্ত' শ্রেণীর শয়নযানের যাত্রীরা প্লাটফর্মে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এদিকে কামরার মধ্যে যাত্রীদের আসন দখলের আর জিনিষপত্র গুছিয়ে বসার ব্যস্ততা। ওলেগ্ আরাম করে পা ছড়াল! আঃ, কি আরাম! রূপান্তরিত মাল গাড়ীতে উনিশ কিংবা তেইশজন বন্দী ঠাসাই হয়ে, হাত-পা গুটিয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা ভয়াবহ যাত্রার কথা চিন্তাও করা যায় না।

অনেকেই টিকতে পারেনি। ও পেরেছে। ক্যানসারও তেমন কিছু করতে পারেনি। আর এখন ত' নির্বাসন ব্যবস্থাই ডিমের খোলার মত ভেঙে পড়ছে।

মনে পড়ল, কমেন্দান্ত্ বিয়ে করার উপদেশ দিয়েছে। কিছু দিন পরে আরো অনেকে একই উপদেশ দেবে। নাঃ, ঘুমিয়ে পড়াই ভাল।

ট্রেনটা নড়ে উঠল। এগোল। সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের কোথায় যেন, অন্তঃকরণ কিংবা আত্মার কোন্‌খানে যেন, হৃদয়াবেগের গহনতম উৎসে একটা ব্যথা মোচড় দিল। ও আর চিৎ হয়ে শুতে পারল না। দেহ মুচড়িয়ে, তারপর উপুড় হয়ে, ঝরা পাতা লেগে থাকা চামড়ার থলেয় মুখ লুকাল।

ট্রেন চলতে লাগল। ওলেগের বুটজোড়া যাতায়াতের পথের ওপর ঝুলতে থাকল। শবের জুতোর মত।

একটা বদ লোক নিরীহ বাঁদরটার চোখে তামাক ছুঁড়ে দিয়েছিল… এমনিই…

———